মার্ক্সীয় অর্থনীতি

এ. লিয়নটিয়েভ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা

প্রকাশক : সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
জুলাই, ১৯৪৬

তিন টাকা আট আনা

মুদ্রাকর :
কালীপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস
৮-ই, ডেকার্স লেন, কলিকাতা

প্রকাশকদের কথা

অবশেষে এ. লিয়নটিয়েভের লেখা "পলিটিক্যাল ইকনমি"র বাংলা তর্জমা এই "মার্কসীয় অর্থনীতি" সত্য সত্যই বা'র হলো।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি শ্রীসরস্বতী প্রেসে প্রায় এক বছর পড়েছিল। এত লম্বা মেয়াদের ভিতরেও যখন তাঁরা কাজে হাত দিতে পারলেন না তখন বাধ্য হয়ে তা ফিরিয়ে আনা হয়। তার অনেক দিন পরে বোস প্রেস পুস্তকখানা ছাপানোর জন্যে নিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে দু'মাসের ভিতরে তাঁরাও কাজ শুরু করলেন না। তাই নিরাশ হ'য়ে সেখান থেকেও কপি ফেরৎ নিতে হলো। "গণশক্তি প্রেস"কে ধন্যবাদ যে নূতন প্রেস হওয়া সত্ত্বেও তাঁরাই তাড়াতাড়ি পুস্তকখানার ছাপা শেষ করেছেন।

মূল পুস্তকখানা রুশীয় ভাষায় লেখা। আমাদের এই অনুবাদ মূল পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ থেকে করা হয়েছে। প্রথমে যে বাংলা অনুবাদটা আমাদের হাতে এসেছিল সেটা ইংরেজির সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার ভার কমরেড দ্বিজেন্দ্রলাল নন্দীর ওপরে দেওয়া হয়েছিল। অনেক দিন পরিশ্রম ক'রে তিনি যা খাড়া ক'রে তুললেন সেটা আসলে হয়ে পড়ল প্রায় তাঁরই নিজের একখানা অনুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদ করার দিকেই তিনি ঝোঁক দিয়েছেন বেশী। ঠিক এই অবস্থাতেই পাণ্ডুলিপিখানা কমরেড অনিল কাঞ্জিলালকে দেওয়া হয়। আমাদের পুস্তক প্রকাশনের কাজের ভার তাঁর ওপরেই রয়েছে। তিনিও আবার ইংরেজির সঙ্গে মিলিয়ে বাংলা অনুবাদটা পড়েন এবং তাতে অনেক কিছু কাটাকাটি ও অদল-বদল করেন। শেষের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর সহকারী কমরেড সুশীল জানা তাঁর শুরু করা কাজ শেষ ক'রে দেন।

প্রথমে অনুবাদ যাঁরা করেছিলেন পরে তিন হাতের সম্পাদনায়

এই পুস্তকখানা আর তাঁদের অনুবাদ থাকেনি। তবুও আমরা এই জন্যে তাঁদের নিকটে কৃতজ্ঞ যে তাঁরাই আমাদের বইখানা প্রকাশের প্রেরণা জুগিয়েছেন। কমরেড দ্বিজেন্দ্রলাল নন্দীও বইখানার ওপরে যে রকম খেটেছেন তার জন্যে আমরা তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মূলের সাথে মিলিয়ে পড়ে নিয়ে কোনো একখানা অনুবাদ পুস্তকের সম্পাদন করা খুবই শক্ত কাজ। এ কাজ করার জন্যে যে-ধৈর্য্য ও ঐকান্তিকতার দরকার হয় তাতে নিঃসন্দেহে একখানা নূতন অনুবাদ তৈয়ার করতে পারা যায়। কমরেড অনিল কাঞ্জিলাল ও কমরেড সুশীল জানাকে বিশেষ ধন্যবাদ যে পরম ধৈর্য্য সহকারে তাঁরা এই বঙ্গানুবাদখানার সম্পাদন করেছেন।

বাংলা ভাষার বই-এর কপালে সাধারণত যা ঘটে থাকে এ-পুস্তকের বেলায়ও তা ঘটেছে—ছাপার ভুল কিছু কিছু রয়ে গেছে। পরিভাষা সম্বন্ধে আমরা এখনো নিশ্চিত পথ বেছে নিতে পারি নি। তবে যা কিছু পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইংরেজি সংস্করণের চেয়ে আমাদের এই বাংলা সংস্করণের দাম কিছু বেশী ধরা হলো। তার কারণ এই যে আগেকার তুলনায় বই ছাপানোর খরচ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। তা ছাড়া ইংরেজি বই-এর সংস্করণ দশ-বিশ হাজারের কম ছাপা হয়না। তাতে খরচ কম পড়ে, কাজে কাজেই দামও কম করা চলে। আমাদের এক সঙ্গে পাচ হাজার ছাপাবারও সাহস নেই। তবুও ৪১৬ পৃষ্ঠার একখানা পুস্তকের দাম তিন টাকা আট আনার বেশী রাখা হয়নি। আমাদের এই দাম অন্য যে-কোনো প্রকাশকের দামের তুলনায় কম। **ন্যাশনাল বুক এজেন্সী যে সব সময়েই বই-এর কম দাম ধরার নীতি গ্রহণ করেছে এই পুস্তক প্রকাশের বেলায়ও আমরা সেই নীতি থেকে বিচ্যুত হইনি।**

সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

অর্থনীতি কি এবং অর্থনীতি কি শিক্ষা দেয় ১—৩৫

মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিনবাদ—সর্ব্বহারা শ্রেণীর মতবাদ; পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণীপার্থক্য; শ্রেণীগুলি কি?—; উৎপাদনী শক্তিসমূহ ও উৎপাদন-সম্বন্ধ; অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়; অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা; দুই জগত—দুই ব্যবস্থা; সর্ব্বহারার একনায়কত্ব ও সমাজতন্ত্রের পথ; অর্থনীতি—সংগ্রামশীল শ্রেণী-বিজ্ঞান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজ কি ভাবে পুঁজিবাদে পৌঁছিল? ৩৬—৬৫

আমাদের লক্ষ্য—এক শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ; চিরকাল কি শ্রেণী ছিল?—; আদিম কৌলিক সাম্যবাদ; আদিম সমাজের পতন; শোষণের প্রাক্-পুঁজিতান্ত্রিক রূপ; বিনিময়-প্রথার উৎপত্তি ও বিকাশ; পুঁজিবাদী উৎপাদনের জন্ম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পণ্য-উৎপাদন ৬৬—১০৩

পণ্য কি?—; পণ্যের দুইটি গুণ; মূল্য সৃষ্টি হয় শ্রমের দ্বারা; নির্ব্বিশেষ ও বিশেষ শ্রম; সামাজিক ভাবে আবশ্যক

শ্রম; সহজ ও নিপুণ শ্রম; বাজার ও প্রতিযোগিতা; বিনিময়ের বিকাশ ও মূল্যের রূপ; পণ্যরতি; পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থায় মুদ্রার ভূমিকা; মুদ্রার কাজ; মূল্যের নিয়ম—পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের গতির নিয়ম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পুঁজিবাদী শোষণের সারমর্ম ১০৪—১৪৭

পুঁজির দ্বারা শ্রমিকরা কি প্রকারে শোষিত হয়ঃ শ্রমশক্তি একটি পণ্য; আদিম সঞ্চয়; মুদ্রার পুঁজিতে রূপান্তর: শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয় এবং তাহার মূল্য; পুঁজিপতির মুনাফার উৎস কি?—; উদ্বৃত্ত শ্রম ও উদ্বৃত্ত মূল্য: পুঁজি কি?—; স্থির এবং পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি; উদ্বৃত্ত মূল্যের হার; উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়াইবার দুইটি পদ্ধতি; অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য; শ্রমের তীব্রতা; পুঁজিতন্ত্র এবং শিল্পসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি; মজুরী-দাসত্ব; উপনিবেশ-সমূহে দাসত্ব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুঁজিতন্ত্রের অধীনে শ্রমিক শ্রেণীর মজুরী এবং দারিদ্র্য ১৪৮—১৮৭

শ্রমশক্তির মূল্য ও দাম; মজুরী—পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের মুখোশ; মজুরী এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম; মজুরী-পদ্ধতি; সময়ানুযায়ী কাজ; ফুরন কাজ; বোনাস বা উপরি-মজুরী এবং মুনাফার বাঁটোয়ারা; রক্ত জলকরা

ব্যবস্থা ; শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠন : টেলর ও ফোর্ড ব্যবস্থা ; জিনিসপত্রে অথবা টাকায় মজুরী দান ; বাহ্যিক বা নামমাত্র মজুরী এবং প্রকৃত মজুরী ; দক্ষ শ্রমিকের মজুরী ; বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে মজুরীর মান ; পুঁজিবাদী শোষণের বৃদ্ধি ; বেকারী ও শ্রমের মজুত বাহিনী ; যন্ত্রের দ্বারা শ্রমিক অপসারণ ; পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়ম ; শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য ; সঙ্কটের অবস্থায় শ্রমিকের দারিদ্র্য ও বেকারী ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুঁজিপতিদের মধ্যে উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টন ১৮৮—২০৫

মুনাফা-হারের সমতা সাধন ; মুনাফার নিম্নতর হারের দিকে ঝোঁক : ব্যবসাদারী পুঁজি ও তাহার আয় ; ব্যবসায়ের রূপ, ফাট্‌কা ; ঋণ-পুঁজি ও জমা বা ক্রেডিট ; সুদের হার ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কৃষিশিল্পে পুঁজিতন্ত্র ২০৬—২৩১

শহর ও গ্রামের মধ্যে বিরোধ ; জমির খাজনা ; জমির খাজনার উৎস ; জমির ক্রয় ও বিক্রয় ; জমির খাজনা এবং কৃষির অনুন্নত অবস্থা ; কৃষিতে ক্ষুদ্রাকার ও বৃহদাকার উৎপাদন ; পুঁজিবাদী দেশসমূহে জমির বণ্টন ও কৃষকের অবস্থা ; পুঁজিবাদের অধীনে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্যের উৎপত্তি ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পুঁজিবাদের আওতায় পুনরুৎপাদন ও সঙ্কট ২৩১—১৭৩

উৎপাদনের উপকরণ ও ভোগের উপকরণ, পুনরুৎপাদন কী?— ; সহজ ও বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদন ; পুঁজিবাদের আওতায় পুনরুৎপাদন ; পুঁজিবাদী সঞ্চয় ; পুঁজির একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ ; পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক ঝোঁক ; পুনরুৎপাদন ও পণ্যবিক্রয় ; সহজ ও বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের আওতায় নগদ মূল্য আদায়ের শর্ত্ত ; পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের অসঙ্গতি ; পুঁজিবাদের আওতায় সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী কেন ?— সঙ্কটের পর্য্যাবৃত্তি ; সঙ্কটের গুরুত্ব ।

নবম পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যবাদ—সর্ব্বহারার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ব্বক্ষণ ১৭৪—৩৪০

শিল্প-পুঁজিবাদ হইতে সাম্রাজ্যবাদে ; সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষা ; সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ; একচেটিয়া ব্যবসায়ের আধিপত্য ; কার্টেল, সিণ্ডিকেট, ট্রাস্ট ; আনুষঙ্গিক শিল্প-সমবায় ; করপোরেশন ; একচেটিয়া ব্যবসায় ও প্রতিযোগিতা ; সাম্রাজ্যবাদ—একচেটিয়া পুঁজিবাদ ; অগ্রগণ্য পুঁজিবাদী দেশগুলিতে একচেটিয়া কারবার ; ফিনান্স-ক্যাপিটাল ; পুঁজি-রফ্‌তানি ; পুঁজিপতিদের সম্মিলনী সমূহের মধ্যে পৃথিবী বিভাগ ; উপনিবেশ দখল ও পৃথিবী বিভাগ ; ক্ষতি দিয়া মাল চালানো ; সাম্রাজ্যবাদের আওতায় অসম উন্নতির নিয়ম ; অসম উন্নতির নিয়ম ও সর্ব্বহারা-

বিপ্লব ; চরম সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব ; সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্ব ; পরস্বোপজীবী বৃত্তি ও পুঁজিবাদের ক্ষয় ; সাম্রাজ্যবাদ— পুঁজিবাদের ধ্বংসের যুগ।

দশম পরিচ্ছেদ

মহাযুদ্ধ এবং পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কট ৩৪১—৩৬৬

সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের পতন ; সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ ; মহাসমরের পরিণাম ও পুঁজিবাদের ব্যাপক সঙ্কট ; পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের তিনটি পর্য্যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পুঁজিবাদের বিশ্বজোড়া বর্ত্তমান সঙ্কট ৩৬৭—৪০৬

পুঁজিবাদের সামগ্রিক সঙ্কটের মধ্যেই অর্থনৈতিক সঙ্কট ; অত্যুৎপাদনের সঙ্কট ; সকল সঙ্কটের মধ্যে সর্ব্বাধিক ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কট ; উৎপাদন হ্রাস ; জাতীয় আয়ের ঘাটতি ও জাতীয় সম্পদ হ্রাস ; বেকারত্ব এবং শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা ; বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতি ; হুণ্ডির বাজারে সঙ্কট, মুদ্রাস্ফীতি ও বাজারের জন্য সংগ্রাম ; বর্ত্তমান মন্দা ও তাহার বিশেষত্ব ; বিপ্লব ও সংগ্রামের নূতন অধ্যায়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

মার্ক্সীয় অর্থনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অর্থনীতি কি এবং অর্থনীতি কি শিক্ষা দেয়

সর্ব্বহারা শ্রেণী তাহার সংগ্রামে মার্ক্স্ এঙ্গেল্স্, লেনিন এবং স্টালিনের শিক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়। সর্ব্বহারা শ্রেণীর এই সকল শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও নেতৃবৃন্দ এক শক্তিশালী অস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এই অস্ত্র হইল তাঁহাদেরই সৃষ্ট ও তাঁহাদের হাতেই ক্রমোন্নতিপ্রাপ্ত সর্ব্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক মতবাদ। পুঁজিতন্ত্রের যুগে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী শিক্ষাই শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের পথ-প্রদর্শক। সকল দেশের শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের হাতে পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ এক শক্তিশালী অস্ত্র, এবং সর্ব্বহারা-বিপ্লব জয়যুক্ত হইবার পরও ইহা শ্রমিক শ্রেণীকে কিরূপে সমাজতন্ত্রের সকল শত্রুর বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত পরবর্ত্তী সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ দেয়। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা শ্রমিক শ্রেণীকে সুনিশ্চিত রূপে সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজে সঠিক নীতি গ্রহণে ও সেই নীতিকে কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করে।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ—সর্ব্বহারা শ্রেণীর মতবাদ

ত্রিশ বৎসরেরও পূর্ব্বে বলশেভিক পার্টির কর্ম্মসূচীর খসড়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লেনিন লিখিয়াছেন যে মার্ক্সীয় মতবাদ—

সর্ব্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদকে কল্পনাবিলাসের স্তর হইতে রূপান্তরিত করিয়া বৈজ্ঞানিক স্তরে লইয়া আসিয়াছে এবং এই বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ ক্রমোন্নতি এবং সকল দিক বিশদভাবে ব্যক্ত করার পথ দেখাইয়াছে। কি ভাবে জমি, কারখানা, খনির মালিক প্রভৃতি অল্প-সংখ্যক পুঁজিবাদীরা মজুরী বা শ্রমশক্তি ক্রয় করার ব্যবস্থার দ্বারা কোটি কোটি নিঃস্ব জনগণের দাসত্বকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া ইহা আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছে। ইহা প্রমাণ করিয়াছে কিরূপে আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ধারা বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংস সাধন করার দিকে প্রবাহিত হয় এবং ইহার ফলে এমন কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠন সম্ভব ও আবশ্যক করিয়া তোলে। সমস্ত রকমের বিত্তশালী শ্রেণীর সহিত বিত্তহীন জনগণ ও তাহাদের নেতা **সর্ব্বহারা শ্রেণীর** যে-**সংগ্রাম** হয় সেই সংগ্রামকে সকল প্রচলিত রীতি, রাজনৈতিক কূটচক্র, প্রতারণাপূর্ণ আইন ও জটিল শিক্ষার কুহেলিকা ভেদ করিয়া শ্রেণী-সংগ্রাম বলিয়া চিনিয়া লইতে মার্ক্সীয় মতবাদ শিক্ষা দেয়। ইহা বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের প্রকৃত কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট রূপে ধরিয়া দিয়াছে। তাহা এই—সমাজের পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনার উদ্ভাবন নয়, পুঁজিবাদী ও তাহাদের তাঁবেদারদের প্রতি শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মোপদেশ নয়, তাহা ষড়যন্ত্র করাও নয়, পরন্তু, **রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিয়া তাহাদের চরম উদ্দেশ্য—সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠার**

জন্য সর্ব্বহারার শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রেণী-সংগ্রামে নেতৃত্বের সুসংগঠন করা।" *

মার্ক্‌স্‌বাদই সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া মানুষের ইতিহাসের আলোচনা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকেরা সামাজিক ক্রমবিকাশের নিয়ম ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম। তাহারা ইতিহাসকে এরূপ পর পর সাজানো আকস্মিক ঘটনাবলীর সমষ্টি বলিয়া চিত্রিত করে যে, এই সবের মধ্যে যে কোনো সুনির্দ্দিষ্ট যোগসূত্র আছে তাহা আবিষ্কার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। মার্ক্‌স্‌ই প্রথম দেখান যে প্রাকৃতিক বিকাশের ন্যায় সামাজিক বিকাশও নির্দ্দিষ্ট আভ্যন্তরিক নিয়ম মানিয়া চলে। তাহা হইলেও মানুষের সমাজের ক্রমবিকাশ প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের ন্যায় মানুষের ইচ্ছা ও কাজের উপর নির্ভর না করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতস্ফূর্ত্ত ভাবে হইতে পারে না, বরং বিস্তৃত জনসমষ্টির কাজের মধ্য দিয়াই মনুষ্য সমাজের ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। মার্ক্‌স্‌বাদ আবিষ্কার করিয়াছে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ইহার অন্তর্নিহিত বিরোধের দরুন স্বীয় ধ্বংসের দিকে অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হইতেছে। তাহা হইলেও মার্ক্‌স্‌বাদ ইহা শিক্ষা দেয় যে পুঁজিবাদের ধ্বংস আপনা-আপনি আসিবে না, পরন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্ব্বহারার নির্ম্মম শ্রেণী-সংগ্রামের ফলেই কেবল ইহা ধ্বংস হইবে। যেহেতু সমাজ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বিকাশ লাভ করে, সুতরাং এই নিয়মগুলিই আপনা-আপনি পুঁজিতন্ত্রের স্থানে সমাজতন্ত্র লইয়া আসিবে, শ্রমিক শ্রেণী এই আশাতেই হাত গুটাইয়া অপেক্ষা করিতে পারে—এই সোশাল ডেমোক্রাটিক মতবাদ মার্ক্‌স্‌বাদের এক জঘন্য বিকৃতি। সমাজ-

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, 'আমাদের প্রোগ্রাম,' পৃঃ ৪৯১, রুশ সংস্করণ।

বিকাশের নিয়মসমূহ স্বতই কার্য্যকরী হয় না। সমাজে যে শ্রেণী-সংগ্রাম চলিতেছে, তাহার ভিতর দিয়াই ইহারা পথ করিয়া চলে।

মার্ক্‌স্‌বাদী-লেনিনবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সর্ব্বহারা শ্রেণী নিঃসংশয় চিত্তে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম চালায়। সর্ব্বহারা শ্রেণী সমাজ-বিকাশের নিয়মসমূহের সহিত উত্তম রূপে পরিচিত; তাই তাহাদের সংগ্রামে ও কাজে তাহারা এই নিয়মসমূহের নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলে এবং ইহার ফলে অবশ্যম্ভাবী রূপে পুঁজিতন্ত্রের ধ্বংস হয় ও সমাজতন্ত্র জয়যুক্ত হয়।

মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিনবাদ উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে হৃতসর্ব্বস্বদের শ্রেণী-সংগ্রামকে অনাবৃত করিয়া ধরিতে শিক্ষা দেয়। মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হইতেছে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনের উচ্ছেদ সাধন ও নিজেদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্ব্বহারার অবিচলিত শ্রেণী-সংগ্রাম।

যে-কোনো পুঁজিতান্ত্রিক দেশের কথা ধরা যাক। সে-দেশ উন্নত দেশই হোক বা অনুন্নত দেশই হোক, সর্ব্বপ্রথম যাহা চোখে পড়ে তাহা হইতেছে শ্রেণী-পার্থক্য। ছোট করিয়া কাটা সবুজ ঘাস ও গাছের সারিতে শোভিত রাস্তার পাশে পাশে বিশাল সৌন্দর্য্যমণ্ডিত অট্টালিকায় বাস করে অল্পসংখ্যক ধনী লোক। মলিন পথের ধারে ধূলা ও ধুঁয়ায় ঢাকা জঘন্য ভাড়াটিয়া বাড়ি বা জীর্ণ কুটীরগুলিতে বাস করে ধনীর বিস্ময়কর বিপুল আয়ের স্রষ্টা—শ্রমিক।

পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণীপার্থক্য

পুঁজিবাদী সমাজ দুইটি বিরাট শত্রু-শিবিরে, দুই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত—একটি বুর্জোয়া শ্রেণী, অন্যটি সর্ব্বহারা শ্রেণী।

বুর্জোয়াদের হাতে আছে সমস্ত সম্পদ ও সমস্ত শক্তি; কারখানার যন্ত্রাদি, কারখানা, খনি, জমি, ব্যাঙ্ক, রেল-লাইন প্রভৃতি সব কিছুর মালিক এই বুর্জোয়া শ্রেণী, ইহারাই সমাজের **শাসক শ্রেণী**।

সকল রকমের উৎপীড়ন ও দারিদ্র্যে সর্ব্বহারার অধিকার। **বুর্জোয়া শ্রেণী ও সর্ব্বহারা শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য**—ইহাই হইল সকল পুঁজিবাদী দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রমিক-শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সমস্ত ব্যাপার অপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই দুই শ্রেণীব মধ্যে **ব্যবধান** ক্রমেই গভীরতর ও বিস্তৃততর হইতেছে। এই শ্রেণী-বিরোধ যতই বাড়িতেছে ততই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের আক্রোশও বাড়িতেছে, সংগ্রামে তাহাদের ইচ্ছা বলবতী হইতেছে, তাহাদের বিপ্লবী চেতনা বৃদ্ধি পাইতেছে, নিজেদের শক্তিতে আত্মবিশ্বাস এবং পুঁজিবাদের উপর তাহাদের চূড়ান্ত জয়ের আশা দৃঢ় হইতেছে।

ব্যবসায়-সঙ্কট সর্ব্বহারা শ্রেণীকে অবর্ণনীয় দুর্দ্দশায় ফেলিয়াছে। ব্যাপক ভাবে বেকার হইয়া পড়া, মজুরী হ্রাস পাওয়া, নিরুপায় হইয়া হাজার হাজার লোকের হতাশায় আত্মহত্যা, অনাহারে মৃত্যু, শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি—এই সকলই শ্রমিক শ্রেণীর উপরে পুঁজিবাদের আশীর্ব্বাদ।

অথচ এই সময়েই বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরাট আয় পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ জার্মান সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে, রঙের কারখানার ৪৩ জন পরিচালকের প্রত্যেকের বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার মার্ক; শুবেট ও স্যালৎসার কোম্পানির ৪ জন পরিচালকের বাৎসরিক আয় প্রত্যেকের ১ লক্ষ ৪৫ হাজার;

ইলাস করপোরেশনের ২ জন পরিচালকের প্রত্যেকের আয় ১ লক্ষ ৩০ হাজার; মানেস্‌মান করপোরেশনের ৭ জন পরিচালকের প্রত্যেকের আয় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার; এলায়েন্স ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ২১ জন পরিচালকের প্রত্যেকের আয় বৎসরে ৪০ হাজার মার্ক।

লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে থাকিতে বাধ্য হয় যাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরগাছা বিলাসব্যসনে ও আলস্যে দিন যাপন করিতে পারে। ইহাই পুঁজিবাদী সমাজের ছবি। অভূতপূর্ব্ব ব্যবসায়-সঙ্কটের ফলে শ্রেণী-বিরোধ অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠার ইহাই আসল রূপ।

বুর্জোয়া শ্রেণী ও সর্ব্বহারার স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। বুর্জ্জোয়া শ্রেণী চেষ্টা করে বল-প্রয়োগ ও প্রবঞ্চনার দ্বারা শাসনক্ষমতা নিজের হাতে রাখিতে। সর্ব্বহারা শ্রেণী তাহাদের শ্রেণী-চেতনার অনুপাতে চেষ্টা করে পুঁজিতান্ত্রিক দাসত্বের অবসান করিয়া সেই স্থলে সমাজতান্ত্রিক বিধান প্রতিষ্ঠিত করিতে।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে **মূল শ্রেণী**ই হইল সর্ব্বহারা শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণী। তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, তাহাদের সংগ্রাম—এই গুলিই পুঁজিবাদী সমাজের ভাগ্য নিরূপণ করে। তাহা হইলেও পুঁজিবাদী দেশে সর্ব্বহারা ও বুর্জোয়া শ্রেণী ছাড়াও অন্যান্য নানা প্রকার মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী আছে এবং কোনো কোনো দেশে এই সকল মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর সংখ্যা নগণ্য নহে।

মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীগুলিতে আছে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত কৃষক, কারিগর ও কুটির-শিল্পিগণ। এই শ্রেণীগুলি পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী নামে খ্যাত। বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত ইহাদের সাদৃশ্য এই যে, ইহারাও বুর্জোয়া শ্রেণীর ন্যায় জমিজমা ও উৎপাদনের যন্ত্রপাতির মালিক। কিন্তু তথাপি সর্ব্বহারা শ্রেণীর সহিতও ইহাদের সাদৃশ্য আছে; কেন না সর্ব্বহারা শ্রেণীর ন্যায়

ইহারাও নিজেরা পরিশ্রম করিয়া বাঁচিয়া থাকে। পুঁজিতন্ত্র অবশ্যম্ভাবী রূপে এই মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীগুলিকে উত্তরোত্তর নিঃস্ব করিয়া ফেলে এবং তাহারা ক্রমেই নিষ্পিষ্ট হইয়া লোপ পাইতে থাকে। ইহাদের মধ্যে দুই চার জন মাত্র এই ধ্বংসের হাত এড়াইয়া নিজেদের শোষক শ্রেণীতে উন্নত করিতে পারে। অধিকাংশ নিঃসম্বল হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বহারা শ্রেণীর সহিত মিশিয়া যায়। এই কারণে সর্ব্বহারা শ্রেণী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শ্রমশীল কৃষক জনসাধারণকে মিত্র হিসাবে পায়।

সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই বুর্জোয়া শ্রেণী ও সর্ব্বহারা শ্রেণীই হইল প্রধান শ্রেণী। বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা থাকে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর অস্তিত্ব ব্যতীত বুর্জোয়া শ্রেণী বাঁচিতে পারে না। পুঁজিপতিরা সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে না—যদি না হাজার হাজার শ্রমিক তাহাদের কল-কারখানায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খাটে। শ্রমিকের ঘাম ও রক্ত মুদ্রায় রূপান্তরিত হইয়া মধুর নিক্কণ সহকারে ধনীর পকেট পূর্ণ করে। বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে শ্রমিক শ্রেণীও সংখ্যায় এবং সংহতিতে বৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করিতে পারে। এইরূপে বুর্জোয়ারা নিজেদের কবর-খননকারীদের নিজেরাই সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অভ্যন্তরে ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিসমূহ পরিণতি লাভ করে। শ্রেণীস্বার্থ এবং শ্রেণী-সংগ্রাম—এই সকল লইয়াই পুঁজিবাদী সমাজের জীবন।

শ্রেণীগুলি কি ?

কিন্তু শ্রেণী কাহাকে বলে ? লেনিন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এই বলিয়া, যে—

"সাধারণ ভাবে শ্রেণী বলিতে আমরা কি বুঝি ? শ্রেণী অর্থে বুঝায় এমন ব্যবস্থা যাহার ফলে সমাজের একটি অংশ অপর অংশের শ্রম

আত্মসাৎ করিতে পারে। যদি সমাজের একটি অংশ সমস্ত জমি দখল করিয়া লয়, তাহা হইলেই সমাজে জমিদার ও চাষীর উৎপত্তি হয়। যদি সমাজের একটি অংশ সমস্ত কল, কারখানা ও অন্যান্য পুঁজির হিস্‌সা দখল করিতে থাকে এবং অন্য অংশ এই সকল কারখানায় তাহাদের জন্য খাটে তাহা হইলে পুঁজিপতি এবং সর্ব্বহারা শ্রেণীর উৎপত্তি হয়।" *

কোন্ রহস্যের ফলে সমাজের একটি অংশের দ্বারা অপর অংশের পরিশ্রম আত্মসাৎ করা সম্ভব হয়? কিরূপেই বা এক-একটা গোটা স্তরের আবির্ভাব হয় যাহারা পরিশ্রম করে না অথচ পরিশ্রমের ফল ভোগ করে?

ইহা বুঝিতে হইলে সমাজে **উৎপাদন কী ভাবে সংগঠিত** হয় তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। প্রত্যেক শ্রমিক, প্রত্যেক শ্রমজীবী কৃষক ভালো রূপেই জানে উৎপাদন মানে কি? মানুষের বাঁচার জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের অবশ্য প্রয়োজন। ঘর তৈয়ার করিতে, জমি চাষ করিতে, খাদ্য উৎপাদন করিতে, মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসসমূহ কল-কারখানায় প্রস্তুত করিতে কি পরিশ্রম দরকার, তাহা প্রত্যেক শ্রমশীল লোকেই জানে, কারণ প্রত্যেক শ্রমিক ও প্রত্যেক শ্রমশীল কৃষক নিজেই এই সকল কাজ করিয়া থাকে।

প্রকৃতির নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্তুসমূহকে পরিশ্রম দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিয়া মানুষ নিজের ব্যবহারের এবং অভাব পূরণ করিবার উপযোগী করিয়া লয়। পৃথিবীর গর্ভে মানুষ পায় কয়লা, লোহার মাক্ষিক, তৈল ইত্যাদি। তারপর, নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা এই সকল

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ২৫শ খণ্ড, রুশ সংস্করণ, ৩৯১ পৃষ্ঠা, রুশ যুব-কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভূগর্ভ হইতে তুলিয়া আনে—মাক্ষিক গলাইয়া লোহা তৈয়ার করে এবং লোহা দ্বারা আবার রেলের ইঞ্জিন হইতে আরম্ভ করিয়া পকেটে রাখার ছুরি ও ছুঁচ পর্য্যন্ত কত অসংখ্য জিনিস তৈয়ার করে।

সকলেই জানে মানুষ একা একা কাজ করে না, অনেকে **একযোগে** কাজ করে। একটি লোক একা একটা কয়লার খনি বা লোহার খনি বা একটা কারখানা লইয়া কি করিতে পারে? এই সমস্ত কল-কারখানা-গুলিই কি হাজার হাজার লোকের সমবেত চেষ্টা ছাড়া গড়িয়া তোলা সম্ভব হইত? আর শুধু যে বড় বড় কারখানার বেলাতেই যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা কল্পনায়ও স্থান দেওয়া যায় না তাহা নহে, এমন কি একজন চাষী একা একা তার বৃদ্ধ বলদের সাহায্যেও তার ছোট্ট জমিটুকু চাষ করিতে পারে না—যদি না অন্যান্য লোক তাহার হরেক রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া তাহাকে সাহায্য করে। কুটির-শিল্পী এবং অন্যান্য কারিগরেরা যাহারা একা একা কাজ করে, তাহারা অন্যের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন হাতিয়ার বা কাঁচা মাল না পাইলে বিশেষ কিছু করিতে পারিত না।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে উৎপাদন সমাজগত ভাবে চলে। উৎপাদন **সামাজিক**; কিন্তু ইহা **বিভিন্ন প্রকারে** সংগঠিত হইতে পারে।

উৎপাদনের জন্য জমি, কারখানা, ইমারত, যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। এই সমস্তকেই **উৎপাদনের উপকরণ** (বা **উৎপাদন-যন্ত্র**) বলে। কিন্তু **মানুষের পরিশ্রম**—জীবন্ত **শ্রমশক্তি**—ব্যতীত এই সকল উৎপাদনের উপকরণ ব্যর্থ। উৎপাদনের উপকরণের উপর শ্রমশক্তি প্রযুক্ত হইলেই উৎপাদন শুরু হয়। **মানব সমাজে কোন্ শ্রেণীর কি স্থান ও কি বৈশিষ্ট্য থাকিবে তাহা নির্ভর করে উৎপাদন-যন্ত্রের সহিত ঐ শ্রেণীর কি সম্বন্ধ তাহার উপর।** যেমন সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় উৎপাদনের প্রধান

উপায় জমির মালিক জমিদার। জমির মালিকানা স্বত্ব ব্যবহার করিয়া জমিদার কৃষকদের শোষণ করে। পুঁজিতান্ত্রিক যুগে সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে, শ্রমিক শ্রেণীর হাতে উৎপাদনের কোনো উপকরণ নাই। বুর্জোয়ারা এই কারণের উপর ভিত্তি করিয়াই সর্ব্বহারাকে শোষণ করিতে পারে।

পুঁজিবাদ শ্রেণী ও শ্রেণী-বৈষম্য সৃষ্টি করে নাই। পুঁজিবাদের পূর্ব্বে সামন্ততান্ত্রিক যুগে, এমন কি তাহারও পূর্ব্বে, শ্রেণীসমূহ বর্ত্তমান ছিল। পুঁজিবাদ পুরাতন শ্রেণীর স্থানে নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে। পুঁজিবাদ শ্রেণীর দ্বারা শ্রেণীর নিপীড়ন ও শ্রেণী-সংগ্রামের নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে।

"শ্রেণী হইল এমন কতকগুলি জন-মণ্ডলীর সমষ্টি যাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা নির্ভর করে ঐতিহাসিক ধারায় নির্দ্ধারিত সামাজিক উৎপাদন-প্রণালীতে কে কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার উপর। কাহারা কোন্ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে তাহা আবার নির্ভর করে উৎপাদন-যন্ত্রের সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ (যে-সম্বন্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ও প্রকাশিত হয়) তাহার উপর; শ্রমের সামাজিক সংগঠনে কে কি অংশ গ্রহণ করে তাহার উপর এবং ইহারই ফল স্বরূপ সমাজে উৎপাদিত ধন-সম্পদ কে কি উপায়ে পায় এবং কাহার ধন-সম্পদে কতখানি অধিকার আছে তাহার উপর। শ্রেণী হইল ব্যক্তিনিচয়ের মণ্ডলী যাহা একটি কোনো নির্দ্দিষ্ট অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থায় তাহাদের পারস্পরিক স্থানের পার্থক্যের দরুন অপর মণ্ডলীর শ্রম আত্মসাৎ করিতে সক্ষম হয়।"*

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, পঞ্চবিংশতিতম খণ্ড, রুশ সংস্করণ; ৩৩৭ পৃষ্ঠা, "বৃহৎ উদ্যোগ" শীর্ষক লেখা দেখুন।

মার্কস্‌বাদই সর্ব্বপ্রথম মনুষ্য সমাজের অভিব্যক্তির নিয়মসমূহ আবিষ্কার করে। মার্কস্‌ দেখাইয়াছেন যে সমাজ-বিকাশের মূলে আছে অর্থনীতি এবং সমাজের বিকাশের প্রধান উৎস হইল শ্রেণী-সংগ্রাম। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের সংগ্রাম—ইহাই হইল ইতিহাসের গতির মূল কারণ।

উৎপাদনী শক্তিসমূহ ও উৎপাদন-সম্বন্ধ

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে শ্রেণীতে শ্রেণীতে পার্থক্য নির্ভর করে নির্দ্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন শ্রেণী কি স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার উপর। আমরা আরও দেখিয়াছি যে উৎপাদন-যন্ত্রের সহিত কাহার কি সম্বন্ধ তাহার দ্বারা কোন শ্রেণী সমাজে কি স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে তাহা ঠিক হয়। উৎপাদনের ভিতর দিয়াই মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়া পড়ে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে সামাজিক উৎপাদন বিভিন্ন প্রণালীতে সংগঠিত হইতে পারে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে একরূপ সামাজিক উৎপাদন-প্রণালী, আবার সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্পূর্ণ অন্য প্রকার উৎপাদন-প্রণালী। পুঁজিবাদী দেশে সর্ব্বহারা শ্রেণী পুঁজিবাদীদের জন্য কাজ করিতে বাধ্য হয়; তাহাদের উপর খামখেয়ালি শাসন চলে ও তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। পুঁজিবাদী দেশে কল-কারখানা, রেলপথ, জমি, ব্যাঙ্ক—সমস্ত কিছুরই মালিক বুর্জোয়া শ্রেণী। উৎপাদনের সমস্ত উপকরণই বুর্জোয়া শ্রেণীর অধিকারে। ইহার ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনী শক্তি শোষণ করা, শ্রমিক শ্রেণীকে উৎপীড়ন করা ও দাসে পরিণত করা সম্ভব হয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত সর্ব্বহারার সম্বন্ধ, পুঁজিবাদী শোষকের সহিত শোষিত শ্রমিকের সম্বন্ধ সমগ্র পুঁজিবাদী

সমাজব্যবস্থার উপর একটি নির্দ্দিষ্ট ছাপ আঁকিয়া দিয়াছে। অপর পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নে কল-কারখানা এবং সমগ্র রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠিত।

উৎপাদনের মধ্য দিয়া মানুষে মানুষে এবং শ্রেণীসমূহের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। এই সম্বন্ধকে আমরা **উৎপাদন-সম্বন্ধ** বলি। উৎপাদন-সম্বন্ধের উদাহরণ স্বরূপ পুঁজিবাদীদের এবং শ্রমিকদের মধ্যে সম্বন্ধ ধরা যাইতে পারে। প্রত্যেক সমাজব্যবস্থা ও প্রত্যেক সামাজিক উৎপাদন-প্রথার প্রকৃতি নির্ণীত হয় প্রধান উৎপাদন-সম্বন্ধ-গুলির দ্বারা। সোভিয়েট ইউনিয়নের উৎপাদন-সম্বন্ধ পুঁজিবাদী দেশ-সমূহের উৎপাদন-সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সমাজে উৎপাদন-সম্বন্ধ কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়? কিসের উপরই বা ইহা নির্ভর করে? মার্কস্ দেখাইয়াছেন যে এই উৎপাদন-সম্বন্ধ নির্ভর করে **সমাজের বাস্তব উৎপাদন-শক্তি** ক্রমবিকাশের কোন স্তরে রহিয়াছে তাহার উপর। সমাজের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে উৎপাদন-শক্তি সমাজে বিভিন্ন পরিমাণে নিযুক্ত হয়। বর্ত্তমানে উৎপাদন প্রধানত বড় বড় কল-কারখানায় জটিল যন্ত্র-পাতির সাহায্যে হইয়া থাকে। এমন কি, চাষের কাজেও, যেখানে যুগ যুগ ধরিয়া সাবেক কালের কাঠের লাঙ্গল একমাত্র যন্ত্র ছিল, সেখানেও জটিল যন্ত্রপাতির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অতীতে মানুষের শ্রম-পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। আধুনিক যুগের জটিল যন্ত্রপাতির কথা আগের যুগে স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় নাই। অতি প্রাচীন কালে পাথরের টুক্‌রা আর লাঠি মানুষের একমাত্র হাতিয়ার ছিল। তারপর বহু হাজার বছর অতীত হইয়াছে। মানুষ ক্রমে ক্রমে কাজের নূতন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে এবং মানুষ নূতন নূতন যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে।

কল-কব্জা ও যন্ত্রপাতি মানুষের সহায়ক ও দাস। ইহাদের সাহায্যে মানুষের শ্রম-শক্তি এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জিনিস-পত্র তৈয়ার করিতে পারে যে পূর্ব্বে তাহা মানুষের কল্পনারও বাহিরে ছিল। অবশ্য উৎপাদনের উপকরণ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহারে লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিশ্রমেরও পরিবর্ত্তন হয়। গত এক হইতে দেড় শতাব্দীর মধ্যে যান্ত্রিক উন্নতি দ্রুত বেগে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে মানুষ বাষ্পীয় যন্ত্র সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। বিদ্যুতের ব্যবহার পঞ্চাশ বৎসরের বেশী হয় নাই। রেল রাস্তার উন্নতি মাত্র গত এক শত বৎসরে হইয়াছে। মোটর গাড়ি সুপরিচিত হইয়াছে মাত্র কয়েক দশক এবং ট্রাক্টর আরও হালে। গত মহাযুদ্ধের মাত্র অল্প সময় পূর্ব্বে বিমানের প্রথম আবির্ভাবের কথা মানুষ এখনও স্বচ্ছন্দে স্মরণ করিতে পারে। গত যুদ্ধের পর হইতে বেতারের উন্নতি হইয়াছে।

কেবলমাত্র মানুষের বড় সহকারী যন্ত্রপাতির উন্নতিই হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রাণবান উৎপাদন-শক্তিও বৃদ্ধি পাইতেছে। মানুষ নিজেই—শ্রমরত শ্রেণীগুলিই—**সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উৎপাদক শক্তি**। যন্ত্রপাতির উন্নতি ও যন্ত্রসংক্রান্ত বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্ম্মক্ষমতা, দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। বিমান না থাকিলে বৈমানিক থাকিতে পারে না। মোটর গাড়ি আবিষ্কারের পূর্ব্বে মোটর-চালক সম্ভব ছিল না। মানুষ শুধু জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করিতে শিক্ষা লাভ করে না। তাহার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম সে জটিল যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতেও শিক্ষা করে।

উৎপাদন-শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-সম্বন্ধও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মার্ক্‌স্ বলেন যে বাস্তব উৎপাদন-যন্ত্রের ও উৎপাদন-শক্তির

পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উৎপাদন-সম্বন্ধও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

শুধু তাহাই নহে, এক শ্রেণীর প্রাধান্য নষ্ট হইয়া গিয়া অপর এক শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার সহিত উৎপাদন-শক্তির বিকাশের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ, পুঁজিবাদের বিকাশ জড়িত রহিয়াছে যন্ত্রপাতির আবির্ভাব ও বৃহৎ আকারে যন্ত্রশিল্পের বিস্তারের সহিত।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে আদিম যুগে উৎপাদন-শক্তির ক্রমোন্নতি অত্যন্ত মন্থর ছিল। কাজের যন্ত্রপাতি তখনও তেমন উন্নতি লাভ করে নাই। মানুষ কোনো প্রকারে প্রকৃতির সহিত লড়াই করিতেছিল। আদিম গোষ্ঠীগুলি কোনো রকমে শিকারলব্ধ খাদ্যের দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইত। কোনো রকম উদ্বৃত্ত কিছু থাকিত না। সুতরাং এমন কোনো শ্রেণীমূলক ব্যবস্থা সমাজে সম্ভব ছিল না যেখানে এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর শ্রমলব্ধ ফল ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। উৎপাদন-শক্তির ক্রমোন্নতির আরও উচ্চতর স্তরে পৌছাইলে সমাজে শ্রেণীবিভাগ আবির্ভূত হয়।

কিছু দূর অবধি উৎপাদন-সম্বন্ধ বাস্তব উৎপাদন-শক্তিকে উন্নতি লাভ করিতে সাহায্য করে। যেমন, পুঁজিবাদ শ্রম করিবার পুরাতন পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং বৃহদাকার যান্ত্রিক উৎপাদন সৃষ্টি করিয়া তাহার যথেষ্ট উন্নতি করাইয়াছে। কিন্তু উৎপাদন-শক্তির এই ক্রমোন্নতি এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পৌছায় যেখানে যে-উৎপাদন-সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া উৎপাদন-শক্তি অবস্থিতি করে তাহার সহিতই তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

"উৎপাদন-সম্বন্ধ উৎপাদন-শক্তির বিকাশের কাঠামো। কিন্তু এই

অবস্থায় পৌছাইয়া উৎপাদন-সম্বন্ধ উৎপাদন-শক্তির বন্ধনের কারণ হইয়া পড়ে। তখনই আসে সমাজে বিপ্লবের যুগ।" *

বর্ত্তমান সময়ে আমরা এই প্রকার এক **সমাজবিপ্লবের যুগে** বাস করিতেছি। পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন-সম্বন্ধ উৎপাদন-শক্তিকে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলিয়াছে এবং উৎপাদন-শক্তি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। পুঁজির সমস্ত ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া শ্রমিক শ্রেণী এই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দেয়। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব উৎপাদন-শক্তিকে পুঁজিবাদের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের সামনে অফুরন্ত বিকাশের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

শ্রমজীবী জনগণের অমানুষিক শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এই পুঁজিবাদ স্বেচ্ছায় পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে না। উপনিবেশের কৃষক ও শ্রমজীবী জনসাধারণের সহিত মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর **বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের** দ্বারাই সমস্ত দুনিয়ায় **পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদ** ও **সমাজতন্ত্রের জয়** সুসম্পন্ন হইবে।

অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়

পুঁজিতন্ত্র কিরূপ ভাবে সংগঠিত? কি ভাবেই বা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রমিক জনগণকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে? বর্ত্তমানে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে যে বিরাট সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে সচেতন ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইলে ইহা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পুঁজিবাদের বিকাশই সর্ব্বহারা-বিপ্লবের সাফল্যের ও নূতন সমাজ-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্মের পথ করিয়া দেয়। মার্ক্স্ ইহা বহু দিন পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা

* মার্ক্স্: "অর্থনীতির সমালোচনা", মুখবন্ধ পৃঃ ১২, চার্লস্ এইচ্ কার এণ্ড কোং, চিকাগো, ১৯০৮।

পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করিয়া এবং ইহার উন্নতি ও অবনতির নিয়মসমূহ আবিষ্কার করিয়া মার্ক্‌স্‌ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ইহা হইতেই বুঝা যায়, অর্থনীতির কী বিরাট গুরুত্ব। লেনিনের ভাষায় ইহা হইল "এমন একটি বিজ্ঞান যাহা সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ লইয়া আলোচনা করে।" মার্ক্‌স্‌ ও লেনিনের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই বিজ্ঞান একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

মার্ক্‌স্‌ তাঁহার "ক্যাপিটাল"-এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন :

> "...এই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য হইল, আধুনিক সমাজের অর্থাৎ পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের গতির অর্থনৈতিক নিয়ম প্রকাশ করা।"

সর্ব্বহারা শ্রেণীকে তাহার মুক্তি-সংগ্রামে পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মার্ক্‌স্‌ পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের নিয়মসমূহ আবিষ্কার করার কাজ হাতে নিয়াছিলেন। লেনিন বলেন :

> "কোনো একটি নির্দ্দিষ্ট সমাজের উৎপাদন-সম্বন্ধগুলি কি, তাহাদের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে, কোন দিকে তাহাদের গতি ও কিরূপে তাহারা ধ্বংস হইবে—এই সকল বিষয় আলোচনা করাই মার্ক্‌স্‌-এর অর্থনৈতিক শিক্ষার মূল কথা।" *

বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুচরেরা 'প্রমাণ' করিতে চেষ্টা করে যে পুঁজিবাদী প্রথা, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্বন্ধ চিরকাল স্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয়। তাহাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাহারা শ্রমিকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিতে চায় যে পুঁজিবাদের ধ্বংস অসম্ভব। তাহারা বলে যে পুঁজিবাদের ধ্বংসের অর্থ সমস্ত মানব-সভ্যতার ধ্বংস। মনুষ্য-সমাজ, তাহাদের মতে, একমাত্র পুঁজিবাদের উপর ভিত্তি করিয়া টিকিতে

* লেনিন : "মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌স্‌-মার্ক্‌স্‌বাদ", পৃঃ ১৫।

পারে। এইজন্য তাহারা পুঁজিবাদের সমস্ত মূল নিয়মকে, পুঁজিবাদী সমাজের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ককে শাশ্বত অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধ বলিয়া বর্ণনা করিবার চেষ্টা করে। এখন যেমন আছে, চিরকাল ঠিক এই রকমই চলিবে—ইহাই হইল বুর্জোয়া শ্রেণীর ভাড়াটিয়াদের কথা।

প্রতিক্রিয়াপন্থীদের এই স্বপ্নসৌধের একখানি পাথরও মার্ক্স্ ও লেনিনের অর্থনীতি খাড়া থাকিতে দেয় নাই। মার্ক্স্বাদী-লেনিনবাদী মতবাদ দেখায়—কি ভাবে পূর্ব্বতন ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপ হইতে পুঁজিবাদী সম্পর্কের উৎপত্তি হয়, কি ভাবে ইহা বিকাশ লাভ করে, কি ভাবে পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধসমূহ ক্রমেই তীব্রতর হইয়া ইহার অনিবার্য্য ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করে ও বুর্জোয়া শ্রেণীর কবর-রচনাকারী সর্ব্বহারার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের পথ উন্মুক্ত করে।

পুঁজিবাদের পূর্ব্বে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরিয়া পৃথিবীতে বাস করিয়াছে। পুঁজিবাদ সম্বন্ধে সে তখন কিছুই জানিত না। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালীর যে-সমস্ত নিয়মসমূহ অর্থনীতি আবিষ্কার করিয়াছে তাহা শাশ্বতও নয়, অপরিবর্ত্তনীয়ও নয়। এই সকল নিয়ম পুঁজিবাদের সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হয়, পুঁজিবাদের দ্বারাই ইহারা উৎপন্ন হয় এবং পুঁজিবাদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদেরও ধ্বংস হয়।

সুতরাং দেখিতেছি, অর্থনীতি কেবল পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না, পরন্তু সমাজ-বিবর্ত্তনের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পর্কেও ইহাকে আলোচনা করিতে হয়।

মার্ক্স্বাদী-লেনিনবাদী অর্থনীতি জুলুম ও শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী প্রথার সমস্ত গুপ্ত আট-ঘাট ব্যক্ত করিয়া দেয়, এবং বুর্জোয়া

শ্রেণীর ভাড়াটিয়া পণ্ডিতদের শ্রেণীগুলির মধ্যে সত্যকার সম্বন্ধ গোপন রাখিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া শ্রেণীগুলির মধ্যে আসল সম্বন্ধ কি তাহা প্রকাশ করে।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে-উৎপাদন সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহার গতি ও পরিণতি লইয়া আলোচনা করে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মনুষ্য-সমাজের উৎপাদন-শক্তি এক নির্দ্দিষ্ট উৎপাদন-সম্বন্ধের কাঠামোকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করে। পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ ক্রমে ক্রমে এরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে যেখানে যে-উৎপাদন সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া উৎপাদন-শক্তি অবস্থিতি করিতেছিল ও বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেই উৎপাদন-কাঠামোরই সীমা উৎপাদন-শক্তি ছাড়াইয়া যাইবার উপক্রম করে। পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন-সম্বন্ধ ও উৎপাদন-শক্তির মধ্যে তখন সংঘর্ষ আরও তীব্র ও গভীর হয়। এই সংঘর্ষ বাহিরে রূপ পায় বুর্জোয়া ও সর্ব্বহারার শ্রেণী-সংগ্রামে। বুর্জোয়া শ্রেণী চেষ্টা করে শোষণ-ব্যবস্থা কায়েম রাখিতে আর সর্ব্বহারা শ্রেণী চেষ্টা করে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ধ্বংস করিয়া দিতে।

মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী অর্থনীতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগ দেয় পুঁজিবাদের ক্রমবর্দ্ধমান আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের প্রতি, যাহার ফলে পুঁজিবাদ ধ্বংস হয় এবং সর্ব্বহারার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্বন্ধের সংঘর্ষের উপর নির্ভর করে সমাজবিপ্লব, এবং এই সংঘর্ষ বাহিরে প্রকাশ পায় শ্রেণী-সংগ্রামের ভিতর দিয়া। পুঁজিবাদী সমাজ যতই বিকাশ লাভ করিতে থাকে, ততই এই সংঘর্ষ তীব্রতর হইয়া উঠে।

পুঁজিবাদের স্থান দখল করে সমাজতন্ত্রবাদ। সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামো পুঁজিবাদের উৎপাদন-সম্পদের কাঠামো হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সকল নূতন উৎপাদন-সম্বন্ধের আলোচনাও কি অর্থনীতির অন্তর্গত? নিশ্চয়ই। কেন না, লেনিন প্রমাণ করিয়াছেন যে অর্থনীতি এমন "একটি বিজ্ঞান যাহা সামাজিক উৎপাদনের ক্রমবিকাশশীল ঐতিহাসিক ব্যবস্থাসমূহ লইয়া আলোচনা করে।"

অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

মার্ক্‌সের ঘনিষ্ঠতম সহকর্ম্মী এঙ্গেলস্ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে—

"অর্থনীতি বলিতে ব্যাপক অর্থে সেই বিজ্ঞানকেই বুঝায় যে-বিজ্ঞান জীবনধারণের বাস্তব উপাদানগুলির উৎপাদন ও বিনিময়ের নিয়মসমূহ আলোচনা করে।" *

সুতরাং অর্থনীতি যে শুধু পুঁজিবাদ লইয়াই আলোচনা করে তাহা নহে, পুঁজিবাদের পূর্ব্বের যুগগুলি ও পুঁজিবাদের **স্থান অধিকার করিতে** যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা আসিতেছে তাহার বিষয়ও আলোচনা করে।

ইহার অর্থ কি এই যে, সামাজিক উৎপাদনের সকল ব্যবস্থাতেই একই নিয়ম খাটে? তাহা নয়। বরং সামাজিক উৎপাদনের প্রত্যেকটি ব্যবস্থায় নিজস্ব বিশেষ নিয়ম আছে। পুঁজিবাদী প্রথায় যে-সকল নিয়ম খাটে, সমাজতান্ত্রিক প্রথায় সে-সকল নিয়মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য আর থাকে না।

বর্ত্তমানে, যখন পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে বিজয়গর্ব্বে সমাজতন্ত্রের চলিতেছে, তখন সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং

* এঙ্গেল্‌স্—"এ্যান্টি-ড্যুরিং", পৃঃ ১৬৫।

পুঁজিবাদ হইতে সমাজতন্ত্রে পৌছাইবার মধ্যবর্ত্তী যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করার স্পষ্টত আবশ্যকতা রহিয়াছে।

আমাদের নিকট মতবাদ শাস্ত্রবাক্য (অর্থাৎ, প্রাণহীন ধর্ম্মমত) নয়, বরং **কাজের পথে অগ্রসর হইবার জন্য পথ-প্রদর্শক।** বিপ্লবী সংগ্রামে মতবাদের অতিশয় গুরুত্ব রহিয়াছে। পৃথিবীর এক নিপীড়িত ও ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি-আন্দোলন বিপ্লবী মতবাদ ব্যতীত সম্ভব হইত না—লেনিন একথা জোরের সহিত বহুবার বলিয়াছেন। কমরেড স্টালিন বলেন :

> "আপনারা জানেন মতবাদ যখন খাঁটি মতবাদ হয়, তখন কর্ম্মীদের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা, পরিপ্রেক্ষিতের স্পষ্টতা, কাজে আস্থা এবং আমাদের লক্ষ্যের সাফল্যে অটুট প্রত্যয় আনিয়া দেয়। আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য এই সকলেরই অত্যন্ত গুরুত্ব আছে এবং থাকিবেও।" *

অর্থনীতি যে কেবল যে-সব নিয়ম পুঁজিবাদের গতি, পরিণতি ও ধ্বংস নিয়ন্ত্রিত করে সেই সব নিয়ম সম্বন্ধেই পরিষ্কার ও স্পষ্ট ধারণা দেয় তাহা নয়, পুঁজিবাদের ধ্বংসস্তূপ হইতে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ উদ্ভূত হয় তাহার নিয়মপ্রণালী সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা দেয়। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী অর্থনীতি যেমন ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার পটের উপর সুস্পষ্ট আলোক সম্পাত করে, তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়নে যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া গড়িয়া উঠিতেছে সে-চিত্রও সুস্পষ্ট করিয়া তোলে।

ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে অর্থনীতিকে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আলোচনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা সমাজতন্ত্র

* স্টালিন—"লেনিনবাদ"; 'সোভিয়েট ইউনিয়নে কৃষিনীতির সমস্যা', পৃঃ ৩০৬।

গঠনের শত্রুদের উদ্দেশ্যেরই সহায়তা করে। অর্থনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল অভিজ্ঞতা সমগ্র পৃথিবীর শ্রমিক-শ্রেণীর পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়; কিন্তু উপরোক্ত প্রচেষ্টা সেই অভিজ্ঞতাকে সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে দেয় না। এইরূপ প্রচেষ্টার ফলে মতবাদ কর্ম্মপ্রচেষ্টার পিছনে পড়িয়া থাকে, মতবাদ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা পরস্পর সম্বন্ধ হারাইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং ফলে আমাদের শত্রুদেরই সুবিধা হয়। সোশাল-ডেমোক্রাট পণ্ডিতদের মধ্যে হিলফারডিং অন্যতম; ইনি মার্ক্সীয় মতবাদের ভাববাদী সংশোধনের চেষ্টা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনা অর্থনীতির অন্তর্গত নয়। লেনিন এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

পুঁজিবাদী জগত ও সমাজতান্ত্রিক জগত—এই দুই জগতকে কেন্দ্র করিয়াই বর্ত্তমানে অর্থনীতির প্রধান আলোচনা চলে।

দুই জগত, দুই ব্যবস্থা

পুঁজিতান্ত্রিক দেশে অভূতপূর্ব্ব ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছে। ১৯২৯ সালের শরৎকাল হইতে এক প্রচণ্ড ব্যবসা-সঙ্কট সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে। বর্ত্তমান সঙ্কট প্রচণ্ডতায়, দীর্ঘস্থায়িত্বে এবং শ্রমশীল জনগণের দুর্দ্দশার মাত্রায় আগের সমস্ত ব্যবসা-সঙ্কটগুলিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান ব্যবসা-সঙ্কট শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই নিদারুণ আঘাত হানিয়াছে। বাজারে পণ্য বিক্রয় না হওয়ায় উৎপাদন কমানো হইয়াছে এবং ফলে কল-কারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ মজুর বেকার হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে জমির চাষ কমাইতে হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ

সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। হাজার হাজার পণ্য নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে; ব্রেজিলে কফি সমুদ্রে ঢালিয়া ফেলা হইয়াছে; যুক্তরাষ্ট্রে রেলের ইঞ্জিন চালাইবার জন্য গম পোড়ানো হইয়াছে; নদীতে দুধ ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে; সমুদ্রে মাছ ধরিয়া আবার ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে; গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি মারিয়া ফেলা হইয়াছে; মাঠের শস্য নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যেন বাজারে মালের রফ্তানি বেশী না হইয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসা-সঙ্কটের চরম অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে এবং পুঁজিবাদ শ্রমিকদের উপর শোষণ ও কৃষকদের লুণ্ঠনের মাত্রা চড়াইয়া এবং উপনিবেশগুলির শোষণের মাত্রা চরমে উঠাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছুটা উন্নতি করিয়াছে। তথাপি পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ব্যবসা-সঙ্কট যথার্থভাবে দূর হইয়াছে, একথা বলা সম্পূর্ণ ভুল; কেন না বর্ত্তমান যুগ পুঁজিবাদের পতন ও ধ্বংসের যুগ। শ্রমিক জনসাধারণের উপর শোষণের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিয়া, আর এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া এবং সোভিয়েটের উপর আক্রমণ চালাইবার আয়োজন করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণী এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতেছে। রক্তপাতের দ্বারা ত্রাস সৃষ্টি করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকদিগকে পদানত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ক্রমেই ফাশিস্ট শাসনপদ্ধতি অবলম্বন করিতেছে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার এই গভীরতম সঙ্কটের যুগে সোভিয়েট দেশ তাহার সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্যের সহিত পাঁচ বছরের জায়গায় চার বৎসরে সুসম্পন্ন করিয়াছে। বর্ত্তমানে সোভিয়েট দেশ শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ স্থাপনের জন্য আরও অনেক বড় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্যের সহিত কাজে লাগাইতেছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। সমাজতন্ত্রের আসল ভিত্তি বড় সমাজতান্ত্রিক কারখানা শিল্প বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন অনেক নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যাহা রুশিয়ায় কোনো কালে ছিল না। বিশেষ রূপে সমগ্র দেশের অর্থ নৈতিক মেরুদণ্ড যন্ত্র উৎপাদনের শিল্প বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসারে কৃষিকে পুনর্গঠন করার বিরাট কাজ সুসম্পন্ন করিয়াছে। যৌথ-কৃষি ফার্মের (কোলখোজ) নূতন ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ চাষীর সামনে উন্নততর ও সচ্ছল জীবনের পথ খুলিয়া গিয়াছে। খাঁটি চাষী জন-সাধারণ ও যৌথ-কৃষি ফার্মের চাষীরা সোভিয়েট রাষ্ট্রের দৃঢ় সমর্থক হইয়াছে এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে পুঁজিবাদের শেষ ঘাটি ধনী শোষক-চাষীর দল (কুলাকরা) ছত্রভঙ্গ হইয়াছে।

শ্রমিক শ্রেণীর বিপুলভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমিকদের জীবন যাপনের অবস্থা উন্নত হইয়াছে। সোভিয়েট দেশ সংস্কৃতিতে উন্নততর দেশে রূপান্তরিত হইয়াছে। সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং কোটি কোটি লোকের নিরক্ষরতা দূর হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ শিশু ও বয়স্ক লোক নানা প্রকার স্কুলে শিক্ষা লাভ করিতেছে। শ্রমে সমাজতান্ত্রিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলার নীতি জনসাধারণের মধ্যে অসাধারণ সাফল্যের সহিত প্রচারিত হইয়াছে। সমাজতন্ত্রের লক্ষ লক্ষ সংগঠন-কারীদের মধ্যে শক্তি, উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

"প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে পৃথিবীর মাত্র একটি দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব, ইহা ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম সমগ্র পৃথিবীর হাজার হাজার শ্রমশীল জনগণের সামনে পরিষ্কার রূপে

প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।" সোভিয়েট ইউনিয়নের "শ্রমিক ও যৌথফার্মের চাষীরা তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আস্থাশীল। তাহাদের ক্রমবর্দ্ধমান সাংস্কৃতিক ও বাস্তব উন্নতি তাহাদের পরিশ্রমের পরিমাণ ও উৎকর্ষতার উপরই নির্ভর করে। সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রমশীল জনগণের বেকার, দারিদ্র্য এবং অনাহারের বিভীষিকা দূর হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রমিক ও যৌথ ফার্মের চাষী দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও মুক্ত আনন্দের সঙ্গে এখন ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতে পারে। তাহাদের জ্ঞানপিপাসা ও কৃষ্টির উন্নতির চাহিদা তাই ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।"*

সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশে শ্রমশীল জনগণ অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। ব্যবসাসঙ্কটের প্রত্যেক বছরেই বেকার বাহিনী বাড়িতে থাকে এবং অবশেষে ইহা পাঁচ কোটিতে গিয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ বর্ত্তমান সঙ্কটের ফলে যাহারা বেকার হইয়াছে এবং ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছে তাহাদের পরিবারবর্গের মোট লোকসংখ্যা সব চেয়ে বড় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যার অপেক্ষাও বেশী। ব্যবসাসঙ্কটের সব চেয়ে খারাপ অবস্থা পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নাই, বরং তাহাদের অবস্থা নিয়ত খারাপের দিকেই যাইতেছে। যে-সব শ্রমিকরা এখনও বেকার হয় নাই তাহাদের উপর শোষণের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া ও তাহাদের আরও বেশী খাটাইয়া পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পের উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পাইতেছে।

* সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত—(মস্কো, ১৯৩৪), পৃষ্ঠা ৯।

"অর্থনৈতিক আঘাতের উত্তাল তরঙ্গ এবং সামরিক ও রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নই পর্ব্বতের মত দাঁড়াইয়া আছে, এবং সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ এবং পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যখন অর্থনৈতিক সঙ্কট পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে, তখন সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্প ও কৃষির উন্নতি বিন্দুমাত্র কমে নাই। সমগ্র পুঁজিবাদী দেশগুলি যখন আবার যুদ্ধের জন্য, সাম্রাজ্য ভাগ-বাটোয়ারার জন্য ও অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলিকে নিজেদের প্রভাবের মধ্যে টানিয়া আনার জন্য ব্যগ্রভাবে চেষ্টা ও আয়োজন করিতেছে, তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া ক্রমাগত শান্তি স্থাপনের জন্য ও যুদ্ধ রদ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে এবং ইহা বলা যায় না যে, সোভিয়েটের এই সকল চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে।"*

রুশিয়ার গৃহযুদ্ধের শেষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন আরম্ভ হইবার পরে লেনিন বলিয়াছিলেন: "আমরা এখন আমাদের অর্থনৈতিক নীতির দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবের উপর আমাদের প্রধান প্রভাব বিস্তার করিতেছি।" এই কারণেই সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের সাফল্যের **আন্তর্জ্জাতিক** তাৎপর্য্য এত গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকেরা ব্যবসাসঙ্কটের চাপে ও ফাশিজমের নিষ্পেষণে পিষ্ট হইয়া সোভিয়েট ইউনিয়নকে সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর পিতৃভূমি বলিয়া মনে করে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সাফল্য পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকদের সংগ্রামে উৎসাহিত করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে সোভিয়েট

* স্টালিন—"লেনিনবাদ": সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের রিপোর্ট, পৃঃ ৪৭১।

সমাজতন্ত্রের জয় বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে একটি প্রকাণ্ড শক্তি।

পুঁজিবাদীরা ও তাহাদের অনুচরেরা **পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে** অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রচণ্ড সমাজতান্ত্রিক সংগঠন এবং পুঁজিবাদের পচনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। **ভবিষ্যৎ কাহাদের**? সাম্যবাদের, না, পুঁজিবাদের —এই প্রশ্নই সমাজতন্ত্রের শত্রুদের মনে বারে বারে খোঁচা দেয়।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ, এই দুই **সমাজ-ব্যবস্থার সংগ্রাম**—ইহাই হইল এযুগের প্রধান সমস্যা। সম্পূর্ণ বিপরীত দুই জগত আজ পরস্পরের সম্মুখীন। সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রমিকের জগত, শ্রমিক শাসন-ব্যবস্থার জগত, সমাজতন্ত্রের জগত; আর অন্য সকল দেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর জগত, মুনাফাখোরের জগত, বেকার ও বুভুক্ষার জগত। সোভিয়েটের শ্রমিকদের মূলমন্ত্র হইল—"যে কাজ করিবে না, তাহার ভাত জুটিবে না।" বুর্জোয়াদের মূলমন্ত্র হইল—"শ্রমিকদের ভাত জুটিবে না।" স্পষ্টতই, সারা দুনিয়ার সচেতন শ্রমিকেরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে তাহাদের সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি বলিয়া মনে করে।

কিন্তু জুলুম ও অত্যাচারে পূর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আপনা-আপনি লোপ পাইবে না। **শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের** ফলেই ইহা লোপ পাইবে। শ্রমিক জনগণের পক্ষে পুঁজিতন্ত্র অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, সচেতন সর্ব্বহারার বিপ্লবী সংগ্রামই কেবল ইহাকে কবরে ঠেলিয়া দিবে।

পুঁজিবাদ, না, সমাজতন্ত্রবাদ?—সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন সমস্ত গুরুত্ব লইয়া সকলের সামনে দেখা দিয়াছে। যতই সোভিয়েট সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদ ভাঙিয়া পড়িতেছে, ততই এই প্রশ্ন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে।

সকল পুঁজিবাদী দেশেই শাসন-ক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। গভর্নমেণ্ট গঠনের ধরন যেরূপই হোক না কেন, **বুর্জোয়া শ্রেণীর একচ্ছত্র শাসন** ইহার অন্তরালে নিশ্চিত রূপে প্রচ্ছন্ন থাকে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল পুঁজিতান্ত্রিক শাসনকে রক্ষা করা, কল-কারখানার উপরে বুর্জোয়া শ্রেণীর অধিকার বজায় রাখা ও জমির উপর জমিদার ও ধনী জোতদারের মালিকানা স্বত্ব রক্ষা করা।

সর্ব্বহারার একনায়কত্ব সমাজতন্ত্রের পথ।

সমাজতন্ত্রকে জয়যুক্ত হইতে হইলে বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনক্ষমতার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র ধ্বংস করিতে হইবে এবং তাহার স্থানে **সর্ব্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব** প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সর্ব্বহারার বিরামহীন শ্রেণী-সংগ্রাম, **সর্ব্বহারার বিপ্লব** এবং সর্ব্বহারার রাষ্ট্র স্থাপনের মধ্য দিয়াই কেবল পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে পৌছানো যায়। একমাত্র নিজেদের রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়াই শ্রমিক শ্রেণী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইতে পারে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিতে পারে।

পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে পৌছিবার একটি মাত্র পথ আছে—সে-পথ হইল কমিউনিস্টদের নির্দ্দেশিত পথ—সর্ব্বহারা-বিপ্লবের পথ, বুর্জোয়া শাসনযন্ত্র ধ্বংস করিয়া সর্ব্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথ।

মার্ক্স্ বলেন :

"পুঁজিবাদী সমাজ ও কমিউনিস্ট সমাজের মধ্যবর্ত্তী একটা যুগ আছে : সে-যুগ হইতেছে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের যুগ। এই যুগের সঙ্গে সঙ্গে আবার রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনেরও যুগ চলে, এবং এই

সময়ে রাষ্ট্রের **সর্ব্বহারার বৈপ্লবিক একনায়কত্বের** রূপ লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।" *

রাশিয়ার সর্ব্বহারা শ্রেণী ১৯১৭ সালের বিপ্লবে একমাত্র এই নির্ভুল পথ গ্রহণ করিয়াছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রমিকশ্রেণী নিজেরাই রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছে। অক্টোবর-বিপ্লবের ফলে সর্ব্বহারার শাসন, শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার জন্যই যে ক্ষমতা দখল করে তাহা নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্ব্বহারার হাতে নূতন সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ স্থাপনের একটি যন্ত্র বলিয়াই সে ক্ষমতা দখল করে।

"ইহার উদ্দেশ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, সমাজে শ্রেণী-বিভাগ দূর করা, সমাজের প্রত্যেক লোককে কর্ম্মশীল করিয়া তোলা, এবং মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের প্রথা ধ্বংস করিয়া দেওয়া। এই উদ্দেশ্য মুহূর্ত্তে সম্পন্ন হইতে পারে না, পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে পৌঁছিতে এক সুদীর্ঘ মধ্যবর্ত্তী যুগ প্রয়োজন হয়। কারণ, উৎপাদনের **পুনর্গঠন** সহজসাধ্য কাজ নয়; দ্বিতীয়ত, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্ত্তনের জন্য সময়ের প্রয়োজন হয় এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপারে খুদে বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া রীতিনীতির পরিবর্ত্তন দীর্ঘ ও অবিরাম সংগ্রাম ছাড়া সম্ভব নয়। এই সকল কারণে মার্ক্স্ সর্ব্বহারার একনায়কত্বের সমগ্র যুগটাকে পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে পৌঁছিবার মধ্যবর্ত্তী যুগ বলেন।" †

* মার্ক্স—'গোথা প্রোগ্রামের সমালোচনা', পৃঃ ৪৪ (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী লাইব্রেরী, ১৫ শ খণ্ড)।

† লেনিনের গ্রন্থাবলী (২৪ শ খণ্ড), 'ভিয়েনার শ্রমিকদের প্রতি অভিনন্দন', পৃঃ ৩১৪, রুশ সংস্করণ।

পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে পরিবর্ত্তনের কাজ অচিরেই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এক সুদীর্ঘ **মধ্যবর্ত্তী যুগ** অনিবার্য্য। এই সময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণীর হাতে থাকে এবং তাহারা এই ক্ষমতা সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে লাগায়।

বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্বের অর্থ মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরগাছাদের স্বার্থের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠ অসংখ্য জনগণের উপর নিপীড়ন। সর্ব্বহারার একাধিপত্যের অর্থ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের জন্য, সকল শ্রমপরায়ণ লোকের স্বার্থের জন্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন শোষকশ্রেণীর লোকের উপর নিপীড়ন। সর্ব্বহারা শ্রেণী তাহার একনায়কত্ব মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ধ্বংস করিবার জন্য প্রয়োগ করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া সর্ব্বহারা শ্রেণী শাসক শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং সকল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করে, শোষকদের সকল প্রতিরোধ নির্ম্মূল করে, এবং দুর্ব্বল দোলায়মান মধ্যম শ্রেণীগুলিকে পরিচালিত করে। সর্ব্বহারা শ্রেণী শাসক শ্রেণীতে পরিণত হইয়া শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টির কাজে লাগিয়া যায়, যে-সমাজব্যবস্থায় শাসক-শ্রেণী বা শাসিত-শ্রেণী বলিয়া কিছু থাকিবে না, কারণ সেখানে শ্রেণী বা শ্রেণী-বৈষম্য বলিয়াই কিছু থাকিবে না।

সমাজতন্ত্রের অধীনে সমাজের শ্রেণীবিভাগ নিশ্চিহ্ন হয়, শ্রেণী বিরোধ এবং শ্রেণী-সংগ্রাম লোপ পায়, উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতের বিভাগ বিদূরিত হয়। কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে পৌঁছিতে গেলে অতি তীব্রতম **শ্রেণী-সংগ্রামের** মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

লেনিন একথা বার বার জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, সর্ব্বহারার একনায়কত্ব হইল শোষণকারীদের বিরুদ্ধে, পূর্ব্ববর্ত্তী শাসকশ্রেণীর অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে দীর্ঘ অবিরাম শ্রেণী-সংগ্রামের যুগ। তিনি লিখিয়াছেন—

"সমাজতন্ত্র হইতেছে শ্রেণীর বিলোপ। শ্রেণীবিলোপের জন্য যাহা কিছু করা সম্ভব সর্ব্বহারার একাধিপত্য সব কিছুই করিয়াছে। কিন্তু শ্রেণী-সমূহের উচ্ছেদ মুহূর্ত্তে সম্ভব নয়। সর্ব্বহারার একনায়কত্বের যুগে শ্রেণীসমূহ **রহিয়াছে এবং থাকিবে**। শ্রেণীর বিলোপ হইলে সর্ব্বহারার একনায়কত্ব অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। সর্ব্বহারার একনায়কত্ব ব্যতীত শ্রেণী লোপ পাইবে না। শ্রেণী রহিয়াছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি শ্রেণী তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। সর্ব্বহারার একনায়কত্বের যুগে শ্রেণী-সংগ্রাম তিরোহিত হয় না, অন্য রূপ গ্রহণ করে মাত্র।" *

অন্য রূপ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বহারার একনায়কত্বের অধীনে শ্রেণী-সংগ্রাম আরও অবিচলিতভাবে চলিতে থাকে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবারও কিছু নাই; কেননা পূর্ব্ববর্ত্তী শাসকশ্রেণী পুনরায় শাসন-ক্ষমতা দখল করার জন্য সব রকম চেষ্টা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। নিজেদের শাসন-ক্ষমতার অবসান যাহাতে না হয় তাহার জন্য কোনো কিছু করিতেই শোষকশ্রেণী পশ্চাদ্পদ হয় না; এমন কি, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল শ্রমরত জনগণের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অন্যায় করিতেও তাহারা প্রস্তুত থাকে।

"শ্রেণী-বৈষম্য দূর করিতে হইলে দীর্ঘ, দুরূহ ও কঠোর **শ্রেণী-সংগ্রাম** দরকার হয়। পুঁজির রাজত্ব ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধ্বংসের **পর** সর্ব্বহারার একনায়কত্ব কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণী-সংগ্রাম **লোপ পায় না,** প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় মাত্র এবং অনেক ক্ষেত্রে আরও তীব্র হইয়া উঠে।" †

* লেনিনের গ্রন্থাবলী—সর্ব্বহারার একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি, পৃঃ ৫১৩, রুশ সংস্করণ।

† লেনিনের গ্রন্থাবলী—'ভিয়েনার শ্রমিকদের প্রতি অভিনন্দন' পৃঃ ৩১৫, রুশ সংস্করণ।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের সমগ্র ইতিহাস লেনিনের এই নীতির সত্যতা সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করিয়াছে। পুরাতন শোষণ-ব্যবস্থার অবশিষ্ট অংশের বিরুদ্ধে এক অবিশ্রান্ত ও তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়াই সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের অভূতপূর্ব্ব জয় সাধিত হইয়াছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন উল্লেখযোগ্য ও চূড়ান্ত জয় লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিরোধ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রামের পদ্ধতি আরও জঘন্য হইতেছে। প্রকাশ্য যুদ্ধে পরাজয়ের পর ধনী-কৃষক (কুলাক), ব্যবসায়ী, পূর্ব্ববর্ত্তী শোষক শ্রেণীর অবশিষ্ট অংশগুলি সোভিয়েট শিল্পে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গোপনে ঢুকিবার চেষ্টা করে এবং ভিতর হইতে ধ্বংসকার্য্য, চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতির সাহায্যে সোভিয়েটের শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক বনিয়াদ দুর্ব্বল করার চেষ্টা করে। সুতরাং সর্ব্বহারার পক্ষে অতন্দ্র সতর্কতা ও সর্ব্বহারার একনায়কত্বের চরম শক্তিবৃদ্ধি অত্যাবশ্যক।

> "ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীসমূহের শেষ অংশগুলিকে চূর্ণ করিবার জন্য ও তাহাদের চৌর্য্যবৃত্তির সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিবার জন্য সর্ব্বহারার দৃঢ় ও শক্তিশালী একনায়কত্ব প্রয়োজন।" *

আপনা হইতে শ্রেণীহীন সমাজ আসিতে পারে না। ইহা অর্জ্জন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রের পথে সমস্ত দুরূহ বাধা কাজের মধ্য দিয়া অতিক্রম করা প্রয়োজন। পুরাতন শোষক শ্রেণীর অবশিষ্ট যাহারা রহিয়াছে তাহাদের সমস্ত বাধা চূর্ণ করা প্রয়োজন। সমাজতন্ত্র যাহারা গড়িয়া তুলিবে সেই লক্ষ লক্ষ জনগণের শক্তি ও কর্ম্ম-ক্ষমতা সংহত করা দরকার। পার্টির সাধারণ **নীতি** হইতে সকল

* স্টালিন—"লেনিনবাদ"—প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল, পৃঃ ৪৩৭।

প্রকারের বিচ্যুতি প্রতিরোধ করা দরকার। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা বিকৃত করার সকল রকম চেষ্টা যাহাতে ব্যর্থ হয় তাহার জন্য অবিচল সতর্কতা প্রয়োজন।

শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সর্ব্বহারার একাধিপত্যই সর্ব্বাপেক্ষা বড় শক্তি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজে যত শক্তি আছে সর্ব্বহারার একাধিকারই তাহার মধ্যে প্রধান। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে পরিবর্ত্তন আলোচনা করিতে গেলে এবং সমাজতন্ত্রের কাঠামো সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জানিতে হইলে সর্ব্বহারার একাধিপত্যই অর্থনীতির আলোচনার কেন্দ্র হইয়া পড়ে।

বুর্জোয়ারা সব সময় চায় যেন পুঁজিতন্ত্রের নিশ্চিত পতনের ও সাম্যবাদের জয়ের নিয়মগুলি কেহ না জানিতে পারে। অর্থনীতির বুর্জোয়া অধ্যাপকেরা (লেনিনের ভাষায় 'পুঁজিবাদী শ্রেণীর পণ্ডিত অনুচরবর্গ') পুঁজিবাদের বিশ্বস্ত ও অনুগত দাস হিসাবে পুঁজিবাদের শোষণ ও দাসত্বের ব্যবস্থাকে ধামাচাপা দিয়া লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিদেরা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের আসল নিয়মগুলিকে দৃষ্টির আড়াল করিয়া রাখার চেষ্টা করে। তাহারা পুঁজিতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করার চেষ্টা করে। তাহারা পুঁজিবাদকে এমনভাবে চিত্রিত করে যেন ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সমাজ-ব্যবস্থা সম্ভব নয়। তাহাদের মতে পুঁজিবাদের নিয়মগুলি চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয়। এই প্রকার মিথ্যার সাহায্যে তাহারা পুঁজিবাদকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করে।

অর্থনীতি—সংগ্রামশীল শ্রেণীবিজ্ঞান

শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের পুরোভাগে থাকে **কমিউনিস্ট পার্টি**। কেবল মাত্র কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ় নেতৃত্বই সর্ব্বহারার বিজয়

সুনিশ্চিত করে। সাম্যবাদের সকল শত্রুই কমিউনিস্ট পার্টিকে বিষের মত ঘৃণা করে। তাহারা পার্টির মধ্যে বিরোধ আনিতে ও একতা নষ্ট করিতে সকল রকমে চেষ্টা করে, এবং যদি কখনও পার্টির সাধারণ নীতি হইতে পার্টির সাধারণ কর্ম্মীদের মধ্যে কোনো রকম বিচ্যুতি দেখে তাহা হইলে তাহারা উল্লসিত হইয়া উঠে।

অর্থনীতি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ও **সাম্যবাদ** প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একটি শাণিত হাতিয়ার। অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞানের মতই, বিশেষ রূপে যে-সমস্ত বিজ্ঞান মানুষের সমাজ ও তাহার বিকাশ লইয়া আলোচনা করে সেই সব বিজ্ঞানেরই মত অর্থনীতি একটি শ্রেণীগত বিজ্ঞান।

সর্ব্বহারা শ্রেণী বিভিন্ন প্রকার শত্রুর দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত। এক তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম এখন চলিতেছে। এইরূপ অবস্থায় পার্টির সাধারণ নীতির উপর আক্রমণ, নীতির দিক হইতে বা কাজের দিক হইতে পার্টিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলার সকল প্রকার চেষ্টা শত্রুকেই শক্তিশালী করে। সেইজন্য পার্টির সাধারণ নীতি হইতে সকল প্রকার বিচ্যুতির বিরুদ্ধে, প্রকাশ্য দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী বিচ্যুতি এবং সকল রকম 'বামপন্থী বিচ্যুতি'র বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে ও অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও সোভিয়েটের বিরুদ্ধে নূতন আক্রমণের আয়োজনের কাজে প্রতিবিপ্লবী ট্রট্স্কিবাদ বুর্জোয়াদের বিশেষ ভাবে কাজে লাগে। সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির এক নূতন মার্কা হিসাবে ট্রট্স্কিবাদ পৃথিবীর সকল দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ও সোভিয়েটের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কদর্য্য মিথ্যা রচনা করিয়া সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সরবরাহ করে। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ট্রট্স্কিবাদ প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের একটি অব্যর্থ ঘাঁটি।

১৯৩১ সালের শরৎ কালে 'প্রোলিটারস্কায়া রেভোলিইউটসিয়া' (অর্থাৎ সর্ব্বহারা-বিপ্লব) নামক এক রুশ কাগজের সম্পাদকদের নিকট স্টালিন 'বলশেভিকবাদের ইতিহাস সংক্রান্ত প্রশ্ন' শীর্ষক এক চিঠি লিখেন। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে লেনিনবাদ-বিরোধী চিন্তাধারা ঢুকাইবার সকল রকম চেষ্টার বিরুদ্ধে এবং বিশেষ রূপে 'ট্রট্স্কিবাদী আবর্জ্জনা প্রচ্ছন্ন ভাবে আমাদের সাহিত্যে আমদানী করার' চেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ় ভাবে অবিরাম সংগ্রাম চালাইবার প্রয়োজনের প্রতি স্টালিন এই চিঠিতে কমিউনিস্ট পার্টির মনোযোগ আকর্ষণ করেন। সর্ব্বহারার স্বার্থের বিরোধী মতবাদের প্রতিনিধিরা এখন তাহাদের মতবাদ প্রচ্ছন্ন ভাবে গোপনে আমদানী করার চেষ্টা করে। তাহাদের এই প্রকার সকল চেষ্টা খুব জোরের সঙ্গে প্রতিরোধ করিতে হইবে। এই সকল বিরুদ্ধ মতের প্রতি কোনো সহিষ্ণুতা দেখানো, ইহাদের সম্পর্কে কোনোরূপ দুর্ব্বল উদারতা দেখানো শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ও তাহাদের সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অপরাধ।

সর্ব্বহারার শ্রেণী-শত্রুরা চেষ্টা করে নানা রকমে অর্থনীতির বিকৃত অর্থ করিতে এবং ইহাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী করিয়া লইতে। বুর্জোয়া ও সোশ্যাল ডেমোক্রাট অর্থনীতিবিদেরা পুঁজিবাদকে জীয়াইয়া রাখার জন্য সকল প্রকার কাল্পনিক ও মিথ্যা যুক্তির আশ্রয় লয়। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যও তাহারা অর্থনীতিকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে।

সুতরাং অর্থনীতি আলোচনার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হইল সমস্ত মার্ক্স্‌বিরোধী ভাবধারা ও বিচ্যুতির বিরুদ্ধে তীব্র বিরামহীন সংগ্রাম পরিচালনা করা।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। সর্ব্বহারার সম্মুখে মার্ক্‌সবাদ-লেনিনবাদ কী আদর্শ রাখিয়াছে ?

২। সমাজের উৎপাদন-শক্তি কী রূপে পরিবর্ত্তিত হয় ?

৩। সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থাগুলির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য কী ?

৪। শ্রেণী কাহাকে বলে ?

৫। শ্রেণীসমূহের অবসান কী রূপে হয় ?

৬। অর্থনীতির বিচার্য্য বিষয় কী ?

৭। সর্ব্বহারার কাছে বিপ্লবী মতবাদ অধ্যয়ন করার আবশ্যকতা কী ?

৮। অর্থনীতি শ্রেণী-বিজ্ঞান কেন ?

৯। বিভিন্ন পার্টির অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কী ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজ কী ভাবে পুঁজিবাদে পৌঁছিল ?

১৯১৭ সালে রুশিয়ার অক্টোবর (নভেম্বর) বিপ্লব মানুষের ইতিহাসে এক নূতন যুগ সূচনা করিয়াছে। এই বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র গঠন। সমাজতন্ত্রে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান হয়। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল এইরূপ শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন, এবং ১৯৩৩ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে এই যুগ শুরু হইয়াছে।

আমাদের লক্ষ্য—এক শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে কমরেড স্টালিন যৌথ-কার্মের শক্-ব্রিগেডের কর্ম্মীদের (অর্থাৎ যাহারা সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাজ করে—অনুবাদক) সম্মেলনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"জাতিসমূহের ইতিহাসে বহু বিপ্লব ঘটিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত বিপ্লব হইতে অক্টোবর-বিপ্লবের পার্থক্য এই যে ঐ সমস্ত বিপ্লব একতরফা বিপ্লব। কারণ (এই সকল বিপ্লবের ফলে) শ্রমশীল জনগণের উপর হইতে একপ্রকার শোষণ-ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া গিয়া অন্য প্রকার শোষণ-ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু শোষণ-ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ কায়েমই রহিয়াছে। একদল শোষক ও উৎপীড়কের জায়গা আর একদল শোষক ও উৎপীড়ক দখল করিয়া লইয়াছে; কিন্তু শোষণ ও উৎপীড়নের অবসান হয় নাই। একমাত্র অক্টোবর-বিপ্লবই

সকল শোষণের অবসান ও **সকল** শোষক ও উৎপীড়কের উচ্ছেদ সাধন লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করিয়াছে।" *

শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ স্থাপন করিতে হইলে যে-সংগ্রাম আবশ্যক সেই সংগ্রামের গুরুত্ব সম্যক রূপে বুঝিতে হইলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আসল রূপ জানা দরকার ও পুঁজিবাদী সমাজ কোন কোন শ্রেণী লইয়া গঠিত তাহা জানা দরকার; শ্রেণী কী তাহা মনে রাখিতে হইবে এবং শ্রেণী চিরকাল ছিল কি না তাহাও সঠিক রূপে বুঝিয়া লইতে হইবে। অন্যান্য শ্রেণীমূলক শাসনপদ্ধতি হইতে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের কী পার্থক্য তাহাও বুঝিতে হইবে। সর্ব্বশেষে পুঁজিতান্ত্রিক দাসত্বের অবসানের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম কোন পথে চলিবে এবং পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ও ক্ষয়ের নিয়মসমূহ কী, এই সম্পর্কে সকল প্রশ্ন সম্যক আয়ত্ত করিতে হইবে।

পুঁজিবাদের ভৃত্যেরা প্রমাণ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যে সমাজে শ্রেণীবিভাগ অবধারিত। ধনী শ্রেণীর তাঁবেদারদের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক যে তাহারা সমস্ত জিনিস এরূপ ভাবে চিত্রিত করিবে যে, সমাজে শোষক ও শোষিতদের অস্তিত্ব যেন সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে একটা চিরন্তন এবং আবশ্যকীয় শর্ত্ত।

চিরকাল কি শ্রেণী ছিল?

বহু পূর্ব্বে প্রাচীন রোমে যখন শোষিতেরা তাহাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তখন শাসক শ্রেণীর একজন সমর্থক গল্পচ্ছলে সমাজকে মানুষের দেহের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন: মানুষের দেহে যেমন হাত থাকে কাজ করিবার জন্য এবং পাকস্থলী থাকে খাদ্য গ্রহণের জন্য, সমাজেও সেই রকম এক শ্রেণীর লোক থাকিবে সমস্ত কাজ করিবার জন্য এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোক থাকিবে সেই

* স্টালিন: লেনিনবাদ, পৃঃ ৪৫৭।

শ্রমজীবীদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিবার জন্য। বস্তুত শোষক শ্রেণীর শাসনের পরবর্ত্তী তাঁবেদাররা মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের প্রথার ধ্বংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গিয়া এই অদ্ভুত গল্পের যুক্তির বেশী আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

প্রকৃত পক্ষে ইহা অকাট্য রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে মানবজাতি শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীশাসন এবং শোষণ ব্যতীত বহু হাজার হাজার বৎসর বাস করিয়াছে। সকলেই জানে, বহু যুগ আগে পশু-জগত হইতে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে। মানুষ কখনও একক স্বতন্ত্র হইয়া বাস করে নাই, সর্ব্বদাই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। মানুষের ক্রমোন্নতির প্রথম অবস্থায় এই দলগুলি ক্ষুদ্র ছিল। এই দলের লোকদের কী কারণে একতাবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইত ? ইহা স্পষ্ট যে, জীবন ধারণের জন্য সকলের একতাবদ্ধ সংগ্রাম এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রম করার আবশ্যকতাই তাহাদের একসঙ্গে বাস করিতে বাধ্য করিত।

মানুষের ক্রমোন্নতির প্রথম দিকে মানুষকে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার ভিতর দিয়া প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। বহু যুগ ধরিয়া লাঠি ও ইট পাটকেলই মানুষের একমাত্র অস্ত্র ছিল। প্রতিপদে অসংখ্য বিপদ তাহাকে ঘিরিয়া থাকিত। প্রকৃতির দুরন্ত শক্তির সামনে মানুষ একেবারে নগণ্য ছিল, প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

আদিম কৌলিক সাম্যবাদ

এরূপ অবস্থায় মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বা গোষ্ঠীতে মিলিত ভাবে বাস করিত এবং তাহাদের সম্মিলিত শ্রমের ফলও মিলিত ভাবে ভোগ করিত। মানুষের ক্রমোন্নতির এইরূপ অনুন্নত স্তরে অসাম্য থাকিতে

পারে না, কারণ শিকার, গোচারণ এবং অত্যন্ত আদিম কৃষি হইতে কেবল বাঁচিয়া থাকিবার মত জিনিসই উৎপন্ন হইতে পারে।

ক্রমোন্নতির প্রথম যুগে মানুষ এই প্রকার আদিম গোষ্ঠীগত সম্প্রদায়ে বসবাস করিত। অধিকতর উন্নত দেশসমূহের দ্বারা পৃথিবীর যে-সব স্থান প্রভাবিত হয় নাই এমন দূরবর্ত্তী অনেক জায়গায় অল্পকাল পূর্ব্বেও এইরূপ আদিম সম্প্রদায় বা কমিউনের অস্তিত্ব ছিল। ইউরোপীয় বুর্জোয়ারা পৃথিবীর এই সব অংশ দখল করিয়াছে এবং তাহাদের চাপে এই প্রকার সংগঠন ধূলিসাৎ হইয়াছে। যাহা হোক, এক হাজার কিম্বা দেড় হাজার বছর পূর্ব্বেও এই সকল ইউরোপীয়ের অনেকের পূর্ব্বপুরুষেরাও এইরূপ আদিম কৌলিক ব্যবস্থার মধ্যে বাস করিত।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমাজে **আদিম কৌলিক সাম্যবাদ** প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও কুলের মধ্যে এই ব্যবস্থার ধরন বিভিন্ন ছিল। কিন্তু এই সকল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সকল মানুষের ক্রমবিকাশের আদিম অবস্থায় সামাজিক সংগঠনের প্রধান লক্ষণগুলির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়।

সমাজের ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে আদিম সাম্যবাদের যুগে বিবর্ত্তনের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। শত শত বৎসর, এমন কি হাজার হাজার বৎসর যাবত জীবন যাপনের রীতিনীতিতে কার্য্যত কোনো প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যাইত না, এবং দেখা গেলেও অত্যন্ত ধীরে ধীরে সে-পরিবর্ত্তন আসিত। অত্যন্ত কঠিন অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষ তাহার ক্রমোন্নতির পথে প্রথম ধাপ অগ্রসর হইয়াছিল। বংশের পর বংশ গত হইয়া যাইত, কিন্তু তবুও সমাজে কোনো পরিবর্ত্তন দেখা যাইত না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে মানুষ তাহার যন্ত্রপাতির ও কর্ম্মপদ্ধতির উন্নতি বিধান করিতে শিখিয়াছিল।

আদিম সাম্যবাদের যুগে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ কী রূপ ছিল? আদিম সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী লোকসংখ্যায় ছিল সাধারণত অল্প। সে-যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থা এমন ছিল যে, গোষ্ঠীতে বেশী লোক থাকিলে তাহাদের সকলের অন্ন-সংস্থান সম্ভব হইত না। পরিশ্রম ও কাজ-কর্ম্ম এইরূপ সমাজে মোটামুটিভাবে একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হইত। সমাজের প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট জীবিকা ছিল। পুরুষেরা শিকার করিত, মেয়েরা শিশু সন্তানদের লইয়া সংসার আগলাইত এবং চাষ-বাসও তাহাদেরই করিতে হইত। শিকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিকার-করা জন্তু-জানোয়ার চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হইত।

"লোক-সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল। গোষ্ঠীর এলাকার মধ্যে তাহারা বাস করিত। এই এলাকার চারিধারে ঘিরিয়া ছিল বিস্তৃত শিকারের জায়গা। বিভিন্ন গোষ্ঠীর এলাকার মধ্যে সীমা হিসাবে থাকিত এক-একটি বনভূমি যাহা কাহারও অধিকারগত নয়। শ্রম-বিভাগ সম্পূর্ণ আদিম ধরনের ছিল। কেবল পুরুষ ও নারী হিসাবে শ্রম-বিভাগ হইত। পুরুষেরা যুদ্ধে যাইত, শিকার করিত, মাছ ধরিত, খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ করিত এবং এই সব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জোগাড় করিত। মেয়েদের ছিল ঘরের কাজ, তাহারা খাদ্য ও বস্ত্র তৈয়ার করিত; রান্না করা, কাপড় বোনা ও সেলাই করা ছিল তাহাদের কাজ। নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষেরা বনে ও মেয়েরা ঘরে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিত। নারী ও পুরুষ প্রত্যেকেই নিজ নিজ যন্ত্রপাতির অধিকারী ছিল; পুরুষেরা ছিল শিকার ও মাছ-ধরার যন্ত্রপাতির মালিক আর মেয়েরা ছিল গৃহস্থালীর জিনিস-পত্র ও বাসন-কোসনের মালিক। গৃহস্থালীর

ব্যবস্থা সাম্যবাদী ধরনের ছিল; কখনও কখনও কয়েকটি পরিবার লইয়া এবং অধিকাংশ সময়ে বহু পরিবার লইয়া ইহা গঠিত হইত। (কুইন শারলোট দ্বীপের হাইদাদের মধ্যে কোনো কোনো গৃহস্থালীতে একই ঘরে ৭০০ লোক পর্য্যন্ত থাকিত। নুটকাদের মধ্যে সমগ্র গোষ্ঠী এক চালের নিচে বাস করিত—এঙ্গেল্‌স্।) সকলে যৌথ ভাবে যাহা কিছু তৈয়ার করিত ও ব্যবহার করিত তাহা সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত, যেমন—ঘর, বাগান, বড় নৌকা ইত্যাদি।" *

আদিম সাম্যবাদী অবস্থায় সমাজের কোনো অংশের পক্ষেই অপরের উপার্জ্জিত আয়ের উপর জীবনধারণ সম্ভব ছিল না। আদিম সাম্যবাদী সমাজ-কাঠামোর মধ্যে সমাজের এক অংশের দ্বারা অপর অংশকে শোষণ করার অবকাশ ছিল না। মানুষের বিকাশের এই স্তরে শ্রমের যন্ত্রসমূহ অত্যন্ত সহজ ছিল; তাই যন্ত্রপাতির উপর ব্যক্তিগত অধিকারের প্রশ্নই উঠিত না। সকলেই অনায়াসে নিজের জন্য সড়কি, পাথর, ধনুর্ব্বাণ তৈয়ার করিতে পারিত। এই সময় জমির উপরও ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না। জমি ছিল সমগ্র সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পত্তি। সমাজে শ্রেণীবিভাগের উৎপত্তি হওয়ার বহু যুগ পরেও জমিতে সমষ্টিগত অধিকারের রেশ কৃষকদের মধ্যে খুবই স্থায়ী প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সমাজ-বিকাশের পরবর্ত্তী যুগে শোষকগণ ও তাহাদের রাষ্ট্র কৃষকদের শোষণ করা ও কর আদায় প্রভৃতির সুবিধার জন্য কৃত্রিম উপায়ে এইরূপ গ্রাম্য-সম্প্রদায়গুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশের জন্য শাসক-

* এঙ্গেল্‌স্:—"পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি", পৃঃ ১৮০।

শ্রেণী ইহার ঠিক উল্টা রীতি অবলম্বন করিয়া গ্রামের সমষ্টিগত জীবন ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

কৃষিকাজ যখন লোকের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান জীবিকা হইয়া পড়িল তখনও জমিতে সমষ্টিগত অধিকার বর্ত্তমান ছিল। যে-সব জমি এক-একটি কৃষক পরিবারকে চাষের জন্য দেওয়া হইত, তাহা কিছুদিন পর পর নূতন করিয়া ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হইত। জমি গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি ছিল এবং বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে মাঝে মাঝে এক-একটা লট হিসাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। গোচারণ-ভূমিতে সমষ্টিগত অধিকার আরও বেশী দিন টিকিয়াছিল। এমন কি পুঁজির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরও গোটা গ্রামের একটি সাধারণ গোচারণের মাঠ আদৌ দুর্লভ ছিল না।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি যে সমাজে শ্রেণী-বৈষম্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে আদিম গোষ্ঠী-মূলক সাম্যবাদ বর্ত্তমান ছিল। এই সমাজ-ব্যবস্থাতে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু এই সকল বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও মানুষের ক্রমবিকাশের এই আদিম স্তরেই বিভিন্ন সমাজের ভিতর সমাজের মৌলিক গুণগুলি সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সামঞ্জস্য দেখা যায়।

সাম্যবাদের ভয়ে ও সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার লোপের ভয়ে ভীত বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকগণ এমন ভাবে সমাজের ছবি আঁকেন যেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব, এমন কি, মানুষের অস্তিত্বই কখনও সম্ভব নয়। মানুষের সমাজের আসল ইতিহাস পুঁজিবাদী পণ্ডিতদের এই কাল্পনিক চিত্র অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপে মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। বস্তুত সমাজে শ্রেণী-বৈষম্যের ন্যায় সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারও সমাজ-বিকাশের অনেক পরের যুগে দেখা দিয়াছে। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরিয়া জানিতই না ব্যক্তিগত সম্পত্তি কী।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে **রাষ্ট্র** ছিল না। সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণী-বিভাগের উদ্ভব হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও আবির্ভাব হইয়াছে। লেনিন তাঁহার রাষ্ট্র সম্পর্কিত বক্তৃতায় বলিয়াছেন ঃ

> "আদিম সমাজে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া তাহাদের বিকাশের নিম্নতম স্তরে প্রায় বর্ব্বর অবস্থায় বাস করিত; সে-যুগের সহিত আধুনিক সভ্য মানুষের কয়েক হাজার বৎসরের ব্যবধান; সেই যুগে রাষ্ট্রের কোনো চিহ্নই ছিল না।" এই "সময়ে কোনো রাষ্ট্র ছিল না; সামাজিক সম্পর্ক, খোদ সমাজ, সমাজে শৃঙ্খলা ও শ্রমবিভাগ প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতির সাহায্যে এবং গোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মানভাজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের দ্বারা বা মেয়েদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। নারীদের অধিকার এই সময় পুরুষদের সমান ছিল; কেবল তাহাই নহে, শাসনের জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ শ্রেণী না থাকিলে মেয়েরা পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী অধিকার ভোগ করিত। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্র হইল জনগণের উপর বল প্রয়োগের যন্ত্র। যেখানে ও যখন সমাজে শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়াছে সেইখানেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ মনুষ্য-সমাজ এরূপ কতকগুলি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে যে একটি অংশ সমাজের অপর অংশগুলির শ্রম অনবরত আত্মসাৎ করিতে পারে এবং এক অংশ অপর অংশকে শোষণ করিতে পারে।" *

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে প্রত্যেক সমাজেরই শোষক ও শোষিত শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়া শাশ্বতও নয় অবশ্যম্ভাবীও নয়। বরং

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, রুশ সংস্করণ, ২৪শ খণ্ড, 'রাষ্ট্র সম্পর্কে'; পৃঃ ৩৬৫-৬৬।

আমরা দেখিতে পাই যে সমাজ এক সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে যখন শ্রেণী, শোষণ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনো ধারণাই সমাজে ছিল না।

আদিম সমাজের পতন

আদিম যুগে মানুষ বিকাশের পথে অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, তথাপি অগ্রগতি ঠিকই ছিল। মানব-সমাজ কখনও নিশ্চল অবস্থায় থাকে নাই। কাজের যন্ত্রপাতি ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছিল। প্রকৃতির যে-শক্তি পূর্ব্বে দুর্ব্বোধ্য ছিল, তাহাও মানুষ ধীরে ধীরে নিজের কাজে লাগাইতেছিল। আগুনের আবিষ্কার এই উন্নতির পথে একটা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তারপর আদিম মানুষ শিকারের জন্য তীর ধনুক আবিষ্কার করিয়াছিল। লাঠি ও পাথর লইয়া শুরু করিয়া মানুষ ধীরে ধীরে লাঠি হইতে বল্লম প্রস্তুত করিতে শিখিল এবং পাথরের টুকরা ঘষিয়া শিকারের উদ্দেশ্যে তাহাকে আরও বেশি উপযোগী করিয়া লইল। মাটি দিয়া মানুষ যখন বাসন-কোসন তৈয়ার করিতে শিখিল, কুমারের বিদ্যা যখন আয়ত্ত করিয়া ফেলিল, তখন মানুষ উন্নতির পথে আর এক পা অগ্রসর হইয়া গেল। প্রথম বন্য পশুকে পোষ মানাইয়া গৃহ-পালিত পশুতে পরিণত করা ও শস্য চাষ করা মানুষের ইতিহাসে এক বিরাট অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে সমাজে পশুপালন ও চাষবাস আরম্ভ হইয়া গেল। মাক্ষিক গলাইয়া লোহা তৈয়ারের উপায় ও লিখনপদ্ধতি যখন আবিষ্কৃত হইল, তখন মানুষের ইতিহাসের আদিম যুগ শেষ হইয়া সভ্যতার যুগ শুরু হইল। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্তেহার'-এ মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্স্ লিখিয়াছেন যে, এই সময় হইতে শুরু করিয়া মনুষ্যসমাজের সমগ্র ইতিহাস হইতেছে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস।

শ্রেণীর উৎপত্তি হইল কিরূপে? সমাজের ক্রমবিকাশের সমগ্র পদ্ধতির সহিত শ্রেণীর আবির্ভাব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। পশু-পালন আবিষ্কৃত হইবার পর আদিম সমাজে যে-সকল গোষ্ঠী পশুপালন শুরু করিল, কুলের অন্যান্য গোষ্ঠীর জনসাধারণ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সমাজে বড় রকমের শ্রমবিভাগের ইহাই হইল প্রথম উদাহরণ। এই সময় হইতে এক-এক সমাজের লোকেরা এক-এক রকম জিনিস উৎপাদন করিতে লাগিল, যেমন—গরু, বাছুর, মেষ, পশম, মাংস, চামড়া ইত্যাদি। ইহার ফলে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিনিময়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম প্রথম সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ যাহারা ছিল তাহারাই বিনিময় পরিচালিত করিত এব গৃহপালিত পশুই ছিল বিনিময়ের প্রধান বস্তু। যে-জায়গায় গোষ্ঠীগুলি একত্র মিলিত হইত সেই জায়গাতেই বিনিময় প্রথম প্রথম চলিত এবং প্রথম দিকে বিনিময় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হইত না, এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর জিনিসপত্র সমষ্টিগত ভাবে বিনিময় হইত।

সঙ্গে সঙ্গে যতই লোকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল ততই কাজ করিবার পুরাতন পদ্ধতি অচল হইয়া পড়িল। লোকসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকায় পুরাতন পদ্ধতিতে উৎপাদিত খাদ্য লোকসংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ফলে রোয়া চাষ আরম্ভ হইল, কৃষিকাজের উন্নতির প্রথম ধাপ শুরু হইল। এরূপ অবস্থায় জমি চাষ করিবার ফলে কতকগুলি পরিবারের সহিত তাহাদের চাষ-করা জমির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া পড়িল। এইরূপে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি স্থাপিত হইল।

"পশুপালন, কৃষিকাজ, কুটির-শিল্প প্রভৃতি বিভাগের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মানুষের শ্রমশক্তি নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি অপেক্ষা অনেক বেশি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। গোষ্ঠীর,

পরিবারের বা কোনো গৃহস্থালীর যে-কোনো লোকের দৈনন্দিন কাজের চাপও ইহার ফলে বৃদ্ধি পায়। সমাজে শ্রম-শক্তি আরও বাড়াইবার আবশ্যকতা দেখা দিল এবং যুদ্ধের ফলে ইহার সুযোগও মিলিল। যুদ্ধের বন্দীদের দাসে পরিণত করা হইল। এইরূপ ঐতিহাসিক অবস্থায় সমাজে প্রথম ও বড় রকমের সামাজিক শ্রমবিভাগ দেখা দিল এবং ইহার ফলে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল, সমাজের সম্পদ বাড়িল এবং উৎপাদনের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সামাজিক শ্রমবিভাগের অনুষঙ্গ হিসাবে অবশ্যম্ভাবী রূপে দাস-প্রথারও সূত্রপাত হইল। এই প্রথম বড় রকমের সামাজিক শ্রমবিভাগ হইতে সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িল---প্রভু ও দাস শ্রেণী, শোষক ও শোষিত শ্রেণী।" *

যে-পরিমাণে মানুষ শ্রমের নূতন ধরন এবং পদ্ধতি আয়ত্ত করিল সেই পরিমাণে শ্রমের বিভাগ বৃদ্ধি পাইল। মানুষ বিভিন্ন প্রকারের বাসন-পত্র, যন্ত্র-পাতি, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখিল। ফলে ধীরে ধীরে হস্তশিল্প ও কৃষিকাজ পৃথক হইয়া পড়িল। এই সমস্ত ঘটনাই বিনিময়-প্রথাকে আরও বিস্তার ও বিকাশ লাভ করিতে সাহায্য করিল।

আদিম সাম্যবাদী সমাজের পতনের ফলে সমাজের পশুপাল আর সাধারণের সম্পত্তি থাকিল না, ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইল। জমি এবং যন্ত্রপাতিও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইল। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার প্রবর্ত্তিত হইবার ফলে অসাম্যের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপিত হইল।

"সমাজ স্বাধীন মানুষ ও দাসে পূর্ব্বেই বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এখন আবার এই বিভাগের সহিত ধনী ও গরীবের বিভেদও

* এঙ্গেলস্‌: 'পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', পৃঃ ১৮৩।

যুক্ত হইল। ইহার ফলে এবং নূতন নূতন শ্রম-বিভাগ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সমাজে এক নূতন রকমের বিভাগ দেখা দিল—শ্রেণী-বিভাগ।*
আদিম সাম্যবাদী সমাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ শোষক ও শোষিতে বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং অপরের শ্রমের ফল ভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকে এইরূপ লোকের আবির্ভাব হইল। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এক শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণ। তথাপি যে শোষণ-পদ্ধতির সাহায্যে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর শ্রমের ফল আত্মসাৎ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহা সমাজের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বদলাইয়া যায়।

শোষণের প্রাক্-পুঁজি-তান্ত্রিক রূপ

"দাস-প্রথা সভ্যতার যুগে চরম পরিণতি লাভ করে। এই দাস-প্রথা সর্ব্বপ্রথম সমাজের মধ্যে শোষক ও শোষিতের বিরাট বিভাগ প্রবর্ত্তন করে। সভ্যতার যুগে বরাবর এই বিভাগ চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন যুগের বৈশিষ্ট্য দাস-প্রথাই হইতেছে শোষণের প্রথম রূপ। তারপর মধ্য-যুগে আসে ভূমিদাস-প্রথা এবং বর্ত্তমান যুগে মজুরির প্রথা; ইহাই হইল সভ্যতার তিনটি বড় বড় যুগের দাসবৃত্তির তিনটি বড় বড় রূপ। এই রূপগুলির অপরিবর্ত্তনীয় লক্ষণ হইল—হয় প্রকাশ্য দাসত্ব, অথবা, বর্ত্তমান যুগের ন্যায় ছদ্ম দাসত্ব।" †

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সামাজিক উৎপাদনের বিশেষ ব্যবস্থায় শ্রেণীগুলির স্থান কোথায় কোথায় হইবে তাহা নির্ভর করে উৎপাদন-যন্ত্রের সহিত তাহাদের কী সম্বন্ধ তাহার উপর। দাস-প্রথা, ভূমিদাস-

* এঙ্গেল্‌স্‌ : 'পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', পৃঃ ১৮৬।

† এঙ্গেল্‌স্‌ : 'পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', পৃঃ ২০১।

প্রথা ও পুঁজিতান্ত্রিক প্রথা—এই তিন প্রকার শোষণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের তিন প্রকার রূপের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। শোষণ-মূলক সমাজের এই প্রত্যেকটি প্রথারই নিজস্ব সামাজিক উৎপাদন-সম্বন্ধ আছে।

মানুষের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগেও দাস-প্রথার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। দাস-প্রথা হইতেছে শোষণের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন রূপ। মানবসমাজের লিখিত ইতিহাসের যুগের ঠিক প্রারম্ভেই দাস-প্রথার উদ্ভব হয়।

দাস-প্রথায় শোষিত শ্রেণী শোষকদের সম্পত্তি। ঘর, জমি বা গৃহপালিত পশুর মত দাসও তাহার মালিকের সম্পত্তি। প্রাচীন রোমে দাস-প্রথা খুব প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেখানে দাসদের 'নির্ব্বাক-যন্ত্র' ও 'আধা-নির্ব্বাক যন্ত্র' (গবাদি পশু) হইতে পৃথক করিবার জন্য বলা হইত 'সবাক যন্ত্র'। দাসকে তাহার প্রভুর অস্থাবর সম্পত্তি বিবেচনা করা হইত, এবং তাহাকে হত্যা করিলে তাহার প্রভুকে কোনো জবাবদিহিই করিতে হইত না। দাসদের মালিকেরা দাসদের নিজেদের সম্পত্তির একটা অংশ বলিয়া মনে করিত, এবং তাহাদের সম্পত্তি নির্দ্ধারিত হইত কাহার কত দাস আছে তাহার দ্বারা। দাসদের প্রভুরা দাসদের দিয়া নিজেদের কাজ করাইয়া লইত। দাসেরা বাধ্য হইয়া শাস্তির ভয়ে কাজ করিত। দাসদের শ্রমের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা অতি সামান্য ছিল। দাস-প্রথার আমলে যন্ত্র-পাতির উন্নতি অত্যন্ত মন্থর ছিল। দাসদের পরিশ্রমে যে-সব বিপুল ইমারত তৈরি হইয়াছিল তাহা হাজার হাজার দাসদের দ্বারা অতি সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে শুধু তাহাদের কায়িক পরিশ্রমের দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রভুদের পক্ষে দাসদের শ্রম লাঘব করার চেষ্টার কোনো কারণ ছিল না।

দাস-প্রথায় শোষণের সীমা কতদূর ছিল? দাস-প্রথায় শুধু যে শ্রম করিবার যন্ত্র-পাতিই মালিকের সম্পত্তি থাকে তাহা নহে, শ্রমিকও তাহার সম্পত্তি ; দাস প্রভুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। দাসদের মালিক দাসদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিত, কেন না একটা দাসের মৃত্যু হইলে মালিকের লোকসান হইত ও তাহার সম্পত্তি কিছুটা কমিয়া যাইত। বিনিময়-প্রথা যতদিন তেমন প্রসার লাভ করে নাই ততদিন দাস-মালিকেরা তাহাদের নিজের নিজের জমিদারীতে যে-সকল জিনিস-পত্রের প্রয়োজন হইত দাসদের দ্বারা তাহাই প্রস্তুত করাইত। দাস-প্রথায় শাসক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ছিল বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খল অপচয়। কিন্তু বিলাসিতা যতই থাকুক, দাসদের পরিশ্রমের একটা সীমা ছিল ; কারণ একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার করার সুযোগ ছিল না। দাস-প্রথায় ধন-সম্পত্তির বৃদ্ধির সীমা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ছিল। এই জন্যই যন্ত্র-পাতির ব্যবহার দাস-প্রথার যুগে তেমন উন্নতি লাভ করে নাই।

শ্রেণী-প্রাধান্য প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বল-প্রয়োগের যন্ত্র হিসাবে **রাষ্ট্রের** উদ্ভব হইল, এবং সংখ্যাল্প কয়েক জন শোষকের জন্য সমাজের অধিকাংশকে কাজ করিতে বাধ্য করা হইল। প্রাচীন কালের দাসপ্রথা-বিশিষ্ট সমাজে রাষ্ট্র আজকালকার তুলনায় অনেক অল্প পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যানবাহন চলাচলের সুবিধা তখন খুব অল্পই ছিল ; পাহাড় ও সমুদ্রের বাধা অতিক্রম করা সে-যুগে দুঃসাধ্য ছিল। দাস-প্রথার আমলে রাষ্ট্রের রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ বর্ত্তমান ছিল। তথাপি রাষ্ট্রের রূপ যাহাই হোক না কেন, রাষ্ট্র মালিকদের হাতে **দাসদের উপর** শাসন চালাইবার যন্ত্র হইয়াই রহিল। দাসদের সাধারণত সমাজে স্থান দেওয়া হইত না।

দাসপ্রথা-বিশিষ্ট সমাজে, বিশেষত প্রাচীন গ্রীস ও রোমে, শিল্প ও

বিজ্ঞান যথেষ্ট উচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়াছিল। কিন্তু এই সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছিল অগণিত দাসদের অস্থিস্তূপের উপর।

এই সময় ঘন ঘন যুদ্ধের ফলে সময় সময় দাসদের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যাইত। দাসদের জীবন ছিল খুব সস্তা, এবং শোষকেরা তাহাদের জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিত। দাস-প্রথার ইতিহাস শোষক ও শোষিতের মধ্যে এক রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস। প্রভুদের বিরুদ্ধে দাসদের বিদ্রোহ নির্দ্দয় নৃশংসতার সহিত দমন করা হইত।

বিশেষ করিয়া দাস-প্রথার শেষের যুগে দাসদের বিদ্রোহ দাসপ্রথা-বিশিষ্ট সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। সে-সময়ে রোমানরা তাহাদের পরিচিত দুনিয়ার দূর দূর অংশে বহু দেশ জয় করিয়াছিল; এই সব জয়ের দ্বারা রোম সাম্রাজ্য যখন প্রভূত শক্তির অধিকারী হইয়াছিল, তখনই যে-অসঙ্গতি সেদিনের সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করিতেছিল তাহার চাপে সেই সাম্রাজ্য উত্তরোত্তর টলমল করিতেছিল। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে রোমের দাস-বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দাস-মালিকদের শাসনের বিরুদ্ধে স্পার্টাকাস এক বিশাল বাহিনী সমাবেশ করিয়াছিলেন। দাসদের বিদ্রোহ শোষিতদের বিজয়ী করিতে পারে নাই, সকল শোষণের অবসান করিতে পারে নাই। নিজেদের একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিবার মত অবস্থা তখন দাসদের ছিল না। তাহাদের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য তাহারা শক্তিশালী সংগঠন গড়িতে পারে নাই। অনেক সময়ই তাহারা প্রভুদের দলগত বিরোধে এক-একটা দলের হাতের পুতুল হইয়া পড়িত। তাহা সত্ত্বেও গৃহযুদ্ধ ও দাস-বিদ্রোহ দাসপ্রথা-বিশিষ্ট সমাজের মূলে কঠোর আঘাত হানিয়াছিল এবং ইহার ধ্বংসের পথ সুগম করিয়াছিল।

দাস-প্রথা ধ্বংস হইবার পর মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ এক নূতন

রূপ লইয়া দেখা দিল। এই প্রথা হইল **সামন্ত-তন্ত্র**; সমগ্র মধ্যযুগ ধরিয়া ইহা প্রচলিত ছিল এবং ইহার বিকাশের শেষ স্তর হইল **ভূমিদাস-প্রথা**। সামন্ত-তন্ত্রের ক্রমবিকাশ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। সামন্ত-তন্ত্রের অধীনে বিশাল কৃষক জনগণ এক ক্ষুদ্র অভিজাত মণ্ডলীর দ্বারা শোষিত হইত। কৃষকদের দ্বারা কর্ষিত জমির উপর মুখ্য অধিকার অভিজাত শ্রেণী করায়ত্ত করিয়াছিল। জমি চাষ করার অধিকারের বদলে চাষীদের জমিদারের জন্য নানা প্রকার বেগার খাটিয়া দিতে হইত।

স্বাভাবিক উৎপাদন যতদিন বলবৎ ছিল, অর্থাৎ যতদিন বিনিময়ের জন্য উৎপাদন না হইয়া সরাসরি ব্যবহারের জন্য হইত ততদিন সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সমস্ত ভুঁইয়ারা চাষীদের নিকট হইতে উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ আদায় করিয়া লইত। এই আদায়ের অধিকাংশ তাহাদের নিজেদের জন্য ও তাহাদের সৈন্য সামন্তের জন্য খরচ হইয়া যাইত; বাকি সামান্য অংশ অস্ত্র-শস্ত্র ও বিদেশী জিনিস-পত্র খরিদের জন্য ব্যয়িত হইত। বিনিময়ের প্রসারের ফলে জমিদারদের চাহিদাও বাড়িয়া যাইতে থাকে। এখন জমিদার তাহার নিজের ও দাসদাসীদের জন্য শুধু আদায় করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, বরং অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করিবার জন্য চাষীকে নিংড়াইয়া তাহার নিকট হইতে বেশী বেশী ফসলও আদায় করিতে লাগিল, এবং এই আদায়ের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিনিময়-প্রথা যতই চালু হইতে লাগিল, ততই সামন্ত-প্রভুদের দ্বারা চাষীদের শোষণের মাত্রা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। বিনিময় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আগেকার যুগে কুল-পতিদের সহিত তাহাদের উপর নির্ভরশীল চাষীদের যে-সম্বন্ধ ছিল, সে-সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহার জায়গায় ভূমিদাস-প্রথার উৎপত্তি হইল।

ভূমিদাস-প্রথা জমিদারদের দ্বারা চাষীদের শোষণের একটি কঠোরতম রূপ। ভূমিদাস-প্রথার যুগে উৎপাদনের প্রধান উপকরণ জমি জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। চাষীদের পুরুষানুক্রমে কর্ষিত জমি জমিদারেরা আত্মসাৎ করিয়া লইল। কিন্তু ইহাতেও তাহারা সন্তুষ্ট হইল না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাহাদের হাতে থাকায় সেই ক্ষমতার সুযোগ লইয়া স্বাধীন চাষীদেরও তাহারা ভূমিদাসে পরিণত করিল। কৃষকও জমির সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা পড়িল এবং কার্য্যত জমিদারের সম্পত্তিতে পরিণত হইল।

যে-কোনো উপায়ে তাহাদের আয় বৃদ্ধি করিতে গিয়া জমিদারেরা ভূমি-দাসদের উপর শোষণ বাড়াইয়া দিল। ভূমিদাস-প্রথা যখন আরম্ভ হয়, তখন বিনিময়-প্রথা অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। বণিকেরা ভূমি-দাসদের মালিকদের নানা প্রকার বিদেশী জিনিস-পত্র সরবরাহ করিতে লাগিল। টাকা পয়সা ক্রমেই অধিক প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। বেশী করিয়া টাকা-পয়সা আদায় করিবার জন্য ভূমি-দাসের মালিকেরা চাষীদের উপর চাপ দিয়া বেশী করিয়া তাহাদের পরিশ্রম করাইতে লাগিল। তাহারা কৃষকদের জমি কাড়িয়া লইল, কৃষকদের জমির অংশ সীমাবদ্ধ করিয়া দিল, এবং সেই স্থানে নিজেদের জমি খাড়া করিল; আবার সেই চাষীদেরই সেই জমিতেই তাহাদের জন্য বেগার খাটিতে বাধ্য করিল। বেগার খাটার প্রথা চালু হইল এবং চাষীকে জমিদারের জমিতে সপ্তাহে তিন চার দিন বেগার খাটিতে বাধ্য করা হইল। বাকী কয়েক দিন তাহাকে নিজের কাজ করিতে দেওয়া হইত। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূমি-দাসদের মালিক জমিদার চাষীদের উৎপাদিত ফসলের একটা মোটা অংশ আত্মসাৎ করিতে থাকে এবং ইহার পরিমাণ ক্রমেই বাড়াইয়া দিতে থাকে এবং এই উদ্দেশ্যে **সেলামি** ও **খাজনা** প্রথার প্রচলন করে।

ভূমি-দাসদের উপর শোষণের ফলে চাষীরা জমিদারদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিত। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই কৃষক বিদ্রোহের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভূমিদাস-প্রথার যুগে বহু দেশেই কৃষক বিদ্রোহ হইয়াছিল (যথা—জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড রুশিয়া)। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনো বিদ্রোহ বহু বৎসর অবধি চলিয়াছিল এবং এই সকল দেশ কয়েক দশক ধরিয়া গৃহযুদ্ধের কবলে ছিল। জমিদারেরা ও তাহাদের গভর্নমেণ্ট এই সকল কৃষক অভ্যুত্থান অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত দমন করিয়াছিল। নবোদ্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণী ভূমিদাস-প্রথার ধ্বংস ত্বরান্বিত করিবার জন্য এবং ভূমিদাসের শোষণের বদলে পুঁজিবাদী শোষণ কায়েম করিবার জন্য জমিদারদের বিরুদ্ধে চাষীদের এই সকল সংগ্রাম কাজে লাগাইয়াছিল।

এক সমাজ-ব্যবস্থার স্থানে অন্য সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তনের বিষয়ে স্টালিন বলেন—

"দাস-বিদ্রোহ দাস-প্রথার ধ্বংস সাধন করে এবং শ্রমশীল জনগণকে শোষণ করিবার দাসপ্রথামূলক ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে। দাস-বিদ্রোহ এই ব্যবস্থার স্থানে সামন্ত-শাসকদের প্রতিষ্ঠা করে এবং শ্রমশীল জনগণের উপর ভূমিদাস-মূলক শোষণ-ব্যবস্থা স্থাপন করে। এক দল শোষকের স্থানে আর-এক দল শোষক প্রতিষ্ঠিত হইল। দাস-প্রথার যুগে 'আইন' দাস-মালিককে তাহার দাসদের হত্যা করার অধিকার দিয়াছিল; ভূমিদাস-প্রথার যুগে 'আইন' ভূমিদাসের মালিককে কেবল মাত্র তাহার ভূমি-দাসদের বিক্রয় করার অধিকার দিয়াছিল।

"ভূমি-দাসদের বিদ্রোহ ভূমিদাস-মালিকদের ধ্বংস করিয়া দেয় এবং ভূমিদাসপ্রথা-মূলক শোষণের ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে। কিন্তু ইহার বদলে এই বিদ্রোহ পুঁজিবাদীদের ও জমিদারদের খাড়া করে

এবং শ্রমশীল জনগণের উপর জমিদারী ও পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থা কায়েম করে। এখানেও এক দল শোষকের বদলে অন্য এক দল শোষক প্রতিষ্ঠিত হইল। ভূমিদাস-প্রথার যুগে 'আইন' ভূমি-দাসদের বিক্রয় করার অধিকার দিয়াছিল ; পুঁজিবাদী যুগে 'আইন' শ্রমশীল জনগণকে 'কেবল মাত্র' বেকার ও দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনপাত করিবার, অনাহারে ধ্বংস হইবার ও মরিবার অধিকার দেয়।

"এক দল শোষকের স্থানে অন্য দল শোষক কায়েম করা নয়, এক প্রকার শোষণের স্থানে অন্য প্রকার শোষণ স্থাপন করা নয়—সকল শোষণ দূর করা, সকল রকমের শোষকদের ধ্বংস করা, নূতন কিম্বা পুরাতন সকল রকম ধনী ও অত্যাচারীর ধ্বংস সাধন করা—একমাত্র আমাদের সোভিয়েট বিপ্লব, আমাদের অক্টোবর বিপ্লবই এই প্রশ্ন সর্ব্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছে।" *

বিনিময়-প্রথার উৎপত্তি ও বিকাশ

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, মানুষের ইতিহাসের অতি আদিম যুগে বিনিময়-প্রথার উৎপত্তি হয়। শ্রম-বিভাগ এক ধাপ অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনিময়-প্রথার ভিত্তি স্থাপিত হয়। প্রথম প্রথম শুধু প্রতিবেশী সম্প্রদায়গুলির মধ্যেই বিনিময় চলিত ; প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহার বাড়তি জিনিস-পত্র অপরের সহিত বিনিময় করিত। যদিও বিনিময় আরম্ভ হইয়াছিল সম্প্রদায়গুলির মধ্যবর্ত্তী সীমান্তে, তথাপি শীঘ্রই সম্প্রদায়গুলির আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের উপর ইহার ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তারিত হইয়া পড়িল। মুদ্রার আবির্ভাব হইল। যে-সব জিনিস সব চেয়ে বেশী বিনিময় হইত সেইগুলিই প্রথমে মুদ্রা রূপে ব্যবহৃত হইত। তাই

* স্টালিন—"লেনিনবাদ", 'যৌথফার্মের অগ্রগামী কর্ম্মীদের প্রথম নিখিল-ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা', পৃঃ ৪৫৭।

পশুপালন যে-সব গোষ্ঠীর পেশা ছিল তাহাদের সঙ্গে যখন বিনিময় হইত, তখন প্রায়ই গবাদি পশু মুদ্রা রূপে ব্যবহৃত হইত। গোষ্ঠীর ধনদৌলত, এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাবের পর ব্যক্তির ধনদৌলত, গবাদি পশুর দ্বারা পরিমাপ করা হইত।

তথাপি, বিনিময়ের উদ্ভবের পরও বহু দিন পর্য্যন্ত স্বাভাবিক উৎপাদন-প্রথা প্রচলিত ছিল। বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন না করিয়া ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জিনিস-পত্র তৈয়ার করাকে বলে **স্বাভাবিক উৎপাদন**। অপর পক্ষে বাজারে বিক্রয়ের জন্য, বিনিময়ের জন্য জিনিস-পত্র তৈয়ার করাকে বলে **পণ্য-উৎপাদন**।

দাস-প্রথা ও সামন্ততন্ত্রের যুগে স্বাভাবিক উৎপাদন-প্রথা প্রচলিত থাকে। পুঁজিবাদের পূর্ব্বে শোষণ-পদ্ধতি স্বাভাবিক উৎপাদন প্রচলনের ভিত্তিতে আবির্ভূত ও বিকশিত হয়। বিনিময়-প্রথা ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিয়া এই সকল সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি শিথিল করিয়া দেয়। এঙ্গেল্‌স্ ক্রমবিকাশের এই স্তর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"আমরা সকলেই জানি যে সমাজের প্রাথমিক স্তরে উৎপাদিত দ্রব্য উৎপাদকদের নিজেদের দ্বারাই ব্যবহৃত হইত এবং এই উৎপাদকরা স্বতই অল্পাধিক সাম্যবাদী সম্প্রদায়ে সংগঠিত ছিল। বাইরের লোকদের সঙ্গে বাড়তি জিনিস-পত্রের বিনিময় অনেক পরের ঘটনা, এবং এই ঘটনাই ছিল উৎপাদিত জিনিস-পত্রের 'পণ্যে' রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ। প্রথম প্রথম বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত সম্প্রদায়-গুলির পরস্পরের সহিতই কেবল মাত্র বিনিময় হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেই এই বিনিময়-প্রথা ছড়াইয়া পড়ে এবং সম্প্রদায়গুলিকে ছোট-বড় পরিবারে ভাঙ্গিয়া দিতে সাহায্য করে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের সংগঠন ভাঙ্গিয়া যাইবার পরও

বিনিময়কারী পরিবারগুলির কর্তারা খাঁটি কৃষকই ছিল, জমিতে নিজেরাই মেহনত করিত এবং পরিবারের অন্যান্য সভ্যদের সাহায্যে আবশ্যকীয় জিনিস-পত্রের প্রায় সবটাই নিজেদের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই প্রস্তুত করিয়া লইত; শুধু মাত্র সামান্য কয়েকটি আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র নিজেদের উদ্বৃত্ত উৎপন্নের বিনিময়ে বাহির হইতে জোগাড় করিত। পরিবারের লোকেরা যে শুধু কৃষি-কাজ বা পশুপালন করিত তাহা নহে, কৃষি-কাজ ও পশুপালন হইতে তাহারা যে-সব দ্রব্য পাইত সেগুলিকে নিজেরাই ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইত। কোথাও কোথাও এখনও পরিবারের লোকেরা নিজেদের আটা ময়দা জাঁতায় নিজেরাই পিষিয়া লয়, রুটি তৈয়ার করে, সূতা কাটে, রং করে, কাপড় ও পশম বোনে, চামড়া পাকা করে, ঘর তৈয়ার ও মেরামত করে, কাজের যন্ত্রপাতি বানায়, কামারের ও ছুতারের কাজ করে; ইহার ফলে পরিবার বা পরিবার-সমষ্টি মুখ্যত আত্মনির্ভরশীল থাকে। "অল্প যে-কয়টি জিনিস বিনিময়ের দ্বারা বা অন্যের নিকট হইতে খরিদ করিয়া পরিবারকে জোগাড় করিতে হইত, এমন কি জার্মানিতে উনিশ শতকের আরম্ভের দিকেও সেগুলি ছিল কারিগরদের উৎপন্ন দ্রব্য; অর্থাৎ এমন জিনিস যাহা কৃষক নিজে তৈয়ার করিতে আদৌ অক্ষম ছিল না, কিন্তু সে নিজে তৈয়ার করিত না এই জন্য যে কেনা জিনিস অনেক ভালো বা সস্তা ছিল।" *

অতএব স্বাভাবিক উৎপাদন-প্রথা যে কেবল দাস-প্রথার যুগে ও মধ্য যুগেই ছিল তাহা নয়, নূতনতর অবস্থাতেও ছিল। পুঁজিবাদের

* এঙ্গেল্‌স্ : 'ক্যাপিটাল সম্পর্কে', পৃঃ ১০২-৩।

শুরুতে পণ্য-উৎপাদনের প্রথা কোনো প্রকারেই খুব প্রচলিত ছিল না। পুঁজিবাদের বৃদ্ধিই স্বাভাবিক উৎপাদন-প্রথার উপর মরণ-আঘাত হানে। পুঁজিবাদের আওতাতেই পণ্য-উৎপাদন বা বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন-প্রথা উৎপাদনের প্রধান ও বিশিষ্ট রূপ হইয়া পড়ে।

পুঁজিবাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজে শ্রম-বিভাগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পণ্য-উৎপাদনের প্রথা ক্রমেই অধিকতর রূপে বিস্তার লাভ করে। এই যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইতেছে কৃষিকাজ হইতে হস্ত-শিল্প পৃথক হইয়া পড়া। চাষী তার খামারের কাজ প্রধানত স্বাভাবিক উৎপাদন রূপেই করিতে পারে, কিন্তু হস্ত-শিল্পীর বেলা এ-কথা খাটে না। পণ্য-উৎপাদনের একটা বিশিষ্টতা আছে, হস্ত-শিল্পের কাজের মধ্যে গোড়া হইতেই এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। হস্ত-শিল্পী একজোড়া জুতা বা এক প্রস্থ ঘোড়ার জিন-সাজ, একটা লাঙ্গল বা ঘোড়ার নাল, মাটি বা কাঠের বাসন যাহাই সে তৈয়ার করুক, প্রথম হইতেই সে বাজারের জন্যই তৈয়ার করে। কিন্তু তবুও পুঁজিবাদী যুগের পণ্য-উৎপাদনের প্রথার সহিত ইহার বিভিন্নতা এইখানে যে, হস্তশিল্পী যে-সমস্ত যন্ত্র-পাতি লইয়া কাজ করে সেগুলি তাহার নিজস্ব সম্পত্তি। সাধারণত সে নিজের পরিশ্রমেই সমস্ত কাজ করে। পরবর্ত্তী কালে শহরের উৎপত্তির পর হস্তশিল্পীরা বেতন দিয়া শিক্ষানবীস এবং শিক্ষিত কারিগর রাখিতে শুরু করে। সর্ব্বশেষে, কারিগর সাধারণত স্থানীয় কাঁচা মাল লইয়াই কাজ করে এবং স্থানীয় বাজারে তাহার পণ্য বিক্রয় করে। যখন বাজারে বিক্রয়ের জন্য জিনিস উৎপাদন করা হয় এবং সে-উৎপাদনের কাজে মজুরী দিয়া মজুর খাটানো হয় না, তখন সেই উৎপাদনকে আমরা বলি **সরল পণ্য-উৎপাদনের প্রথা**। এই প্রথা পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের প্রথা হইতে বিভিন্ন। এঙ্গেল্‌স্‌ বলেন—

"পুঁজিবাদী উৎপাদনের পূর্ব্বে অর্থাৎ মধ্যযুগে উৎপাদন-যন্ত্রের উপর শ্রমিকদের ব্যক্তিগত অধিকারকে ভিত্তি করিয়া ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন প্রচলিত ছিল ; কৃষিকাজ করিত ছোট ছোট চাষী—সে স্বাধীন চাষীই হোক আর ভূমিদাসই হোক ; আর শহরে ছিল ছোট ছোট হস্তশিল্পী। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি—জমি, চাষের যন্ত্রপাতি, ছোট কারখানা এবং তার কলকব্জা ইত্যাদি—সবই ছিল ব্যক্তিগত শ্রমের যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহারের জন্য তৈরী, এবং ফলে স্বভাবতই হাল্‌কা, ক্ষুদ্রাকার এবং সীমাবদ্ধ।" *

পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথা ও সরল উৎপাদন-প্রথার মধ্যে পার্থক্য কী? সরল উৎপাদন-প্রথায় কারিগর, হস্তশিল্পী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক নিজেরাই যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মাল এবং অন্যান্য উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক। উৎপাদনের এই উপকরণের সহায়তায় তাহারা নিজেরাই জিনিস-পত্র তৈয়ার করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যাপার অন্য রকম। সেখানে পুঁজিবাদীরা কারখানা ও যন্ত্রপাতির মালিক ; ভাড়াটিয়া শ্রমিকেরা সেখানে কাজ করে ; তাহাদের নিজেদের উৎপাদন-যন্ত্র কিছু থাকে না। সরল উৎপাদন-প্রথা সব সময়েই পুঁজিবাদের পূর্ব্বগামী। সরল পণ্য-উৎপাদনের প্রথা না থাকিলে পুঁজিবাদ আসিতে পারিত না। ইহা পুঁজিবাদের পথ প্রস্তুত করিয়া দেয়।

সরল পণ্য-উৎপাদনের প্রথা বিকাশ লাভ করিতে করিতে অবশ্যম্ভাবী রূপে পুঁজিতন্ত্রে গিয়া পৌছায়। ক্ষুদ্রাকার পণ্য-উৎপাদনের প্রথা পুঁজির জন্ম দেয়।

সরল পণ্যোৎপাদন-প্রথাকে পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক অগ্রদূত হিসাবে অস্বীকার করা মার্ক্সবাদের অন্যতম অপব্যাখ্যা। মার্ক্সবাদের এই বিকৃতির রাজনৈতিক গুরুত্ব সুস্পষ্ট। আসল কথা হইল এই যে, সমস্ত

* এঙ্গেল্‌স্—'আন্টি ড্যুরিং', পৃঃ ২৯৫।

পৃথিবীতে পুঁজিবাদ কায়েম হইলেও আগের উৎপাদন-প্রথার ভগ্নাবশেষ অনেক কিছু তখনও থাকিয়া যায়—যেমন লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট চাষী, কারিগর, হস্তশিল্পী প্রভৃতি। ক্ষুদে পণ্য-উৎপাদকদের এই জনসংখ্যা আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন হইলেও আসলে পুঁজিতন্ত্রের অসহনীয় চাপে ইহারা পিষ্ট হইতে থাকে এবং এমন এক মজুত বাহিনী ইহারা সৃষ্টি করে যে-বাহিনী হইতে সর্ব্বহারা শ্রেণী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামে স্বীয় মিত্র সংগ্রহ করে। সরল পণ্যোৎপাদন-প্রথার এই ভূমিকা ও গুরুত্বকে বিকৃত করিয়া দেখিলে সর্ব্বহারা-বিপ্লবের মিত্র রূপে কৃষক জনগণের ভূমিকাও পরিণামে অস্বীকার করিতে হয়। ট্রট্স্কির প্রতিবিপ্লবী মতবাদের মূলে রহিয়াছে এই বিকৃতি।

সরল পণ্য-উৎপাদনের প্রথা ও পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথার মধ্যে দুস্তর বিচ্ছেদ সৃষ্টির চেষ্টাও মার্ক্স্বাদ-লেনিনবাদের কম বিকৃতি নয়। লেনিন নিয়ত এই বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন যে, ক্ষুদ্রাকার পণ্য-উৎপাদন প্রতি দিন প্রতি ঘণ্টায় পুঁজিবাদের জন্ম দিতেছে। এই নীতি অস্বীকার করিলে—দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রচলিত অবস্থায়—দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের মতবাদে গিয়া পৌছিতে হয় এবং তাহাদের মতানুযায়ী গ্রামে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের প্রথাকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে হয়। ফলে, বৃহদাকার সামাজিক উৎপাদনের নীতি অনুযায়ী পল্লীর সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি হয় না।

সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাস-প্রথার মধ্যেই পুঁজিবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। পুঁজির প্রাচীনতম রূপ হইতেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ও তেজারতি কারবারের জন্য ব্যবহৃত পুঁজি। পুরাতন স্বাভাবিক উৎপাদন-প্রথার মধ্যে বিনিময় যতই বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল ততই বণিকদের কাজকর্ম্মের

গুরুত্ব বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পুঁজিবাদী বণিকেরা ভূমিদাসদের মালিক জমিদারদের নানা প্রকার বিলাসিতার দ্রব্য সরবরাহ করিতে লাগিল এবং এইরূপে প্রচুর লাভবান হইল। জমিদাররা ভূমিদাসদের নিংড়াইয়া যে-খাজনা উসুল করিত তাহার একটা অংশ এইরূপে ব্যবসাদারী পুঁজির প্রতিনিধি বণিকদের পকেটে স্থান লাভ করিতে লাগিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের

পুঁজিবাদী উৎপাদনের জন্ম

প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেও তেজারতি কারবার প্রসার লাভ করিতে লাগিল। জমিদার, রাজা-মহারাজা ও রাজ-সরকারের ক্রমেই বেশী বেশী টাকার দরকার হইতে লাগিল, কারণ উন্মত্ত বিলাসিতায় এবং অপচয়ে ও নিরন্তর যুদ্ধে অসংখ্য টাকা পয়সা খরচ হইয়া যাইত। এইরূপে মহাজনদের ব্যবসার ভিত্তি স্থাপিত হইল। সামন্ততান্ত্রিক ভুঁইয়াদের অত্যধিক সুদে টাকা ধার দিয়া মহাজনেরা ভূমি-দাসদের পরিশ্রম শোষণ করিয়া যে-সম্পদ আদায় হইত তাহার একটা মোটা অংশ আত্মসাৎ করিতে লাগিল।

ব্যবসাদারী ও তেজারতি পুঁজি সামন্ততান্ত্রিক সমাজে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অক্লান্ত ভাবে এই সমাজের ভিত্তি দুর্ব্বল করিয়া দিতে লাগিল ও অবশেষে ইহাকে ধ্বংস করিল। বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জমিদাররা ভূমি-দাসদের উপর তাহাদের শোষণ ক্রমেই বাড়াইয়া দিতে লাগিল। অত্যধিক শোষণ ভূমিদাস-প্রথার ভিত্তি কৃষক-অর্থনীতির কাঠামো দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। ভূমিদাসেরা নিস্ব হইয়া পড়িল, চাষীরা ভিক্ষুকে পরিণত হইয়া অনশনে জীবন কাটাইতে লাগিল ; জমিদারদের জন্য বিপুল অর্থ আয় করিয়া দেওয়া তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব হইয়া উঠিল না। এই সুযোগে মহাজনী-পুঁজি শুঁড় বাড়াইয়া জমিদারদের জমিদারী মরণগ্রাসে জড়াইয়া ধরিল এবং ইহার সমস্ত জীবনীশক্তি নিংড়াইয়া লইল। এইরূপে ভূমিদাস-প্রথার ধ্বংস হইয়া পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথার বিকাশের পথ প্রস্তুত হইল।

ব্যবসাদারী পুঁজি প্রথম প্রথম শুধু ব্যবসার জন্যই ব্যবহৃত হইত। হস্তশিল্পী ও ভূমি-দাসদের তৈরী জিনিস-পত্র ও দূর দেশ হইতে আমদানী করা জিনিস-পত্রে ব্যবসা বাণিজ্য চলিত। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার লাভ করায় এই সব উৎস হইতে আর যথেষ্ট পরিমাণে পণ্যাদি জোগাড় হইতেছিল না। ক্ষুদ্রাকার হস্তশিল্পে যে-সামান্য পরিমাণ পণ্য তৈরী হইত তাহা শুধুমাত্র স্থানীয় বাজারের পক্ষেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যখন দূর দূর দেশেও বাজার ছড়াইয়া পড়িল তখন উৎপাদন বাড়াইবার আবশ্যকতা দেখা দিল।

কিন্তু কেবল মাত্র পুঁজির দ্বারাই উৎপাদন এরূপ ভাবে বাড়ানো সম্ভব ছিল। ক্ষুদ্রাকার পণ্য-উৎপাদনের পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব ছিল না; ইহার বিস্তারের সীমা খুব সঙ্কীর্ণ ছিল। এরূপ অবস্থায় ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন-প্রথা লয় পাইয়া গেল ও তাহার স্থানে পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথা দেখা দিল; পূর্ব্বের যুগের সকল রকম শোষণ-ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হইয়া গেল; কিন্তু তাহার স্থানে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের শেষ রূপ কায়েম হইল, সে-রূপ হইল পুঁজিবাদী শোষণপ্রথা।

ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন হইতে পুঁজিবাদী উৎপাদনে রূপান্তর সম্বন্ধে লেনিন এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—

"পুরাতন অবস্থায় প্রায় সমস্ত ধন-সম্পদই ছোট ছোট মালিকেরা তৈয়ার করিত এবং ইহারাই ছিল জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ। লোক স্থায়ী ভাবে গ্রামে বসবাস করিত এবং অধিকাংশ জিনিস তাহারা যাহা তৈয়ার করিত তাহা হয় নিজেদের কাজেই ব্যবহার করিত নতুবা আশে-পাশের গ্রামের হাটে বিক্রয় করিত। এই গ্রামের হাটগুলির বাইরের বাজারের সঙ্গে বিশেষ কিছু সম্বন্ধ ছিল না। ইহারা আবার জমিদার-দের জন্যও জিনিস-পত্র তৈয়ার করিত এবং জমিদাররা প্রধানত

নিজেদের ব্যবহারের জন্যই ইহাদের দিয়া জোর করিয়া নানা প্রকার জিনিস-পত্র তৈয়ার করাইয়া লইত। বাড়িতে উৎপন্ন কাঁচা মাল কারিগরদের দেওয়া হইত নানা প্রকার জিনিস-পত্র তৈয়ার করার জন্য। এই কারিগরেরা গ্রামেই বাস করিত, কখনও কখনও বা আশেপাশের গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজ করিত।

"কিন্তু ভূমি-দাসদের মুক্তির সময় হইতেই জনসাধারণের জীবন ধারণের এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইতে লাগিল। ছোট ছোট কারিগর-দের দোকানের পরিবর্ত্তে বিরাট বিরাট কারখানা দেখা দিল, এবং এইরূপ বড় কারখানার সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এই কারখানাগুলির প্রতিযোগিতায় ছোট ছোট কারিগরেরা পাট তুলিতে বাধ্য হইল এবং দিনমজুরে পরিণত হইল। এই কারখানাগুলিতে হাজার হাজার মজুর একযোগে কাজ করিতে বাধ্য হয় এবং প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করে। এই সকল পণ্য সারা রুশিয়াতে বিক্রী হয়।" *

"ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের স্থান সর্ব্বত্রই বৃহদাকার উৎপাদন দখল করিয়া লইয়াছে। বৃহদাকার উৎপাদনে শ্রমিকরা শুধু ভাড়াটিয়া শ্রমিক, এবং মজুরীর বদলে পুঁজিপতিদের জন্য তাহারা কাজ করিয়া দেয়। পুঁজিপতি বিশাল পুঁজির মালিক; বড় বড় কারখানা সে তৈয়ার করায়, প্রচুর কাঁচা মাল কেনে, এবং মজুরদের একযোগে খাটাইয়া বৃহদাকারে উৎপাদন করিয়া যে-মুনাফা লাভ হয় তাহা সে নিজেই আত্মসাৎ করে। উৎপাদন পুঁজিবাদী উৎপাদনে পরিণত হয় এবং ইহা নির্দ্দয় ভাবে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের ধ্বংস করিয়া ফেলে,

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রোগ্রামের খসড়া ও ব্যাখ্যা', পৃঃ ৪৭১-৭২।

তাহাদের স্থিতিশীল গ্রাম্য জীবন ধ্বংস হইয়া যায়; তখন গ্রাম ছাড়িয়া তাহারা দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় সাধারণ মজুর হিসাবে পুঁজিপতির নিকট নিজেদের শ্রম-শক্তি বিক্রয় করিবার জন্য। এক ক্রমবর্দ্ধমান জনস্রোত গ্রাম্য জীবন হইতে ও চাষবাস হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহারা শহরে, কারখানায় ও শিল্পকেন্দ্রের আশেপাশের গ্রামে গিয়া জড়ো হয় এবং সেখানে এমন এক বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি করে যাহাদের সম্পত্তি বলিতে কিছু নাই, যাহারা সর্ব্বহারা, যাহারা শুধু নিজেদের শ্রম-শক্তি বিক্রয় করিয়াই বাঁচে।" *

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। শ্রেণী-বিশিষ্ট সমাজের আবির্ভাবের পূর্ব্বে মানুষ কি ভাবে বাস করিত ?

২। শ্রেণীর উৎপত্তি হইল কিরূপে ?

৩। শ্রেণী-শোষণের প্রধান ঐতিহাসিক রূপ কি কি ?

৪। দাস-প্রথায় শোষক ও শোষিতের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল ?

৫। ভূমিদাস-প্রথায় শোষক ও শোষিতের মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল ?

৬। পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের বিশেষ লক্ষণ কি ?

৭। বিনিময়-প্রথার উৎপত্তি ও বিকাশ হইল কিরূপে ?

৮। ক্ষুদ্রাকার পণ্য-উৎপাদন পুঁজিতন্ত্রের জন্ম দেয় কিরূপে ?

* ঐ, পৃঃ ৪৭৩।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পণ্য-উৎপাদন

পুঁজিবাদী উৎপাদনের দুইটি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। প্রথমত, পুঁজিবাদী আওতায় পণ্য-উৎপাদনের আবির্ভাব। দ্বিতীয়ত, কেবলমাত্র মানুষের শ্রমের ফলই নয়, পরন্তু খোদ শ্রম-শক্তিও পণ্য হইয়া পড়ে।

পণ্য-উৎপাদন ব্যতিরেকে পুঁজিতন্ত্রের কল্পনাও করা চলে না। পক্ষান্তরে পুঁজিতন্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশের বহু পূর্ব্বেই পণ্য-উৎপাদন বিদ্যমান ছিল। তবুও কিন্তু কেবল মাত্র পুঁজিবাদের আওতাতেই পণ্য-উৎপাদন সার্ব্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে।

সুতরাং উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি উপলব্ধি করিবার জন্য প্রথম প্রয়োজন পণ্য-উৎপাদন, তাহার বৈশিষ্ট্য এবং নিয়মগুলি অনুধাবন করা।

পুঁজিবাদী দেশে উৎপাদন চালানো হয় পরিকল্পনাহীন ভাবে। যাবতীয় কলকারখানাই হইল পুঁজিপতির সম্পত্তি। এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিই **পণ্য** উৎপাদন করে বাজারে বিক্রয়ের জন্য। কিন্তু পুঁজিপতিকে কেহই বলে না তাহার প্রতিষ্ঠানে কোন কোন পণ্য বা কী পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন করিতে হইবে। কল-কারখানার মালিক তাহার খুশি মত উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে অথবা সমস্ত কাজ একদম বন্ধ করিয়া দিতে পারে। জনসাধারণের খাদ্য পরিধেয় প্রভৃতি জীবন-যাপনের উপকরণ আছে কি-না সে-জন্য পুঁজিপতির কোনো মাথাব্যথা নাই। প্রত্যেক কল-কারখানার মালিক একটি মাত্র বিষয়ই

চিন্তা করে: কী প্রকারে অধিক মুনাফা অর্জ্জন করা যায়। কোনো ব্যবসায় মুনাফা-জনক মনে হইলে তাহার বিষয় বিবেচনা করে সে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে, মুনাফার কোনো আশা না দেখিলে সেই ব্যবসায় লইয়া সে আর মাথা ঘামায় না।

এই ব্যবস্থায় উৎপাদন থাকে সম্পূর্ণ রূপে পুঁজিপতিদের কবলে; শ্রমরত জনসাধারণকে নিদারুণ ভাবে শোষণ করিয়া নিজেদের জন্য যত বেশী সম্ভব মুনাফা আদায়ের একমাত্র স্বার্থ লইয়াই উৎপাদন পরিচালনা করে এই সব পুঁজিপতি। সোভিয়েট ইউনিয়ন ব্যতীত সারা দুনিয়ায় বর্ত্তমানে প্রচলিত রহিয়াছে এই প্রকার ব্যবস্থা। সোভিয়েট ইউনিয়নে শাসন-শক্তি রহিয়াছে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে, এবং সেখানে পরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থা বর্ত্তমান।

পুঁজিবাদের আওতায় উৎপাদনে চলে বিশৃঙ্খলা; সামাজিক উৎপাদনের কোনো পরিকল্পিত বন্দোবস্ত থাকে না বা থাকিতে পারে না।

> "স্বীয় মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রমিককে আরও উৎপীড়ন করিবার জন্য পুঁজি কারখানার মধ্যে শ্রমিককে সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সমগ্র ভাবে সামাজিক উৎপাদনে বিশৃঙ্খলা থাকিয়া যায় ও বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার ফলে সঙ্কট দেখা দেয়; তখন সঞ্চিত সম্পদসম্ভারের ক্রেতা মিলে না, এবং কাজ না পাওয়ায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক উৎসন্ন যায় অথবা বুভুক্ষু অবস্থায় দিন কাটায়।" *

পুঁজিবাদের আওতায় প্রচলিত উৎপাদনে যে-বিশৃঙ্খলা তাহার বৈশিষ্ট্য হইতেছে সূক্ষ্ম কলকৌশল, এই কলকৌশল উপলব্ধি করিবার চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হইবে। পুঁজিবাদী সমাজে পণ্য-উৎপাদন বিদ্যমান।

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ১৭শ খণ্ড, 'টেলর পদ্ধতি—যন্ত্রের হাতে মানুষের দাসত্ব', পৃঃ ২৪৮, রুশ সংস্করণ।

ধরা যাক, এক পুঁজিপতির একটি কারখানা রেড়ির তেল উৎপন্ন করে। ইহার অর্থ কি এই যে সমস্ত রেড়ির তেল মালিক নিজেই খাইয়া ফেলে? অথবা একটি পুঁজিবাদী দোকানে ব্যাপক ভাবে শবাধার প্রস্তুত হয়; শবাধারগুলি যে মালিকের জন্য নয় তাহা প্রত্যক্ষ। বিরাটকায় কারখানা প্রভূত পরিমাণে উৎপাদন করে লোহ ও ইস্পাত; মালিক যে নিজের জন্য এই ধাতু চাহে না তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট। পুঁজিবাদী কারখানাসমূহে উৎপাদিত নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার উৎপন্ন হয় বিক্রয়ের জন্য, বাজারের জন্য। নিজের ব্যবহারের জন্য না হইয়া বিক্রয়ের জন্য সমস্ত শ্রমজাত দ্রব্যকেই বলে **পণ্য**।

পণ্য কি?

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বাভাবিক আর্থিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক পরিবার বা জন-সঙ্ঘ প্রয়োজনীয় সব কিছুই নিজেরাই উৎপাদন করিত, এবং পণ্য-উৎপাদনই কেবল ক্রমে ক্রমে এই ব্যবস্থাকে শিথিল করিয়া ধ্বংস করে। স্বাভাবিক পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থা বহু যুগ ধরিয়া বিদ্যমান ছিল। অতীতের প্রাক্-পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থা অর্থাৎ দাসত্ব ও সামন্ত-তন্ত্র প্রচলিত স্বাভাবিক পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থার পাশাপাশিই বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু পুঁজিতন্ত্র সে-রকমের নয়। শুরু হইতেই এই ব্যবস্থা বিনিময়ের বিকাশ, পণ্য-উৎপাদনের বিকাশের সহিত সংযুক্ত।

> "যে-সব সমাজে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাদের সম্পদ প্রভূত পণ্য সঞ্চয়ের আকারে আত্মপ্রকাশ করে; ইহার একক (unit) হইল পৃথক পৃথক প্রতিটি পণ্য।" *

এই কথা দিয়াই শুরু হইয়াছে মার্ক্সের প্রধানতম গ্রন্থ **ক্যাপিটাল**। মার্ক্সের এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য পুঁজিবাদী সমাজের নিয়ামক অর্থনৈতিক নিয়মসমূহের আবিষ্কার করা। প্রথমেই পণ্যের বিশ্লেষণ এবং

* মার্ক্স্:—'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১।

পণ্যোৎপাদনের নিয়ামক নিয়ম উদ্ঘাটন করিয়া মার্ক্স্ তাঁহার গ্রন্থ শুরু করিয়াছেন।

মনুষ্যশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যকে মানুষের কোনো-না-কোনো অভাব পূরণ করিতেই হইবে ; অন্যথায় তাহার জন্য শ্রম ব্যয় করার কোনো সার্থকতাই থাকে না। শ্রমজাত দ্রব্যের এই গুণটিকে বলে তাহার ব্যবহার-মূল্য ; যেমন ঘড়ির ব্যবহার-মূল্য হইল তাহার সময় জ্ঞাপন। মনুষ্য-শ্রমে উৎপন্ন না হইয়াও কিন্তু অনেক জিনিসের ব্যবহার-মূল্য আছে—যেমন, উৎস-মুখের জল, জঙ্গলের ফল ইত্যাদি। স্বাভাবিক উৎপাদন এবং পণ্য-উৎপাদন—এই উভয় উৎপাদনেই ব্যবহার-মূল্যের সাক্ষাত মিলে। নিজের ব্যবহারের জন্য যে-ফসল কৃষক ফলায় তাহাতে মেটে তাহার খাদ্যের প্রয়োজন ; সুতরাং ফসলের ব্যবহার মূল্য-আছে।

পণ্যের দুইটি গুণ

কিন্তু পুঁজিবাদী দেশে বিক্রয়ের জন্য যে-ফসল কৃষক উৎপাদন করে তাহাকে বলে পণ্য ; ইহা আমরা পূর্ব্বেই অবগত আছি। এই ফসলেরও ব্যবহার-মূল্য থাকে, কারণ ইহা মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন মেটায়। কিন্তু যদি কোনো কারণে এই গুণ নষ্ট হইয়া যায় (যেমন, জিনিস যদি পচিয়া যায় বা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে), তবে কেহই আর সে-ফসল কিনিবে না।

একই সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণও এই ফসল লাভ করে। এই ফসল পণ্যে পরিণত হইয়া উঠে ; অন্য যে-কোনো পণ্যের সহিত ইহার বিনিময় হইতে পারে। এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম যাহা লক্ষ্যে পড়ে তাহা হইল এই যে, বিনিময় হইবার মত গুণ পণ্যের আছে এবং অন্যান্য বহু পণ্যের সহিত তাহার বিনিময় হয়।

উৎপন্ন দ্রব্য যখন পণ্যে পরিণত হয় অর্থাৎ যখন বিনিময়ের

জন্য ইহা উৎপাদিত হয়, তখন উৎপন্ন দ্রব্য যে নূতন বৈশিষ্ট্য লাভ করে তাহা পণ্যগত আর্থিক ব্যবস্থায় এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে।

> "পণ্য হইল, প্রথমত, এমন কোনো জিনিস যাহা মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে; দ্বিতীয়ত, পণ্য হইল এমন একটি জিনিস যাহা অপরাপর জিনিসের সহিত বিনিময় করা হয়। দ্রব্যের উপযোগিতাই তাহার **ব্যবহার-মূল্যের** কারণ। বিনিময়-মূল্য (বা সোজাসুজি মূল্য) সর্ব্বপ্রথম অনুপাত রূপে আত্মপ্রকাশ করে; এই অনুপাতে এক জাতীয় ব্যবহার-মূল্যের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অপর জাতীয় ব্যবহার-মূল্যের এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার সহিত বিনিময় হয়। এই প্রকারের লক্ষ লক্ষ বিনিময়ের ভিতর দিয়া দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, নিতান্ত বিভিন্ন ধরনের এবং পরস্পরের সহিত তুলনার অযোগ্য নানা রকমের ব্যবহার-মূল্যকে পরস্পরের সহিত সমান করিয়া ফেলা হইতেছে।" *

পণ্যের মূল্য ও ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে এক **বিরোধ** রহিয়াছে। উৎপাদকের নিকটে পণ্যের কোনো ব্যবহার-মূল্যই নাই, ব্যবহার-মূল্য আছে অপরের নিকটে। অপর পক্ষে, যে ব্যবহারের জন্য পণ্য ক্রয় করে তাহার নিকটে পণ্যের কেবল ব্যবহার-মূল্যই আছে এবং পণ্য আর তাহার নিকট মূল্য নয়। পণ্য বিনিময় করিয়া উৎপাদক পায় মূল্য। কিন্তু সে আর তখন পণ্যের ব্যবহার-মূল্য কাজে লাগাইতে পারে না; কারণ পণ্য তখন চলিয়া গিয়াছে অন্যের হাতে। পণ্য হইল এমন একটি উৎপন্ন দ্রব্য যাহা প্রত্যক্ষ ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত না হইয়া উৎপাদিত হয় বাজারে বিক্রয়ের জন্য। অতএব পণ্য হইল বিশেষ এক সামাজিক সম্পর্কের প্রতিনিধি। পণ্যের উৎপাদক ও সমগ্র সমাজের

* লেনিন: 'মার্ক্স্-এঞ্জেল্স্-মার্ক্স্বাদ', পৃঃ ১৫।

মধ্যে যে-সম্পর্ক বর্ত্তমান ইহা হইল তাহার প্রতিনিধি। অবশ্য প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ইহা নয়। সমাজ প্রত্যেক উৎপাদককে বলে না যে, কোন জিনিস এবং কী পরিমাণে উৎপাদন করিতে হইবে। পণ্য-উৎপাদনের আওতায় সমাজের সমগ্র উৎপাদন-প্রক্রিয়া পরিকল্পিত ও সচেতন ভাবে পরিচালিত হয় না এবং হইতেও পারে না।

পণ্যের মূল্য কিসের উপর নির্ভর করে? কোনো কোনো পণ্য দুর্ম্মূল্য আবার কোনো কোনোটি বা সস্তা। মূল্যের এই পার্থক্যের কারণ কী? পণ্যের ব্যবহার-মূল্যের পার্থক্য এত হয় যে তাহাদিগকে পরিমাণগত ভাবে তুলনাও করা চলে না। যেমন, ঢালা লোহা (Pig iron) এবং সেঁকা মাংসের ব্যবহার-মূল্যে সাদৃশ্য কোথায়? সুতরাং মূল্যের গূঢ় রহস্য আমাদের খুঁজিতে হইবে অন্য কোনো বিষয়ের মধ্যে, ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে নয়। মার্ক্‌স্ বলেন:

মূল্য সৃষ্টি হয় শ্রমের দ্বারা

"আমরা যদি পণ্যের ব্যবহার-মূল্যকে আলোচনার বাইরে রাখি, তবে তাহাদের (পণ্যের) একটি সাধারণ গুণই অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইল এই যে তাহারা শ্রমজাত দ্রব্য।" *

'পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় তাহার উৎপাদনে ব্যয়িত মনুষ্যশ্রমের পরিমাণের দ্বারা।' বিনিময় সুপ্রচলিত না হওয়া পর্য্যন্ত উৎপন্ন পণ্যসমূহের বিনিময় হয় আকস্মিক অনুপাত অনুসারে। আদিম যুগে একজন শিকারী কৃষিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের একজন সভ্যের সাক্ষাত পাইলে শস্যের সহিত মাংস বিনিময় করিত। তখন অনুপাত নির্দ্ধারিত হইত আকস্মিক অবস্থার দ্বারা। কিন্তু বিনিময়ের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বিষয়ে মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

* মার্ক্‌স্: 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪।

স্বাভাবিক আর্থিক ব্যবস্থার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে, বিনিময়কৃত দ্রব্যের উৎপাদনে যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হইয়াছে বিনিময়ের অনুপাত ক্রমশই তাহারই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। সহজ পণ্য-উৎপাদনের যুগে যখন একজন কৃষক কিছু শস্য একজন কারিগরের প্রস্তুত কুঠারের সহিত বিনিময় করিত, তখন কুঠার প্রস্তুত করিতে কারিগরের যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয় হইয়াছে মোটামুটি সেই পরিমাণ শ্রমে উৎপন্ন শস্য কৃষক কারিগরকে দিত।

পুঁজিবাদের উৎপত্তি হওয়ার পূর্ব্বে সহজ পণ্য-উৎপাদনের অবস্থায় পণ্য কিরূপে তাহার মূল্য অনুযায়ী বিনিময় হইত, এঙ্গেল্‌স্ তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

"মধ্যযুগের কৃষক তাই ভালো রকমেই সঠিক ভাবে জানিত যে বিনিময়ের দ্বারা যে-সব পণ্য সে পায় তাহাদের উৎপাদনে কী পরিমাণ শ্রম-সময় (labour time) আবশ্যক। কামার এবং গাড়োয়ান দর্জি ও মুচির ন্যায় তাহার চোখের সামনেই কাজ করিত। আমার যৌবনকালেও দর্জি ও মুচি আমাদের রাইনের তীরে বসবাসকারী কৃষকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গৃহজাত বস্ত্র ও চামড়ার দ্বারা পোশাক পরিচ্ছদ ও জুতা প্রস্তুত করিত। কৃষক এবং যাহাদের নিকট হইতে কৃষক ক্রয় করিত তাহারা উভয়েই শ্রমজীবী ; বিনিময়কৃত দ্রব্যসম্ভার তাহাদের নিজেদের শ্রমেরই উৎপন্ন জিনিস। এই সব দ্রব্য উৎপাদন করিতে তাহারা কী ব্যয় করিত ? তাহারা ব্যয় করিত শ্রম এবং কেবলমাত্র শ্রম ; কাজের হাতিয়ার পরিবর্ত্তনের জন্য, কাঁচা মালের উৎপাদনের জন্য এবং তাহাদের সাহায্যে কাজ করিবার জন্য স্বীয় শ্রমশক্তি ব্যতীত তাহারা আর কিছুই ব্যয় করে না : কাজেই এই সব উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের সমানুপাত ব্যতীত

তাহারা তাহাদের উৎপন্ন পণ্য অন্যান্য শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্যের সহিত বিনিময় কিরূপে করিতে পারিত? বিনিময়ে সম্পর্কিত আয়তনের (ম্যাগ্‌নিটিউড) পরিমাণগত (কোয়ান্‌টিটেটিভ্‌) নির্দ্ধারণের জন্য এই সব উৎপাদনে যে-শ্রমসময় ব্যয়িত হইয়াছিল কেবল তাহাই একমাত্র সঙ্গত মাপদণ্ড; শুধু তাহাই নয়, পরন্তু অন্য যে-কোনো মাপদণ্ড একেবারেই অচিন্ত্যনীয়। অথবা কেহ কি বিশ্বাস করেন যে কৃষক ও কারিগর এতই নির্ব্বোধ যে, যে-জিনিস উৎপাদন করিতে দশ ঘণ্টার শ্রম লাগিয়াছে সে-জিনিস তাহারা বিনিময় করিবে এমন কোনো দ্রব্যের সহিত যাহা উৎপাদন করিতে লাগিয়াছে মাত্র এক ঘণ্টার শ্রম? কৃষকদের স্বাভাবিক পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থার গোটা যুগে বিনিময়কৃত পণ্যের পরিমাণ উত্তরোত্তর নির্দ্ধারিত হইয়া চলিয়াছিল পণ্যে নিয়োজিত শ্রমের দ্বারা, ইহা ভিন্ন অন্য কোনো প্রকার বিনিময় সম্ভব ছিল না।

"নাগরিক কারিগরদের উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত কৃষকদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় সম্পর্কেও ইহা সত্য। আদিতে নগরে হাটের দিনে বণিকের মধ্যস্থতা ব্যতীতই এই বিনিময় সরাসরি ভাবে চলিত; এক্ষেত্রে কৃষক স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে এবং নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে। এই ক্ষেত্রেও কেবল যে কৃষকই জানে কারিগর কী অবস্থায় কাজ করে তাহা নয়, পরন্তু কারিগরও জানে কৃষকের শ্রমের অবস্থা। কারণ সে এখনও কিছু পরিমাণে নিজেই কৃষক; তাহার কেবল যে একখানি শাক-সব্জীর বাগান ও একটি ফলের বাগান আছে তাহাই নয়, বরং প্রায়ই দেখা যায় যে একফালি কৃষি-উপযোগী জমি, দুই একটি গরু, শূকর, মোরগ প্রভৃতিও তাহার আছে।" *

* এঙ্গেল্‌স্: 'ক্যাপিটাল সম্পর্কে', পৃঃ ১০৪।

কতকগুলি স্বতোসিদ্ধ ঘটনায় এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, পণ্যসমূহের বিনিময় হয় উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রম অনুসারে। এক সময়ে খুব দুর্মূল্য ছিল এমন বহু বহু পণ্যই অধুনা অত্যন্ত সস্তা হইয়াছে, কারণ আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব পণ্য উৎপাদন করিতে প্রয়োজন হয় অল্পতর পরিমাণ শ্রম। যেমন, যে-এলুমিনিয়ম হইতে রন্ধনশালার বাসনপত্র এবং অপরাপর বহু জিনিস প্রস্তুত হয়, কয়েক দশক পূর্ব্বেও তাহা ছিল রৌপ্যের অপেক্ষা ৮-১০ গুণ দামী। তখন এক সের এলুমিনিয়মে খরচ পড়িত প্রায় ৬৭৫৲ টাকা। কিন্তু বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্প শ্রমে এলুমিনিয়ম উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে, ফলে যুদ্ধের পূর্ব্বেই এক সের এলুমিনিয়মের দাম প্রায় তেরো আনায় নামিয়া গিয়া হাজার গুণ সস্তা হইয়া পড়ে। এত সস্তা হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, ইহার উৎপাদনে এখন আবশ্যক হয় অতি অল্প শ্রম।

সুতরাং পণ্যের মূল্য নির্ভর করে **তাহার উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণের** উপর। একই পরিমাণ শ্রমের দ্বারা অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিলে আমরা বলি, শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; অপর পক্ষে, কম উৎপাদন করিলে বলি শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। ইহা স্বতঃপ্রত্যক্ষ যে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধির অর্থ হইল এই যে, উপস্থিত পণ্যসমূহের যে-কোনো একটির উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ **হ্রাস**। ইহার ফলে মূল্য হ্রাস পাইবে, এবং এই পণ্য আরও সস্তা হইবে। পক্ষান্তরে, উৎপাদন-ক্ষমতার হ্রাস পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে। সুতরাং বলা হয় যে, শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা এবং উৎপাদিত পণ্যের প্রত্যেকটির মূল্যের অনুপাত পরস্পর-বিপরীত (অর্থাৎ, একটি বাড়িলে অপরটি কমে)। সেইজন্যই মার্ক্স

বাল

"পণ্যের মূল্য...পণ্যের মধ্যে সঞ্চিত শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার বিপরীত অনুপাতে বাড়ে কমে।" *

পণ্যের উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম হইতেই দেখা দেয় পণ্যের মূল্য। পণ্যের মূল্য পণ্যের মধ্যে সঞ্চিত (অথবা অন্তর্ভুক্ত) নির্দ্দিষ্ট শ্রম-সময় ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু এক পণ্যের সহিত অপরের তুলনা করিলেই কেবল মূল্য নিজেকে প্রকট করিয়া তোলে। ধরা যাক যে ২৭ মন লোহ এবং এক সের রৌপ্যের মধ্যে একই পরিমাণ শ্রম সঞ্চিত বা অন্তর্ভুক্ত আছে। তাহা হইলে ২৭ মন লোহের মূল্য এক সের রৌপ্যের মূল্যের সমান হইবে। কোনো পণ্যের মূল্য অপর একটি পণ্যের মূল্যের তুলনায় প্রকাশিত হইলে তাহাকে বলা হয় ইহার বিনিময়-মূল্য। সঙ্গে সঙ্গে মূল্য প্রকটিত হয় বিনিময়-মূল্যের রূপে। এই রূপের মধ্যে যে-মূল্য দেখিতেছি তাহা হইল পণ্যে সঞ্চিত বা অন্তর্ভুক্ত শ্রম-সময়, এই কথা স্পষ্ট মনে রাখিতে হইবে।

পণ্য-উৎপাদনের উন্নত অবস্থায় অর্থাৎ যখন মুদ্রার সহায়তায় পণ্য বিনিময় হয়, তখন প্রত্যেক পণ্যই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার সহিত তুলনা করা হয়। পণ্যের মূল্য ব্যক্ত করা হয় মুদ্রার হিসাবে (অর্থাৎ টাকা আনা পাই-এ)। বিনিময়-মূল্যই হইয়া পড়ে পণ্যের দাম (Price)। **মুদ্রার হিসাবে ব্যক্ত পণ্যের মূল্যই হইল দাম।**

পণ্যের অন্তর্নিহিত বিরোধ বুঝিতে হইলে যে-শ্রমের দ্বারা পণ্য উৎপন্ন হয় তাহার বিশেষত্ব লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

পণ্য-বিনিময়ের ভিতর দিয়া মানুষ নানা প্রকারের শ্রমের তুলনা করে। একজন মুচির শ্রম একজন ঢালাই কারিগরের শ্রম হইতে ভিন্ন রকমের। খনি-মজুরের শ্রমের সহিত দর্জির শ্রমের সাদৃশ্য খুব

* মার্কস্: 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭।

নির্ব্বিশেষ ও বিশেষ শ্রম

কমই আছে। প্রতিটি পণ্যের মধ্যে রহিয়াছে কোনো বিশেষ বৃত্তি বা শিল্পের কোনো বিশেষ শাখার শ্রম। সকল পণ্যের মধ্যে যাহা সাধারণ তাহা হইল নির্ব্বিশেষ (abstract) মনুষ্যশ্রম। এই নির্ব্বিশেষ মনুষ্যশ্রম উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র শাখার বিশেষ (concrete) শ্রম হইতে পৃথক।

"কোনো সমাজের সমগ্র শ্রমশক্তি (সমস্ত পণ্যের মোট মূল্যে যাহা প্রকাশিত) হইল এক অভিন্ন মনুষ্যশ্রমশক্তি। লক্ষ লক্ষ বিনিময়ের কাজে ইহা প্রমাণ করে।" *

প্রত্যেকটি বিশেষ পণ্য এই সাধারণ নির্ব্বিশেষ মনুষ্যশ্রমের মাত্র একটি নির্দ্দিষ্ট অংশই ব্যক্ত করে।

বিশেষ শ্রম উৎপাদন করে ব্যবহার-মূল্য। মুচির বিশেষ শ্রমে উৎপন্ন হয় জুতা, খনি-মজুরের বিশেষ শ্রমে উৎপন্ন হয় কয়লা। এই সব পণ্যের মূল্যে অভিব্যক্ত হয় কেবল মনুষ্যশ্রম অর্থাৎ পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থায় সাধারণ ভাবে মনুষ্যশ্রমের ব্যয়।

"শারীরবিজ্ঞানের দিক হইতে বলিতে গেলে, সমস্ত শ্রমই এক দিকে মানুষের শ্রমশক্তির ব্যয়, এবং অভিন্ন নির্ব্বিশেষ মনুষ্যশ্রম রূপে ইহাই আবার সৃষ্টি ও গঠন করে পণ্যের মূল্য। অপর পক্ষে সমস্ত শ্রমই হইল বিশেষ ধরনে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে মনুষ্যশ্রমশক্তির ব্যয়; এবং এই রূপে, বিশেষ (concrete) কার্য্যকরী শ্রম রূপে, ইহাই সৃষ্টি করে ব্যবহার-মূল্য।" †

এই একই শ্রম পণ্য-উৎপাদনে বিশেষ শ্রম ও নির্ব্বিশেষ শ্রম উভয়ই। ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন করে বলিয়া ইহা বিশেষ শ্রম এবং মূল্য

* লেনিন : 'মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্-মার্ক্স্বাদ,' "কার্ল মার্ক্স্", পৃঃ ১৬।

† মার্ক্স্ : 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪।

উৎপাদন করে বলিয়া ইহা নির্ব্বিশেষ শ্রম। একদিকে প্রত্যেক উৎপাদকই জুতা, কয়লা, কাপড় ইত্যাদি ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন করে। ইহাতেই প্রকাশ পায় মুচি, খনি-মজুর, তাঁতী প্রভৃতির বিশেষ শ্রম। কিন্তু আবার এই একই মুচি, খনি-মজুর, তাঁতী উৎপাদন করে জুতা, কয়লা ও কাপড়ের মূল্য। নিজেদের প্রত্যক্ষ ব্যবহারের জন্য তাহারা এই সমস্ত উৎপাদন করে না, উৎপাদন করে বাজারে বিনিময়ের জন্য। তাহারা জুতা, কয়লা, কাপড় উৎপাদন করে মূল্যসম্বলিত পণ্য হিসাবে। আবার মূল্য উৎপাদিত হয় নির্ব্বিশেষ সার্ব্বজনীন মনুষ্যশ্রমের দ্বারা।

পণ্য প্রথমাবধিই নিজের দ্বৈত রূপে প্রকাশিত হয়ঃ ব্যবহার-মূল্য রূপে এবং শুধু মূল্য রূপে। এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে শ্রমেরও (এই সব পণ্যে যে-শ্রম রূপ লাভ করিয়াছে, পুঁজিবাদী উৎপাদনে যে-শ্রম নিয়োজিত হইয়াছে) দুইটি প্রকৃতি আছে, যাহাকে বলা যায় দ্বৈত ভাব।

বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ শ্রমের পার্থক্য ব্যবহার-মূল্য এবং মূল্যের বিরোধের মধ্যে প্রকাশ পায়। ব্যবহার-মূল্য হইল বিশেষ শ্রমের ফল, কিন্তু মূল্য হইল নির্ব্বিশেষ শ্রমের ফল।

ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ শ্রম রূপে শ্রমের এই বিভাগ কেবল **পণ্য উৎপাদনেই** বিদ্যমান থাকে। পণ্য-উৎপাদনের মৌলিক বিরোধ প্রকাশ পায় শ্রমের এই দ্বৈত প্রকৃতিতেই। পণ্য-উৎপাদনে সমাজের কোনো সভ্যের সমস্ত কাজ এক দিকে যেমন সমগ্র সামাজিক শ্রমের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, অন্যদিকে তেমনি ইহা বিভিন্ন পৃথক পৃথক শ্রমিকের বিশিষ্ট কাজ, ব্যক্তিগত শ্রমও বটে। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে নির্ব্বিশেষ ও বিশেষ শ্রমের বিরোধের উৎপত্তি হয় কেবল পণ্য-উৎপাদনের সঙ্গেই এবং যে-

মুহূর্তে পণ্য-উৎপাদনের বিলোপ ঘটে সেই মুহূর্তেই এই বিরোধও অদৃশ্য হয়।

"যে-ব্যক্তি নিজের প্রত্যক্ষ ব্যবহারের জন্য, নিজে ভোগ করিবার জন্য কোনো দ্রব্য উৎপাদন করে, সে সৃষ্টি করে **উৎপন্ন দ্রব্য, পণ্য** সে সৃষ্টি করে না। আত্মনির্ভর উৎপাদক হিসাবে সমাজের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু **পণ্য** উৎপাদন করিতে গেলে কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো **সামাজিক** অভাব পূরণ করে এমন দ্রব্য উৎপাদন করিলেই কেবল চলিবে না, পরন্তু তাহার শ্রম অবশ্যই সমাজ কর্তৃক ব্যয়িত মোট সমগ্র শ্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইবে, **সমাজের আভ্যন্তরীণ শ্রম-বিভাগের** প্রভাবাধীন হইবে। অপর শ্রম-বিভাগ ব্যতিরেকে ইহা কিছুই নয়, এবং নিজের পক্ষে ইহার প্রয়োজন তাহাদের **সমগ্রতা বিধানের** জন্য।" *

যে-আর্থিক ব্যবস্থা পণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে-ব্যবস্থায় প্রত্যেক স্বতন্ত্র শ্রমিকের কাজ বলিতে বুঝায় সমগ্র সামাজিক শ্রমের এক কণা মাত্র। প্রত্যেক তাঁতী, খনি-মজুর বা যন্ত্রবিদের কাজ হইয়া উঠে সামাজিক উৎপাদনের সাধারণ শৃঙ্খলের অংশ। প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন কাজ এই শৃঙ্খলের এক একটি বন্ধনী মাত্র। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার পণ্য উৎপাদনে প্রত্যেকটি কাজ **স্বতন্ত্র**ও বটে। প্রত্যেক উৎপাদক নিজের কাজে অপরাপর সহস্র উৎপাদকের সহিত সংযুক্ত, এই অর্থে প্রত্যেকের শ্রমই সামাজিক; কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের শ্রম নিখিল-সামাজিক আকারে সমন্বিত করা হয় নাই। পক্ষান্তরে প্রত্যেক শ্রমিকের শ্রমই স্বতন্ত্র, বিক্ষিপ্ত।

* মার্ক্স : 'মূল্য, দাম ও মুনাফা', পৃঃ ৪৩।

"পণ্যের উৎপাদন হইল সামাজিক সম্পর্কের এক ব্যবস্থা যাহাতে বিভিন্ন উৎপাদক উৎপাদন করে বিভিন্ন দ্রব্য (সামাজিক শ্রমবিভাগ), এবং যাহাতে এই সব উৎপন্ন দ্রব্যের পরস্পরের সমীকরণ সাধিত হয় বিনিময়ে।" *

স্বাধীন উৎপাদকের স্বতন্ত্র শ্রমের সামাজিক প্রকৃতির মধ্যে এই যে-বিরোধ আছে, পণ্য-উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উৎপত্তি ও পণ্য-উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অবসান ঘটে।

সাধারণ আর্থিক ব্যবস্থায় এই অসঙ্গতির অস্তিত্ব থাকে না। পৃথিবীর কোনো সুদূর নিভৃত কোণে এক স্বতন্ত্র কৃষিমূলক আর্থিক ব্যবস্থার কল্পনা করা যাক। এই আর্থিক ব্যবস্থা অবশিষ্ট পৃথিবী হইতে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন; প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীই উৎপাদিত হয় কৃষিক্ষেত্রে বা আবাদে। শ্রম এক্ষেত্রে গোটা সমাজের শ্রমের অংশ নয়; এই শ্রম স্পষ্টত পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির। সুতরাং যে-অসঙ্গতি পণ্য-উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য সে-অসঙ্গতির অস্তিত্ব এখানে নাই। কিন্তু যদি আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজের কথা ধরি তাহা হইলে দেখিব যে, পুঁজিবাদের তুলনায় সে-সমাজের বিভিন্ন সদস্যের শ্রমের পারস্পরিক নির্ভরতা আরও বেশী হয়; উপরন্তু এক্ষেত্রেও পণ্য উৎপাদনের অসঙ্গতির অস্তিত্ব নাই; প্রত্যেক শ্রমিকের শ্রম হইয়া উঠিয়াছে সামাজিক, সাধারণ শ্রমের এক সংগঠিত অংশ। প্রত্যেক শ্রমিকের শ্রমের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রকৃতিও অদৃশ্য হইয়াছে। সকলের শ্রমের ফল ব্যক্তিগত না হইয়া পরিণত হয় সারা সমাজের সম্পত্তিতে।

* লেনিন: 'মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্-মার্ক্স্বাদ,' "কার্ল মার্ক্স্", পৃঃ ১৬।

সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রম

পণ্য-উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণের দ্বারাই যদি তাহার (পণ্যের) মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে ইহা মনে হইতে পারে যে মানুষ অধিকতর অলস ও অধিকতর অনিপুণ হইলে তাহার পণ্যও হইবে অধিকতর মূল্যবান।

ধরা যাক যে দুজন মুচি পাশাপাশি কাজ করিতেছে। তাহাদের একজন খুবই চটপটে নিপুণ কর্ম্মী। দিনে সে এক জোড়া করিয়া জুতা তৈয়ার করে। অপর জন কিন্তু অলস, মাতাল। এক জোড়া জুতা তৈয়ার করিতে তাহার লাগে এক সপ্তাহ। ইহাতে কি বুঝায় যে, দ্বিতীয় মুচির জুতার দাম প্রথম মুচির জুতার দামের অপেক্ষা বেশী? নিশ্চয়ই নয়।

"পণ্যে পরিণত বা রূপায়িত **শ্রমের পরিমাণের** দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় বলিতে আমরা বুঝি এক নির্দ্দিষ্ট সমাজে, উৎপাদনের নির্দ্দিষ্ট সামাজিক সাধারণ (এভারেজ) অবস্থায়, শ্রমের সামাজিক গড়পড়তা তীব্রতা ও নৈপুণ্য প্রয়োগে উক্ত পণ্যের উৎপাদনে **আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ**। ইংলণ্ডে যখন যন্ত্রচালিত তাঁত হস্ত-চালিত তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতায় নামিল, তখন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূতাকে তুলা বা বস্ত্রে পরিণত করিতে প্রয়োজন হইত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রমের সময়ের কেবল অর্দ্ধেক। পূর্ব্বের দিনে নয় বা দশ ঘণ্টা কাজ করার পরিবর্ত্তে হস্তচালিত তাঁতের তাঁতীদিগকে বর্ত্তমানে কাজ করিতে হয় দিনে সতেরো বা আঠারো ঘণ্টা। তবুও তাহার বিশ ঘণ্টা শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য বর্ত্তমানে মাত্র দশ ঘণ্টার সামাজিক শ্রমের তুল্য, অথবা, একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূতাকে কাপড়ে পরিণত করিবার জন্য সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রমের দশ ঘণ্টার তুল্য।

কাজেই তাহার পূর্ব্বের দশ ঘণ্টায় উৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষা তাহার বিশ ঘণ্টায় উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অধিক নয়।" *

তাহা হইলে দেখা যায় যে পণ্যের মূল্য নির্ভর করে· প্রত্যেক পৃথক ক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদনে কত শ্রম ব্যয়িত হইয়াছে তাহার উপরে নয়, পরন্তু পণ্যের উৎপাদনে গড়পড়তা কত শ্রম আবশ্যক হয় তাহার উপর, অথবা যেমন বলা হয়, সামাজিক গড়পড়তা বা সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রমের উপর।

সহজ ও নিপুণ শ্রম

সহজ শ্রম এবং নিপুণ শ্রমের মধ্যেও পার্থক্য করা দরকার। একজন রাজমিস্ত্রি এবং একজন ঘড়ির কারিগরের কথাই ধরা যাক। রাজমিস্ত্রির শ্রমের একটি ঘণ্টা ঘড়ির কারিগরের একটি ঘণ্টার সমান হইতে পারে না। কেন? রাজমিস্ত্রির কাজ শিক্ষা করিতে শিক্ষানবিসিতে বেশী সময় ব্যয় করিতে হয় না। ইহা সহজ শ্রম এবং শিক্ষাও করা যায় অনায়াসে। অনায়াসেই একজন রাজমিস্ত্রি হইতে পারে (অথবা একজন সাধারণ শ্রমিক)। কিন্তু ঘড়ির কারিগরের (বা রাসায়নিকের) বিষয় স্বতন্ত্র। ঘড়ির কারিগর হইতে হইলে কাজ শিখিতেই হয় প্রায় তিন বৎসর। ভবিষ্যৎ ঘড়ির কারিগর যদি ঠিক করে যে সে কাজ শিখিতে বহু সময় ব্যয় করিবে, তবে এমন সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করে কেবলমাত্র পরে পুরস্কৃত হইবার আশাতেই। কিরূপে? ধরুন, একটা ঘড়ি তৈয়ার করিতে বিশ ঘণ্টা সে ব্যয় করে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বাজারে পায় সে তিরিশ ঘণ্টার সহজ বা অনিপুণ শ্রমের উৎপন্ন পণ্য। এইরূপ ক্ষেত্রে নিপুণ (বা যেমন সময়-সময় বলা হয়, জটিল) শ্রমের একটি ঘণ্টা কিন্তু বাজারে সহজ শ্রমের দেড়টি ঘণ্টার সমান।

* মার্ক্‌স্: 'মূল্য, দাম ও মুনাফা', পৃঃ ৪২।

সহজ শ্রমের একটি ঘণ্টা ও নিপুণ শ্রমের একটি ঘণ্টার মধ্যে বিনিময়ে কোনোরূপ পার্থক্য না করা হইলে কী হয়? এইরূপ অবস্থায় নিপুণ শ্রমের সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে। ঘড়ির কারিগর, রাসায়নিক এবং এইরূপ অপরাপর নিপুণ লোকের সংখ্যা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকিবে। ফলে বাজারে ঘড়ি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি কমিতেই থাকিবে এবং এই সব পণ্যের দামও বাড়িতে থাকিবে। তখন আবার ঘড়ির কারিগর শ্রমের একটি ঘণ্টা সহজ শ্রমের দেড়টি বা দুইটি ঘণ্টার সমান হইয়া উঠিবে। কারিগরী কাজ শিক্ষা করা আবার লাভজনক হইবে।

বাজার ও প্রতিযোগিতা

আমরা দেখিয়াছি যে পণ্যের উৎপাদনে ব্যয়িত সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রমের দ্বারা পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। ইহাতে কি বুঝা যায় যে পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থায় সকল সময়েই প্রত্যেক পণ্য পূর্ণ মূল্যে বিনিময় করা যাইতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। ইহার জন্য প্রত্যেক উৎপাদিত পণ্যের অবিলম্বে একজন করিয়া ক্রেতা পাওয়া আবশ্যক। সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে সর্ব্বদা সামঞ্জস্য থাকা দরকার। প্রকৃত পক্ষেই কি ইহা ঘটে?

পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থায় সমাজে এমন কোনো অবয়ব (organ) নাই যাহার মারফত প্রত্যেক উৎপাদক জানিতে পারে কোন পণ্য কী পরিমাণে উৎপাদন করা উচিত। যতদিন পর্য্যন্ত উৎপাদনের বৃহত্তর অংশ রাখা হয় প্রত্যক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এবং উদ্বৃত্তের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র দেওয়া হয় বাজারে, তত দিন বাজারের গুরুত্ব খুব বেশী নয়। কিন্তু পণ্য-উৎপাদনের বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বাজারও ক্রমশ অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে।

প্রত্যেক স্বতন্ত্র পণ্য-উৎপাদক নিজ নিজ ঝুঁকিতে কাজ করে। পণ্য উৎপাদিত হইয়া বাজারে পৌঁছিবার পরই কেবল সে বুঝিতে পারে তাহার পণ্যের কোনো চাহিদা আছে কি নাই।

পণ্যের দাম হইল মুদ্রায় ব্যক্ত পণ্যের মূল্য। কিন্তু দাম সর্ব্বদাই বাড়ে কমে বাজারের অবস্থা অনুযায়ী। বাজারে বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে পণ্যের দাম লইয়া শুরু হয় টানা হ্যাঁচড়া। এক দিকে বিক্রেতাদের মধ্যে এবং অন্য দিকে ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয় পণ্যের বিক্রয়-দর। সুতরাং পণ্যের দাম সর্ব্বদাই তাহার মূল্যের সমতুল্য হয় না। পণ্যের মূল্য হইতে তাহার দাম কোনো সময় বা হয় বেশী কোন সময় বা কম। পণ্যের মূল্য কিন্তু সব সময়েই কেন্দ্র বা অক্ষ রূপে থাকে আর তাহারই আশেপাশে দাম উঠা নামা করে।

চাহিদা অপেক্ষা কোনো পণ্য বেশী উৎপাদিত হইলে সরবরাহ চাহিদাকে ছাড়াইয়া যায়, ফলে পণ্যের দাম মূল্যের নিচে নামিয়া যায়। মূল্য অপেক্ষা দাম কম হওয়ার অর্থ হইল এই যে, উক্ত পণ্য উৎপাদন করিতে উৎপাদক যে-শ্রম ব্যয় করিয়াছে তাহার সবটুকুর পুরা প্রতিদান সে পায় না। সুতরাং বেশী চাহিদা আছে এমন অন্য কোনো পণ্য উৎপাদন করিলে সে অধিক লাভবান হইবে। কাজেই প্রথমোক্ত পণ্যটির উৎপাদন হ্রাস পাইবে। তখন কিন্তু চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ক পণ্যটির পক্ষে অনুকূল হইয়া উঠিবে এবং কিছুকাল পরে ইহার দাম মূল্যের সমান হইবে, এমন কি, মূল্যের উপরেও হয় তো উঠিতে পারে।

কেবল এই ভাবেই অনবরত হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্য দিয়াই মূল্যের বিধি কার্য্যকরী হয়। সরবরাহ ঠিক চাহিদার সমান হইলেই কেবল পণ্য স্বীয় মূল্যে বিক্রীত হয়। এই ব্যাপার কিন্তু খুব কমই ঘটে।

"মূল্যের তত্ত্ব (থিওরি) ধরিয়া লয় এবং ধরিয়া লইবেই যে সরবরাহ ও চাহিদা সমান, কিন্তু মূল্যের তত্ত্বে একথা কখন বলা হয় না

যে এইরূপ সমতা সর্ব্বদাই দেখা যায় বা পুঁজিবাদী সমাজে দেখা যাইতে পারে।" *

মূল্যবিধি **বাজারের অন্ধ শক্তি রূপে** দেখা দেয়। প্রত্যেক স্বতন্ত্র উৎপাদককেই এই অন্ধ শক্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। মার্ক্সের উপমা অনুযায়ী বলা যাইতে পারে যে, এই শক্তির ক্রিয়া গৃহপতনের ন্যায় অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান বাজার তাহার নিকট কি চাহিবে সেকথা বিভিন্ন উৎপাদক কখনই পূর্ব্বাহ্ণে জানিতে পারে না। মূল্যবিধি বিভিন্ন উৎপাদকের অজ্ঞাতসারে কাজ করে। আমরা দেখিয়াছি যে পণ্য-উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ সমগ্র সমাজের জন্য কোনোরূপ শৃঙ্খলা, কোনো সচেতন পরিকল্পনার অভাব। যে-সমাজে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে সে-সমাজে মূল্যবিধি কাজ করে এক নৈর্ব্যক্তিক অচেতন শক্তি রূপে।

পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে পণ্য-উৎপাদনের উন্নত রূপ এক মুহূর্ত্তেই ঘটে নাই, পক্ষান্তরে পূর্ব্বতন স্বাভাবিক আর্থিক ব্যবস্থাকে বিনিময় ধীরে ধীরে দুর্ব্বল করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। স্বাভাবিক আর্থিক ব্যবস্থা হইতে পণ্যগত আর্থিক ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতে বহু শতাব্দী লাগিয়াছে।

বিনিময়ের বিকাশ ও মূল্যের রূপ

উন্নত পণ্যগত আর্থিক ব্যবস্থায় একটি পণ্য সরাসরি অপর একটি পণ্যের সহিত বিনিময় হয় না। পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়, পণ্য মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়। পণ্যের মূল্য যে-রূপে ব্যক্ত হয় তাহাই হইল মুদ্রা। পণ্য-উৎপাদন ও বিনিময়-বিকাশের প্রাথমিক স্তরে মূল্যের রূপ ছিল অপেক্ষাকৃত

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, "বাজার-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধসমূহ", পৃঃ ৪০৭, রুশ সংস্করণ।

অনুন্নত; মূল্যের মুদ্রা-রূপ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মূল্যের সেই অনুন্নত রূপের সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

যখন উৎপাদনের মূলত স্বাভাবিক প্রকৃতি থাকে এবং যখন বিনিময় সঙ্ঘটিত হয় দৈবাৎ, তখন আমরা দেখিতে পাই মূল্যের মৌলিক, একক বা আকস্মিক রূপ। একটি পণ্য অন্য একটির সহিত বিনিময় হয়; যেমন, একটি জন্তুর চামড়া দুইটি বর্শার সহিত বিনিময় হয়। উত্তর কালে বিনিময় ও পণ্য-উৎপাদনের চরম বিকাশ ও বিস্তারের সময়ে যে-সব বিশিষ্ট লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে সেগুলিও মূল্যের নিতান্ত অনুন্নত এই রূপের মধ্যেই ভ্রূণাকারে নিহিত থাকে।

উল্লিখিত উদাহরণে, মূল্যের সহজ রূপ চামড়ার মূল্যের অভিব্যক্তি হিসাবে কাজ করে, দুইটি বর্শার আকারে ইহা প্রকাশ পায়। দেখা গেল যে চামড়ার মল্য সরাসরি প্রকাশ পাইল না, পরন্তু প্রকাশ পাইল দুইটি বর্শার মূল্যের সহিত তুলনামূলক ভাবে, আপেক্ষিক ভাবে। এইক্ষেত্রে দুইটি বর্শা একটি চামড়ার সমতুল্য রূপে কাজ করে। দুইটি বর্শার ব্যবহার-মূল্যের দ্বারা চামড়াটির মূল্য ব্যক্ত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যায় যে একটি পণ্যের (দুইটি বর্শার) ব্যবহার-মূল্য অপর একটি পণ্যের (চামড়ার) মূল্যের অভিব্যক্তি রূপে কাজ করে। পূর্ব্বের ন্যায়ই মূল্য ও ব্যবহার-মূল্য বিভক্ত, ব্যবহার-মূল্য হইতে মূল্য বিচ্ছিন্ন। এই ক্ষেত্রে চামড়াকে দেখা যায় কেবলমাত্র মূল্য হিসাবে, এবং বর্শা দুইটির দেখা পাওয়া যায় কেবল মাত্র ব্যবহার-মূল্য হিসাবে। বলিতে গেলে, চামড়ার মূল্যকে তাহার ব্যবহার-মূল্য হইতে পৃথক করা হইয়াছে এবং ইহা অপর একটি পণ্যের সহিত সমীকৃত হইয়াছে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে পণ্যের মূল্য কেবল সেই পণ্যের হিসাবে ব্যক্ত করা যায় না, এই মূল্য ব্যক্ত করিতে

হইলে অন্য একটি পণ্যের শারীরিক আকার—একটি তুল্যমূল্য (ইকুইভেলেণ্ট)—থাকা দরকার।

এমন কি, মূল্যের সহজ রূপে পণ্য-তুল্যমূল্যের (কমোডিটি ইকুইভেলেণ্ট) বিশেষ লক্ষণ হইল এই যে এই পণ্যের ব্যবহার-মূল্য ইহার বিপরীতের অর্থাৎ মূল্যের অভিব্যক্তি হিসাবে কাজ করে।

"পণ্যের দেহ, যাহা তুল্যমূল্য হিসাবে কাজ করে, নির্বিশেষে মনুষ্য-শ্রমের বাস্তব পরিণতি হিসাবে প্রকাশ পায়, এবং একই সময়ে ইহা কোনো বিশেষ ভাবে ব্যবহারোপযোগী বিশেষ শ্রমের ফল।" *

সুতরাং বিশেষ শ্রম এই ক্ষেত্রে নির্বিশেষ শ্রমের অভিব্যক্তি হিসাবে, ব্যক্তিগত শ্রম সামাজিক শ্রমের অভিব্যক্তি হিসাবে কাজ করে।

যতদিন পর্য্যন্ত বিনিময় সম্পূর্ণ একক ও আকস্মিক প্রকৃতির থাকে কেবল ততদিনই মূল্যের সহজ রূপের অস্তিত্ব। যে-মুহূর্ত্তে বিনিময় কিয়ৎ পরিমাণে আরও বিস্তৃত ভাবে বিকাশ লাভ করে, তৎক্ষণাৎ মূল্যের এই রূপ **মূল্যের সমগ্র বা বিস্তৃত রূপে** পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাতে কেবল দুইটি পণ্য নহে, পরন্তু ব্যাপক পণ্যরাজি পরস্পরে সমীকৃত হয়। এই অবস্থায় প্রত্যেক পণ্য কেবল অপর একটি পণ্যের সহিত বিনিময় না হইয়া পণ্যরাজির সহিত বিনিময় হয়। যেমন, চামড়াখানি যে কেবলমাত্র দুইটি বর্শার সহিত বিনিময় হইতে পারে তাহা নয়, পরন্তু একজোড়া জুতা, একখানি বৈঠা, একখানি কাপড় অথবা এক বস্তা শস্যের সহিতও বিনিময় হইতে পারে: সুতরাং মূল্যের সমগ্র বা বিস্তৃত রূপ দেখা দেয় নিম্নলিখিত ভাবে:

* মার্ক্‌স্: 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭।

১খানি চামড়া =		২ টি বর্শা
		১ জোড়া জুতা
		১ খানি বৈঠা
		১ খানি কাপড়
		১ বস্তা শস্য, ইত্যাদি

শ্রমজাত কোনো দ্রব্য (যেমন, গবাদি পশু) যখন অন্যান্য বহু পণ্যের সহিত বিনিময় হয় এবং সেই বিনিময় যদি ব্যতিক্রম না হইয়া সাধারণ চলতি নিয়মই হয়, তাহা হইলে এবং তখনই আমরা মূল্যের এই রূপটি দেখিতে পাই।

মূল্যের বিস্তৃত রূপ মূল্যের রূপের ক্রমবিকাশের এক অগ্রসর অবস্থা। একটি পণ্যের মূল্য ব্যক্ত হয় বিভিন্ন মালিকের বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে। মূল্য ও ব্যবহার-মূল্যের স্বাতন্ত্র্য এক্ষেত্রে আরও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। চামড়ার মূল্য এখানে অন্যান্য পণ্যরাজির সাধারণ গুণ হিসাবে চামড়ার ব্যবহার-মূল্যের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়।

যাহা হোক, বিনিময়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বাড়িতে থাকে, মূল্যের বিস্তৃত রূপও তাহা পূরণ করিতে পারে না।

বিনিময়ের ক্রমোন্নতি বিনিময়ের এই ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিকে আরও সুস্পষ্ট করিয়া তোলে। সাধারণ রূপ বলিয়া কথিত মূল্যের পরবর্ত্তী অধিকতর বিকশিত রূপের দ্বারা এই ত্রুটি দূর হয়। মূল্যের সাধারণ রূপ স্বভাবতই সমগ্র বা বিস্তৃত রূপ হইতে উৎপত্তি লাভ করে। মূল্যের বিস্তৃত রূপে একটি পণ্য অনবরত বিনিময় হয়; সুতরাং ইহার মূল্য অন্যান্য পণ্যরাজির মধ্যে ব্যক্ত হয়। ধরা যাক যে এই পণ্যটি হইল গবাদি পশু। ধরা যাক যে একটি বলদ বিনিময় হয় একখানি নৌকার সহিত, তিন জোড়া জুতার সহিত,

তিন বস্তা শস্যের সহিত, বিশটি বাণের সহিত, ইত্যাদি। বিনিময়-সম্পর্কের এই ধারা কেবল আমাদিগকে উল্টাইয়া দিতে হইবে এবং তাহা হইলেই আমরা পাইব মূল্যের সাধারণ বা সার্ব্বজনীন তুল্যমূল্য রূপ, যথা :

১ খানি নৌকা ৩ জোড়া জুতা ৩ বস্তা শস্য ২০ টি বাণ, ইত্যাদি	= ১টি বলদ

মূল্যের সার্ব্বজনীন তুল্যমূল্য রূপে সমুদয় পণ্যের মূল্য অভিব্যক্ত হয় একই পণ্যের মধ্যে। যে-পণ্য অপরাপর পণ্যের মূল্য প্রকাশ করে তাহাই **সার্ব্বজনীন তুল্যমূল্য** রূপে কাজ করে। অন্য যে-কোনো পণ্যের সহিত বিনিময়ে এই পণ্যটি অবিলম্বে গৃহীত হয়। মূল্যের সমগ্র বা বিস্তৃত রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসুবিধা দূর হয় এমনই করিয়াই। এই ক্ষেত্রে ব্যবহার-মূল্য ও মূল্যের বিচ্ছেদ আরও বিস্তীর্ণ হইয়া উঠে। একটি মাত্র পণ্যের সাহায্যেই সমুদয় পণ্যের মূল্য ব্যক্ত হয়। অপরাপর সমুদয় পণ্যের মূল্য প্রকাশ করাই একটি পণ্যের কাজ হইয়া দাঁড়ায়। সমগ্র পণ্যজগত দুইটি বিরোধী মণ্ডলীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে : সার্ব্বজনীন তুল্যমূল্য নিজেই একটি মণ্ডলী গড়িয়া তোলে, অপর মণ্ডলীতে থাকে অন্যান্য সকল পণ্য।

সার্ব্বজনীন রূপের সহিত **মূল্যের মুদ্রা-রূপের** গরমিল নেহাত সামান্যই। যখন মূল্যবান ধাতু—স্বর্ণ এবং রৌপ্য—সার্ব্বজনীন তুল্য-মূল্য হিসাবে সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই আমরা দেখি মূল্যের সার্ব্বজনীন রূপ হইতে মুদ্রা-রূপে পরিবর্ত্তন। মুদ্রা-রূপে বিশেষ সামাজিক

কর্ত্তব্য অর্থাৎ সমুদয় পণ্যের মূল্যের অভিব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পণ্যের মধ্যে রূপায়িত হইয়া উঠে। এই পণ্য, স্বর্ণ বা রৌপ্য, পণ্যজগতে সর্ব্বপ্রধান। মুদ্রায় পরিণত হইবার পূর্ব্বে স্বর্ণকে সর্ব্বপ্রথম পণ্য হইতেই হইবে। কিন্তু মুদ্রায় পরিণত হইয়া মুদ্রা হিসাবে ইহার ভূমিকা সম্পর্কে স্বর্ণ কতিপয় নূতন গুণরাশি অর্জ্জন করে।

মানুষে-মানুষে এক বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক আছে, এই সম্পর্কই হইল মূল্য; বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে সম্পর্ক হিসাবে ইহা প্রকাশ পায়। পণ্যের মূল্য স্বীয় আখ্যায় ব্যক্ত করা যায় না। অন্য একটি পণ্যের সাহায্যেই কেবল ইহাকে ব্যক্ত করা যায়। একটি পণ্যের সহিত অপর একটির বিনিময়-সম্পর্ক বা **ইহার বিনিময়-মূল্য** ইহার মূল্যের অভিব্যক্তি হিসাবে কাজ করে। সহজ রূপ হইতে মুদ্রা-রূপ পর্য্যন্ত মূল্যের রূপের বিকাশ আমরা দেখিয়াছি। পণ্যের অন্তর্নিহিত বিরোধের বিকাশের সহিত মূল্য-রূপের বিকাশ সংযুক্ত। বিনিময়ের বিকাশের এবং সংশ্লিষ্ট মূল্য-রূপের ধারায় ব্যবহার-মূল্য ও মূল্যের বিরোধ ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। এই বিরোধ পরিপূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয় মুদ্রায়। মুদ্রা মূল্যের অভিব্যক্তির একমাত্র এবং সার্ব্বজনীন উপায়ে পরিণত হয়। অপরাপর পণ্য ব্যবহার-মূল্য হিসাবে মুদ্রার ভারসাম্য রক্ষা করে।

পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রমিকের নিকটই ইহা প্রত্যক্ষ যে সে হইল এক সঙ্ঘবদ্ধ সমাজের অংশ। সমাজতন্ত্রে মানুষের মধ্যকার উৎপাদন-সম্পর্ক স্পষ্ট ও সহজ-বোধ্য হয়। প্রত্যেক স্বতন্ত্র শ্রমিক ও প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য শ্রমিক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ হইয়া উঠে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ।

পণ্যরতি
(fetishism)

যে-সমাজে পণ্য-উৎপাদন বিদ্যমান সেখানে এইরূপ হয় না। পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে উৎপাদন-সম্পর্ক দ্রব্যের মধ্যে সম্পর্ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যখন একজন মুচি নিজের তৈরী এক জোড়া জুতা বিক্রয় করিয়া পাওয়া মুদ্রার দ্বারা নিজের ও তাহার পরিবারের জন্য রুটিওয়ালার নিকট হইতে রুটি ক্রয় করে, আমরা তখন এক নির্দ্দিষ্ট উৎপাদন-সম্পর্ক, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে উৎপাদনগত এক নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক পাই। রুটিওয়ালার রুটি মুচির প্রয়োজন পূরণ করে এবং মুচির প্রস্তুত জুতাও খুব সম্ভবত রুটিওয়ালার হাতেই যাইবে। সুতরাং ব্যাপারটি দাঁড়াইল এই যে মুচির প্রয়োজন পূরণ করিতে দরকার হয় রুটিওয়ালার কাজ, আবার রুটিওয়ালার দরকার মিটাইতে প্রয়োজন হয় মুচির কাজ। অতএব মুচি এবং রুটিওয়ালার মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক, উৎপাদনগত এক নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই সম্পর্ক কিরূপে প্রকাশ পায়? কিসে ইহা ব্যক্ত হয়? ইতিপূর্ব্বে তাহা দেখা গিয়াছে। বিনিময়-প্রক্রিয়ায় ইহা আত্মপ্রকাশ করে। পণ্য হইতেছে এমন একটি বস্তু যাহা এক উৎপাদকের হাত হইতে অপরের হাতে যায়। রুটিওয়ালার হাত হইতে রুটি যায় মুচির হাতে, মুচির হাত হইতে জুতা যায় বণিকের হাতে, আবার বণিকের হাত হইতে যায় সেই রুটিওয়ালার হাতে। পণ্য কিন্তু শুধু শুধু হাত বদলায় না। সকলেই জানে যে মুচি নিজের তৈরী জুতার পরিবর্ত্তে উপযুক্ত পরিমাণ মুদ্রা অর্থাৎ তাহার দাম পাওয়ার পরেই কেবল সে-জুতা হাত ছাড়া করে। রুটিওয়ালার সম্পর্কেও ব্যাপার ঠিক একই রকম। এইরূপে, পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে উৎপাদন-সম্পর্ক দ্রব্যের অর্থাৎ পণ্যের সঞ্চালন রূপে প্রকাশ পায়।

যাহারা পণ্য উৎপাদন করে তাহাদের মধ্যকার সম্পর্কই হইল মূল্য।

কিন্তু এই সম্পর্ক আত্মপ্রকাশ করে দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের, পণ্যের সহিত পণ্যের সম্পর্ক রূপে। এই উৎপাদন-সম্পর্ক দ্রব্যের সঞ্চালনের আড়ালে লুক্কায়িত থাকে, এক বাস্তব আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকে। রং বা ওজনের মত মূল্যও পণ্যের স্বাভাবিক গুণ বলিয়া মনে হয়; যেমন বলা হয় যে, এই রুটিখানির ওজন এক পোয়া আর দাম হইল তাহার দশ পয়সা। পণ্য একটি জটিল বস্তু হইয়া পড়ে। উৎপাদনকারীর ভাগ্য তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের ভাগ্যের সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত। জুতা বিক্রয় করিতে না পারিলে মুচির রুটি মিলে না। জুতার দাম কমিলে রুটিও সে সেই পরিমাণে কম কিনিতে পারে। মুচি কেন জুতা বিক্রয় করিতে পারে না, অথবা কেনই বা জুতার দাম হিসাবে সে পূর্ব্বের অপেক্ষা কম পায়? অর্থনৈতিক জীবনে, পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের উৎপাদন-সম্পর্কে যে-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার মধ্যেই ইহার কারণ বর্ত্তমান;—যেমন সঙ্কট দেখা দিয়াছে, অথবা মজুরী হ্রাসের দরুন শ্রমিকরা পূর্ব্বাপেক্ষা কম জুতা কিনিতেছে। প্রকৃত কারণ কিন্তু মুচির কাছে বহু দিন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে এবং যখন সে জানিতে পারিবে তখনও সাধারণত বিকৃত রূপেই জানিবে; কারণ, উৎপাদনশীল জগতের অবশিষ্টাংশের সহিত মুচির যে-সম্পর্ক তাহা কেন্দ্রীভূত হয় তাহার পণ্য জুতার মধ্যে, বাজারে এই পণ্যের যে-মূল্য পায় তাহার মধ্যে।

পণ্য-উৎপাদনের আওতায় মানুষে-মানুষে উৎপাদনগত সম্পর্ক দ্রব্যে দ্রব্যে, পণ্যে পণ্যে সম্পর্কের রূপ পরিগ্রহ করে এবং ফলে পণ্য বিশিষ্ট সামাজিক গুণ অর্জ্জন করে; ইহাকে আমরা বলি পণ্যরতি বা পণ্যাসক্তি (কোনো বস্তুর মধ্যে স্বভাবাতীত কল্পিত গুণ আরোপ করিয়া সেই বস্তুর উপাসনাকে বলে বস্তুরতি)। পুঁজিবাদের আওতায় সমাজে মানুষে-মানুষে সমস্ত উৎপাদন-সম্পর্ক দ্রব্যের আবরণে প্রচ্ছন্ন। পুঁজিতন্ত্রে মানুষে

মানুষে সমস্ত উৎপাদন-সম্পর্ক দেখা দেয় দ্রব্যে-দ্রব্যে সম্পর্কের রূপে, দ্রব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পর্কের রূপে। ইহা পুঁজিবাদী সম্পর্কের প্রকৃত তাৎপর্য্যকে গোপন করিয়া রাখে, তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, তাহার সত্যকারের প্রকৃতিকে লুক্কায়িত করিয়া তাহাকে দেয় এক মায়াময় রূপ। এই জন্যই যে-পণ্যাসক্তি পুঁজিবাদের অধীনে সকল সম্পর্ক সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহার রহস্য উন্মুক্ত করা, উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

পণ্যাসক্তির (বা পণ্যরতির) ধাঁধাঁর সমাধান করেন সর্ব্বপ্রথম মার্ক্স্। মার্ক্সের সময় পর্য্যন্ত যেখানে শুধু মাত্র দেখা যাইত দ্রব্যের রহস্যজনক গুণসমূহ সেখানে মানুষে-মানুষে সামাজিক সম্পর্কের প্রথম আবিষ্কার করেন তিনিই (মার্ক্স্)। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে মূল্য হইল পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থায় মানুষে-মানুষে সামাজিক সম্পর্ক।

"অর্থনীতির সূচনা হয় **পণ্য** লইয়া ; ব্যক্তির দ্বারাই হোক বা আদিম সম্প্রদায়ের দ্বারাই হোক, উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় আরম্ভ হওয়ার সময় হইতে অর্থনীতি শুরু হয়। বিনিময়ে যে উৎপন্ন দ্রব্য হাজির হয় তাহা হইল পণ্য। কিন্তু ইহার পণ্য হইবার একমাত্র কারণ এই যে, দুই ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সম্পর্ক রহিয়াছে সেই সম্পর্ক ঐ **জিনিসের** (উৎপন্ন দ্রব্য) সহিত জড়িত আছে ; এই সম্পর্ক হইতেছে উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক, এই দুইজন এখন আর একই ব্যক্তি নহে। এখানে আমরা এক অভিনব ব্যাপার লক্ষ্য করি। অর্থনীতি দ্রব্য লইয়া আলোচনা করে না, বরং আলোচনা করে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, সর্ব্বশেষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্পর্ক লইয়া ; কিন্তু এই সম্পর্ক সর্ব্বদাই **দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত** এবং **দ্রব্য রূপে দেখা দেয়**—এই অভিনব

ব্যাপার অর্থনীতির সর্ব্বক্ষেত্র ব্যাপিয়া আছে এবং বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিদদের মনে নিদারুণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের মনে এই আন্তঃসম্পর্কের চেতনা দেখা দিলেও সমগ্র অর্থনীতির পক্ষে ইহার প্রযুক্ততা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন মার্ক্স্, এবং ইহার ফলে কঠিনতম প্রশ্নগুলিও তিনি এত সহজ ও সুবোধ্য করিয়া দিয়াছেন যে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা পর্য্যন্ত এখন তাহা বুঝিতে সক্ষম।" *

বর্ত্তমান কালে এক পণ্যের সহিত অপরের প্রত্যক্ষ বিনিময় কদাচিৎ ঘটে। উৎপাদক সাধারণত তাহার উৎপন্ন পণ্য মুদ্রার বিনিময়ে **বিক্রয়** করে এবং প্রাপ্ত মুদ্রার বিনিময়ে তাহার প্রয়োজনীয় পণ্য **ক্রয়** করে। এ অবস্থায় পণ্যের বিনিময়ের কথা আমরা বলি কেন? প্রকৃত ঘটনা হইল

পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থায় মুদ্রার ভূমিকা

এই যে এক্ষেত্রে পণ্য-বিনিময়ের ব্যাপারেও মুদ্রা বস্তুত মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করে। পুঁজিপতি তাহার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তাহার বদলে পায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা। কিন্তু কেবল মাত্র মুদ্রা হিসাবেই মুদ্রার উপর তাহার কোনো আকর্ষণ নাই। মুদ্রা তাহার দরকার কাঁচা মাল ও যন্ত্রপাতি খরিদ করিবার জন্য, মজুর ভাড়া করিবার জন্য, উৎপাদন বাড়াইবার জন্য।

মুদ্রার মধ্যস্থতায় পণ্য-বিনিময় কিন্তু প্রত্যক্ষ পণ্য-বিনিময় হইতে মূলত স্বতন্ত্র। মুদ্রার প্রবর্ত্তনের ফলে পণ্যের অন্তর্নিহিত বিরোধ আরও বৃদ্ধি পায় ও বিকাশ লাভ করে।

* এঙ্গেল্স্ : "লুড্ভিগ্ ফয়েরবাক্," পৃঃ ৯৯-১০০, 'মার্ক্স্‌বাদী-লেনিনবাদী গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড।

সম্মতি বা চুক্তির ফলে মুদ্রার প্রচলন ঘটে নাই। ইহার প্রবর্ত্তন হইয়াছে স্বতস্ফূর্ত্ত ভাবে। বিচ্ছিন্ন প্রত্যেকটি উৎপাদকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বতোমুখী সামাজিক সম্পর্ক পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থায় কার্য্যকরী হইতে পারে কেবল মাত্র মুদ্রার সহায়তায়।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ শ্রমের বিরোধ প্রকাশ পায় পণ্যের ব্যবহার-মূল্য ও মূল্যের বিরোধ রূপে। মুদ্রার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিরোধ আরও বৃদ্ধি পায়। পণ্য ও মুদ্রার দ্বৈত প্রকৃতি অর্জ্জন করে পণ্য। মুদ্রার সহায়তায় বিনিময় সংঘটিত হইলে পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের মালিক পায় মুদ্রা। পণ্যের মূল্য এই মুদ্রারই অঙ্গীভূত হয়।

পণ্যের মূল্য এখন ব্যক্ত হয় তাহার দামে অর্থাৎ মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে। পণ্য উৎপন্ন হওয়াই সব নয়—সে-পণ্যকে মুদ্রার সহিত বিনিময় করিতে হইবে। তাহাকে বিক্রয় করিয়া দাম আদায় করিতে হইবে। পণ্য বিক্রয় করা না গেলে তাহার অর্থ হইবে এই যে, উৎপাদক বৃথাই শ্রম করিয়াছে।

মুদ্রা হইল সার্ব্বজনীন পণ্য, সার্ব্বজনীন তুল্যমূল্য। মুদ্রা হইল মূল্যের মূর্ত্ত রূপ, নির্ব্বিশেষ শ্রমের রূপায়ন। ব্যক্তিগত শ্রমের উৎপাদন হইতে পণ্যকে সামাজিক শ্রমের উৎপাদনে পরিবর্ত্তিত করিয়া বাজার পণ্যের উপর স্বীয় সামাজিক স্বীকৃতির যে-নিদর্শন অঙ্কিত করিয়া দেয়, মুদ্রা হইতেছে তাহারই পঞ্জা।

কিন্তু ইহাতে এই আশঙ্কা রহিয়া গিয়াছে যে কোনো-না-কোনো উৎপাদকের উৎপন্ন দ্রব্য মুদ্রায় রূপান্তরিত নাও হইতে পারে। যদি পণ্য-উৎপাদকের পক্ষে স্বীয় পণ্য মুদ্রায় রূপান্তরিত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তবে তাহার অর্থ দাঁড়াইবে এই যে তাহার নিজের ব্যক্তিগত শ্রম

সামাজিক শ্রমের অংশে পরিণত হইল না। ইহার অর্থ—উৎপাদনে বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকার দরুন যে-পণ্য বিক্রয় করা যাইবে না তাহারই উৎপাদনে সে অনর্থক অপচয় করিয়াছে নিজের শ্রম, কাঁচা-মাল এবং হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি; ইহা স্পষ্ট যে পণ্যরতি আরও নিদারুণ প্রত্যক্ষ হইয়াছে মুদ্রায়। পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনে সমুদয় উৎপাদন-সম্পর্কই গিল্টি বা রূপালী রং করা। মুদ্রায় আরোপ করা হয় অলৌকিক শক্তি। সামাজিক বিকাশের ফল হইয়া মুদ্রা এই সমাজেই অর্জ্জন করে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ও শক্তি।

> "বিনিময়-বিকাশের এবং পণ্য-উৎপাদনের শ্রেষ্ঠতম ফল রূপে মুদ্রা ব্যক্তিগত শ্রমের সামাজিক প্রকৃতি এবং বাজার যে বিভিন্ন উৎপাদককে একত্রিত করিয়াছে তাহাদের সামাজিক বন্ধনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, লুকাইয়া রাখে।" *

ক্ষুদ্রাকার পণ্য-উৎপাদন হইতে পুঁজিতন্ত্রে বিবর্ত্তনে মুদ্রা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যে-সব মোড়লেরা ছলে বলে সম্পদ অর্জ্জন করিয়া ধনী হইয়াছে তাহারা মুদ্রার আকারে সম্পদ সঞ্চয় করে। পুঁজির প্রথম উৎপত্তি মুদ্রা রূপে।

মুদ্রার কাজ

পণ্যের উপর ভিত্তি করিয়া যে আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত সে-ব্যবস্থায় মুদ্রার কার্য্য বহুবিধ। প্রত্যেকটি পণ্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় হয়। মুদ্রার এই পরিমাণকে বলা হয় **পণ্যের দাম**। অতএব, মুদ্রার অঙ্কে ব্যক্ত মূল্যই হইতেছে দাম। পণ্যের মূল্যের পরিমাপ করা হয় মুদ্রার দ্বারা।

মুদ্রায় পণ্য-মূল্যের পরিমাপ করা পণ্যের বিনিময়ের, ক্রয় বা বিক্রয়ের

* লেনিন: 'মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্-মার্ক্সবাদ', "কার্ল মার্ক্স্", পৃঃ ১৭।

মূল কথা (Premise)। একটি পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করার পূর্ব্বে তাহার দাম জানা আবশ্যক। এইরূপে মুদ্রা **মূল্য-মাপের** ভূমিকা গ্রহণ করে।

পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় ইহার উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম-সময়ের দ্বারা। তবুও কিন্তু সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রম-সময়ের দ্বারা মূল্য ব্যক্ত করা যায় না। যেমন, জুতা খরিদ বা বিক্রয় করার সময় বলা হয় না যে জুতায় খরচ পড়িয়াছে বিশটি শ্রমঘণ্টা, পরন্তু বলা হয় খরচ পড়িয়াছে, ধরা যাক তিরিশ টাকা। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে কোনো এক পণ্যের মূল্য অপর একটি পণ্যের মারফতেই কেবল ব্যক্ত করা যায়। জুতার উৎপাদনে যে-সময় ব্যয় হয় তাহা সত্যই হিসাবে ধরা হইবে কি না একথা পূর্ব্বে জানা যায় না। বাজারে জুতার প্রাচুর্য্য হইলে জুতা কিন্তু তিরিশ টাকায় বিক্রয় না হইয়া হয়তো বিক্রয় হইবে মাত্র পনেরো টাকায়। ইহার অর্থ হইবে এই যে, জুতার উৎপাদনে যে বিশ ঘণ্টা শ্রম ব্যয় হইয়াছে তাহার বিনিময় হইবে মাত্র দশ ঘণ্টা শ্রমের এক উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত। পণ্যের দাম তাহার মূল্যের আশেপাশে অনবরত উঠা-নামা করে। পণ্যের খরচ প্রথমে মূল্যের উপরে এবং পরে নিচে থাকে, অথবা বিপরীতও ঘটে—পণ্যের দামের উঠানামা এই ঘটনাতেই আত্মপ্রকাশ করে।

মূল্য-মাপ হইতে হইলে মুদ্রাকে হইতে হইবে পণ্য এবং তাহার থাকিবে মূল্য। যেমন ওজনহীন জিনিসের সাহায্যে কেহই কোনো কিছুর ওজন পরিমাপ করিতে পারে না। কিন্তু মূল্য পরিমাপ করিবার সময় মুদ্রাকে কি হাজির থাকিতেই হইবে? নিশ্চয়ই নয়। আমাদের ট্যাকে কানা কড়ি না থাকিলেও প্রভূত পরিমাণ

পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ আমরা করিতে পারি। মূল্য-মাপ হিসাবে মুদ্রা তাহার কাজ সম্পন্ন করে তত্ত্বগত ভাবে, **কাল্পনিক** বা **আদর্শ** মুদ্রা রূপে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে এই কাজে মুদ্রার পরিমাণের কোনো হাতই নাই।

মুদ্রার দাম নির্দ্ধারিত হইবার পরে পণ্যের চরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়। পণ্যকে বিক্রয় করিতে হইবে অর্থাৎ মুদ্রার জন্য বিনিময় করিতে হইবে। মুদ্রার সহায়তায় যে-দ্রব্যবিনিময় হয় তাহাকে বলে পণ্যপ্রবাহ (বা পণ্যসঞ্চালন)। ইহা সুস্পষ্ট যে খোদ মুদ্রা-প্রবাহের সহিত পণ্য-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযুক্ত। পণ্য যখন বিক্রেতার হাত হইতে ক্রেতার হাতে যায়, তখন মুদ্রা কিন্তু যায় ক্রেতার হাত হইতে বিক্রেতার হাতে। এক্ষেত্রে মুদ্রা কাজ করে প্রবাহের (বা সঞ্চালনের) উপায় বা পণ্য-আবর্ত্তনের উপায় রূপে।

সঞ্চালনের উপায় হিসাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে মুদ্রাকে প্রকৃতই সশরীরে হাজির থাকিতে হয়। এক্ষেত্রে মুদ্রা কাল্পনিক মুদ্রা হিসাবে দেখা না দিয়া দেখা দেয় প্রকৃত (রিয়াল) মুদ্রা রূপে। প্রত্যেকেই জানে যে 'কাল্পনিক মুদ্রার' সাহায্যে এক টিপ নস্যও খরিদ করা যায় না। কোটি কোটি টাকা কল্পনা করা যায়, কিন্তু কল্পনায় সেই কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে কিছুই কিনিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে, প্রত্যেক প্রকৃত টাকার দ্বারা তুল্য পরিমাণ মূল্যের পণ্য ক্রয় করা যায়।

একটি প্রধান বিষয়ে সঞ্চালনের উপায়ের প্রয়োজনীয় গুণসমূহ মূল্য-মাপের উপযোগী গুণসমূহ হইতে ভিন্ন। সঞ্চালনের উপায় হইতে হইলে মুদ্রার নিজস্ব মূল্য যে থাকিতেই হইবে এমন নয়। খুব সম্ভব মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্যের জন্য পণ্য-বিক্রেতা বিনিময়ে মুদ্রা

গ্রহণ করে না, পরন্তু গ্রহণ করে ইহার বিনিময়ে অন্য পণ্য পাইবার জন্য—অন্য পণ্য ক্রয় করিবার জন্য। বিনিময়ের উপায় রূপে কাজ করিবার সময় মুদ্রা কোনো ব্যক্তি বিশেষের পকেটে পড়িয়া না থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলিতে থাকে পণ্যের গতিবিধির বিপরীত মুখে। ফলে মুদ্রার ভূমিকা এক্ষেত্রে হইয়া দাঁড়ায় ক্ষণস্থায়ী। ঠিক এই কারণেই পূর্ণমূল্যযুক্ত মুদ্রার (স্বর্ণের) স্থানে ইহার প্রতিভূ অথবা ইহার প্রতীক কাজ করিতে পারে। স্বর্ণের এই প্রকার প্রতিভূ হইল ব্যাঙ্কনোট, কাগজী মুদ্রা, পূর্ণমূল্যবিহীন রৌপ্য বা তাম্র মুদ্রা প্রভৃতি। স্বর্ণের এই প্রতিভূগুলির (বা মূল্যের নিদর্শনগুলির) হয় কোনোই মূল্য নাই, অথবা, যে-পরিমাণ মূল্যের ইহারা প্রতীক তাহার চাইতে মূল্য ইহাদের অনেক কম। চন্দ্র যেরূপ প্রতিফলিত সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল দেখায় এই প্রতিভূগুলিও সেইরূপ প্রকৃত মুদ্রার অর্থাৎ স্বর্ণের মূল্য প্রতিফলিত করে।

সঞ্চালনের উপকরণের কাজ করিতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন। হাজার টাকা মূল্যের পণ্য ক্রয় করিতে হইলে **যে-কোনো** পরিমাণ মুদ্রা থাকিলেই চলিবে না, ঠিক হাজার টাকাই থাকিতে হইবে। পক্ষান্তরে, উপরোক্ত পণ্যের জন্য প্রদত্ত এই হাজার টাকা পরে হাজার টাকা মূল্যের অপরাপর পণ্যের সঞ্চালনের বাহনের কাজ করিতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে বহু স্থানে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়; সুতরাং কোন নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে কী পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন তাহা নির্ভর করে সঞ্চালনশীল সমস্ত পণ্যের দামের মোট পরিমাণের উপর; আবার দামের মোট পরিমাণ নির্ভর করে সঞ্চালনশীল পণ্যের পরিমাণের উপর এবং প্রত্যেক স্বতন্ত্র পণ্যের দামের উপর।

অতএব এক বৎসরে কী পরিমাণ মুদ্রার আবশ্যক হইবে তাহা কেবল এই দুইটি পরিমাণের উপরই নির্ভর করে না, পরন্তু মুদ্রার

সঞ্চালনের দ্রুততার উপরও নির্ভর করে। সঞ্চালনে যদি কম সময় লাগে, তবে সঞ্চালনের প্রক্রিয়ায় অল্প মুদ্রার আবশ্যক হয় এবং বেশী সময় লাগিলে অধিক মুদ্রার আবশ্যক হয়।

দ্রব্য ও পণ্য হিসাবে পণ্যের দ্বৈত প্রকৃতি পণ্য-উৎপাদনের বিরোধের অধিকতর বিকাশের পথ প্রশস্ত করিয়া তোলে। পণ্যসমূহ যখন পরস্পরের সহিত সরাসরি বিনিময় হয়, তখন বিক্রয় যুগপৎ হইয়া পড়ে ক্রয়। মুদ্রা ক্রয় হইতে বিক্রয়কে পৃথক করা সম্ভব করিয়াছে। পণ্য-উৎপাদক স্বীয় পণ্য বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত মুদ্রা কিছু কালের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু বহুসংখ্যক উৎপাদক ক্রয় না করিয়া বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিলে তাহার ফলে বাজারে ব্যাঘাত ঘটে। এইরূপে মুদ্রা সঙ্কটের পথ খুলিয়া দেয়, এবং পণ্য-উৎপাদনের আরও উন্নতির দরুন ও পুঁজিবাদী উৎপাদনে তাহার বিবর্ত্তনের ফলে সঙ্কটও অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

পণ্য বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত মুদ্রা পণ্যের মালিক প্রায়শই পৃথক করিয়া রাখে। মুদ্রা হইল 'বাস্তব সম্পদের সার্ব্বজনীন প্রতিভূ' *। পুঁজিবাদী জগতে যে কোনো মুহূর্ত্তে মুদ্রাকে যে-কোনো পণ্যে রূপান্তরিত করা যায়। পণ্যকে মুদ্রায় রূপান্তর করাই দুষ্কর, মুদ্রাকে পণ্যে রূপান্তরিত করা দুষ্কর নয়। সুতরাং মুদ্রাই হইল সঞ্চয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, অথবা বিপুল সম্পদ সঞ্চয়ের উপকরণ। পুঁজিতন্ত্রে মুনাফা সঞ্চয়ের লালসার সীমা নাই। সমৃদ্ধিশালী হইবার আকাঙ্ক্ষা যথাসম্ভব প্রভূত পরিমাণে মুদ্রা সঞ্চয়ের প্রেরণা জোগায়।

* মার্ক্স: 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড পৃঃ ১০১।

সম্পদ সঞ্চয়ের উপায় হিসাবে মুদ্রাকে প্রকৃত অর্থেই মুদ্রা হইতে হইবে। মূল্য-মাপ রূপে কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যেমন ইহার নিজস্ব মূল্য থাকা দরকার, সেইরূপ এক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব মূল্য থাকা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ইহাকে সর্ব্বদা প্রকৃত রূপে উপস্থিত থাকিতেই হয়ঃ কারণ, নিছক কাল্পনিক মুদ্রাকে সঞ্চয় করা যায় না, যে মুদ্রার যথার্থই অস্তিত্ব আছে শুধু সেই মুদ্রাই সঞ্চয় করা যায়। সুতরাং সঞ্চালনের বাহনরূপে মুদ্রার যে-গুণ আছে সেইগুণ থাকাও প্রয়োজন।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশে এমন লোক খুব কমই দেখা যায় যে কেবল মাত্র সঞ্চয়ের লালসাতেই সঞ্চয় করে। মুদ্রার আকারে মুদ্রা মজুত করে বা কেবলমাত্র সম্পদ জমা করে যে-মানুষ সে হইল পুঁজিতন্ত্রের প্রাথমিক যুগের বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদী কারবারী এখন আর মুদ্রার স্বর্ণাভ বর্ণচ্ছটায় অন্ধ হয় না। সে জানে যে স্বীয় সম্পদ বাড়াইতে তাহাকে অবশ্যই তাহার উৎপাদন বাড়াইতে হইবে, শ্রমিকদের নিকট হইতে নিঃশেষে নিংড়াইয়া লইতে হইবে আরও মজুরীবিহীন শ্রম। তথাপি আধুনিক পুঁজিবাদকে (অথবা যে ব্যাঙ্ক ইহার কাজ করে তাহাকেও) সময় সময় মুদ্রা সঞ্চয়ে ব্যাপৃত হইতেই হয়। উৎপাদন বাড়াইবার জন্য ইহার থাকা দরকার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা, এই মুদ্রার সবটাই একই সঙ্গে ব্যয় করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই পরিমাণ মুদ্রা পুঁজিবাদ সঞ্চয় করে।

উপরন্তু লেনদেনের উপায় হিসাবেও মুদ্রা কাজ করে। ক্রয়-বিক্রয় প্রায়ই ধারে সম্পন্ন হয়। ক্রেতা পণ্য ক্রয় করে এবং এক নির্দ্ধারিত সময়ের শেষে দাম পরিশোধ করে। মুদ্রার এই কাজ বিনিময়ে আরও ব্যাপক উন্নতির ইঙ্গিত দেয়। স্বতন্ত্র পণ্য-উৎপাদকদের মধ্যে সংযোগ

দৃঢ়তর হয়। তাহাদের পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। এখন ক্রেতা হইয়া পড়ে খাতক আর বিক্রেতা পরিবর্ত্তিত হয় পাওনাদারে। দেনা পরিশোধের সময় আসিলে সব কিছু উপেক্ষা করিয়া খাতককে মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হয়। দেনা পরিশোধের জন্য তাহাকে পণ্য বিক্রয় করিতে হয়। ক্রেতা না পাইলে এবং দেনা পরিশোধ করিতে না পারিলে কী ঘটে? ইহা যে কেবল তাহারই উৎপাদনে আঘাত হানিবে তাহা নয়, পরন্তু তাহার পাওনাদারের উৎপাদনেও আঘাত হানিবে; পাওনাদার যাহা ধারে দিয়াছিল তাহা ফেরত পাইবে না। এইভাবে সঙ্কটের সম্ভাবনা আরও তীব্রতর হইয়া উঠে। সঞ্চালনের উপায় হিসাবে মুদ্রার কাজের মধ্যেই পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কটের এই সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে।

সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রার পরিমাণ যে-নিয়মে নির্দ্ধারিত হয় তাহাতে লেনদেনের উপায় হিসাবে মুদ্রার কাজ নূতন শর্ত্ত প্রবর্ত্তন করে। সঞ্চালনের বাহন হিসাবে কাজ করিবার সময় মুদ্রার কতকগুলি লক্ষণ দেখা দেয়; আবার লেনদেনের উপায় হিসাবে কাজ করিবার সময়ও মুদ্রার কতকগুলি লক্ষণ দেখা দেয়; এই দ্বিতীয় লক্ষণগুলি প্রথম লক্ষণগুলির সহিত যুক্ত হয়। পূর্ব্বে সঞ্চালনের কাজে আবশ্যক মুদ্রার পরিমাণ নির্ভর করিত সঞ্চালনশীল দ্রব্যসম্ভারের দামের মোট পরিমাণের উপর এবং মুদ্রাসঞ্চালনের দ্রুততার উপর। বর্ত্তমানে ঐ সঙ্গে নিম্নলিখিত নূতন শর্ত্তাবলী যোগ করিতে হইবে। প্রথমত, যে-সমস্ত পণ্য ধারে বিক্রয় হয় তাহাদের দামের মোট পরিমাণ সঞ্চালনশীল পণ্যের দামের মোট পরিমাণ হইতে বাদ দেওয়া দরকার। পক্ষান্তরে, যে-সব পণ্য ধারে বিক্রয় হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের দাম পরিশোধের সময় হইয়াছে, তাহাদের দামের মোট পরিমাণ অবশ্যই যোগ করিতে হইবে। অধিকন্তু যে-সব

লেনদেন পরস্পর কাটাকাটি যায় তাহাদের মোট পরিমাণও আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে, কারণ বিভিন্ন পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সর্ব্বশেষে, মুদ্রা **সার্ব্বজনীন মুদ্রার** ভূমিকা গ্রহণ করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যে স্বর্ণ একটি পণ্য, প্রত্যেকের নিকট গ্রহণ-যোগ্য হওয়াতে অন্যান্য সব পণ্য হইতে ইহা (স্বর্ণ) ভিন্ন ধরনের। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যে স্বর্ণের সহায়তায় সমতা রক্ষা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ অনুমান করা যাক যে আমেরিকা হইতে আমদানির তুলনায় ইংলণ্ড আমেরিকায় অধিকতর মূল্যের পণ্য রফ্তানী করিয়াছে, ফলে এই দেনা পরিশোধ করিতে আমেরিকাকে অবশ্যই কতক পরিমাণ স্বর্ণ ইংলণ্ডে চালান দিতে হইবে।

কাগজের টুক্রাকে স্বর্ণের স্থানে স্থাপন করা রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছে। এই কাগজের টুক্রা স্বর্ণের প্রতিভূ। প্রচারিত কাগজী মুদ্রার পরিমাণ যদি পণ্য-সঞ্চালনের জন্য আবশ্যক পরিমাণের বেশী না হয়, যদি ইহাকে ইচ্ছামত স্বর্ণের সহিত বিনিময় করা যায়, তাহা হইলে ইহার ক্রয়শক্তি স্থায়ী হয়। পুঁজিবাদী সরকার কিন্তু প্রায়শই স্বীয় প্রয়োজন পূরণ করিতে, বিশেষ করিয়া যুদ্ধ ও অপরাপর সর্ব্ববিধ বিপর্য্যয়ের কালে, অতিরিক্ত পরিমাণ কাগজী মুদ্রা প্রচার করে। ফলে মুদ্রার মূল্য হ্রাস পায়। বর্ত্তমান সময়ে পুঁজিবাদ নিদারুণ সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে; কতিপয় বুর্জোয়া সরকারও এখন এই পথ অবলম্বন করিয়াছে। সর্ব্বপ্রথম কয়েকটি অপ্রধান দেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু অবিলম্বেই প্রধানতম পুঁজিবাদী সরকার ইংলণ্ড এবং আমেরিকাও একই পথ অনুসরণ করে।

পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদক সমাজে বিভিন্ন উৎপাদকের মধ্যে সামাজিক সংযোগ প্রচ্ছন্ন, অস্পষ্ট। এই সামাজিক সংযোগ প্রকাশ পায় পণ্যের বিনিময়ে। পণ্য-উৎপাদনে শ্রম মূল্যের আকার লাভ করে। পণ্যের বিনিময় হয় তাহাদের মূল্য অনুযায়ী অর্থাৎ পণ্যে রূপায়িত সামাজিক ভাবে আবশ্যক নির্ব্বিশেষ শ্রমের পরিমাণ অনুসারে। পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের অন্তর্নিহিত সকল বিরোধ ভ্রূণ রূপে দেখা যায় পণ্যে, তাহাদের মূল্য, পণ্যের বিনিময়ে।

মূল্যের নিয়ম—পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের গতির নিয়ম

"অতি সহজ, অতি সাধারণ, মূল ও সাধারণ বিষয় মার্ক্‌স্ তাঁহার 'ক্যাপিটাল'-এ সর্ব্বপ্রথম বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন এমন এক **সম্পর্ক** যাহা বস্তুর আকারে দেখা দেয় এবং বুর্জোয়া (পণ্য) সমাজে কোটি কোটি বার লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ পণ্য-বিনিময়। বিশ্লেষণে ইহাই প্রকাশ পায় যে, এই একটি সহজ বিষয়ের মধ্যে (বুর্জোয়া সমাজের এই কোষে)আধুনিক সমাজের **সমস্ত** বিরোধ (যথাক্রমে **সমস্ত** বিরোধের ভ্রূণ) বর্ত্তমান। পরবর্ত্তী ব্যাখ্যা আদ্যন্ত এই বিরোধ-সমূহের এবং সমস্ত অংশের সমষ্টি হিসাবে সমগ্র সমাজের বিকাশ (বৃদ্ধি ও গতিবিধি উভয়ই) প্রদর্শন করে।" *

মূল্যের নিয়ম হইতেছে পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের **গতির নিয়ম**। এই গতি বিরোধসমূহের আরও বিকাশ রূপে দেখা দেয় ; এই বিরোধের বীজ নিহিত আছে মূল্যে। সঙ্কটের সময় এই বিরোধ তীব্রতম রূপে প্রকাশ পায়। পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য উৎপাদনের এই বিশৃঙ্খলা নগ্ন রূপে দেখা দেয় সঙ্কটের সময়ে।

* লেনিন : 'মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌স্-মার্কস্‌বাদ', "ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ সম্বন্ধে", পৃঃ ২০৯।

বর্ত্তমান পুঁজিবাদী সঙ্কট ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উৎপাদন-শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ (যে-বিরোধ পুঁজিতন্ত্রকে তাহার অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের দিকে টানিয়া নেয়) মাথা চাড়া দিয়া উঠে সঙ্কটের সময়ে।

পণ্য-উৎপাদনের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং ইহার পুঁজিবাদী উৎপাদনে রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদ যখন আরও বিকাশ লাভ করে, তখন পণ্য এবং মূল্যের অন্তর্নিহিত বিরোধও বাড়িয়া যায় এবং জটিলতর হইয়া উঠে। পণ্যের অন্তর্নিহিত বিরোধের বৃদ্ধি পুঁজিবাদী বিকাশের এক বিরাট ঐতিহাসিক পদক্ষেপের ইঙ্গিত।

> " মার্ক্স্ পণ্যগত আর্থিক ব্যবস্থা ও সহজ বিনিময়ের আদিম বীজ হইতে ইহার উন্নততর রূপ—বৃহদাকার উৎপাদন—পর্য্যন্ত পুঁজিবাদের বিকাশ বিশ্লেষণ করিয়াছেন।" *

বহু শতাব্দী ব্যাপী বিকাশের এই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ধারা মার্ক্স্ কি ভাবে নির্ণয় করিয়াছেন তাহা দেখাইয়া লেনিন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কি ভাবে বিরোধের উৎপত্তি ঘটে। এই বিরোধর বীজ পূর্ব্ব হইতেই পণ্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

> "বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদেরা যেখানে দেখিয়াছিলেন দ্রব্যের সম্পর্ক (এক পণ্যের সহিত অপর পণ্যের বিনিময়), মার্ক্স্ সেইখানেই উদ্ঘাটন করিয়াছেন **মানুষে-মানুষে সম্পর্ক**। পণ্য-বিনিময় বাজারের সহায়তায় বিভিন্ন উৎপাদকের মধ্যকার সংযোগ প্রকাশ করে। **মুদ্রায়** ইহাই বুঝায় যে, বিভিন্ন উৎপাদকের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন এক সমষ্টিতে মিলিত করিয়া এই সংযোগ ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। এই সংযোগের আরও উন্নতি সাধন

* ঐ, 'মার্ক্স্‌বাদের তিনটি উৎস ও তিনটি উপাদান', পৃঃ ৫৩।

হইতেছে পুঁজির তাৎপর্য্য: মানুষের শ্রমশক্তি পণ্যে পরিণতি লাভ করে।

"...শ্রমিকের শ্রমে উৎপন্ন পুঁজি শ্রমিকেরই উপর করে পীড়ন, ক্ষুদ্র মালিকদের করে ধ্বংস এবং গড়িয়া তোলে এক বেকার বাহিনী...। "ক্ষুদ্র উৎপাদনকে পরাস্ত করিয়া পুঁজি শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং বড় বড় পুঁজিপতিদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। উৎপাদন উত্তরোত্তর অধিক সামাজিক হইয়া উঠে; লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শ্রমিক এক সুব্যবস্থিত অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যে সংযুক্ত হয়, কিন্তু যৌথ শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি। উৎপাদনের বিশৃঙ্খলা, উন্মত্তের মত বাজার সন্ধান, সঙ্কট এবং জনসাধারণের জীবন ধারণের অনিশ্চয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়।" *

পুঁজিতন্ত্রের বিরোধের বিকাশ কিন্তু একই সময়ে সর্ব্বহারার চূড়ান্ত বিজয়ের ভিত্তি রচনা করে। লেনিন লিখিয়াছেন:

"পুঁজিতন্ত্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র জয়ী হইয়াছে, কিন্তু পুঁজিকে পরাস্ত করিয়া শ্রম জয় লাভ করিবে; পুঁজিতন্ত্রের বর্ত্তমান বিজয় হইতেছে শ্রমের সেই বিজয় লাভের সূচনা মাত্র।" †

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। স্বাভাবিক উৎপাদন ও পণ্য-উৎপাদনের মধ্যে প্রভেদ কি?
২। পণ্যের মূল্য কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়?
৩। কোন শ্রমকে সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রম বলে?
৪। বিশেষ ও নির্বিবশেষ শ্রমের পার্থক্য কি?
৫। পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থায় বাজারের অবস্থা কি?
৬। মূল্যের নিয়ম কি ভাবে কাজ করে?
৭। সহজ পণ্য-উৎপাদন হইতে পুঁজিতন্ত্রের প্রভেদ কোথায়?
৮। মুদ্রা ব্যতীত কি পণ্য-উৎপাদনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে?

* ঐ, পৃঃ ৫২-৫৩।
† ঐ, পৃঃ ৫৩।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পুঁজিবাদী শোষণের সারমর্ম

সকল পুঁজিবাদী দেশেই **শ্রমিক শ্রেণীর উপরে বুর্জোয়াদের শোষণ-ব্যবস্থা** বিদ্যমান। পুঁজিবাদী সমাজ দুইটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত—শ্রমিক শ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণী। প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশেই এই দুইটি মূল শ্রেণী পরস্পরের সম্মুখীন। যে-অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমের ফল বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা আত্মসাৎ করা সম্ভবপর হইয়াছে সে-অবস্থা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে জানিতে হইবে। সর্ব্বহারার মহান শিক্ষক কার্ল মার্ক্স পুঁজিবাদী শোষণের যে-গোপন রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের অনুধাবন করিতেই হইবে।

পুঁজির দ্বারা শ্রমিকরা কি প্রকারে শোষিত হয়। শ্রমশক্তি একটি পণ্য।

পুঁজিবাদী শোষণের গোপন রহস্য কী? কী ভাবে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে? পুঁজিপতিদের সমৃদ্ধি লাভের গূঢ় রহস্য কী? কোন অদৃশ্য শৃঙ্খলে শ্রমিক তাহার শোষকের নিকট আবদ্ধ? এক শ্রেণী কেন অপরকে নিঃস্ব করিয়া সম্পদশালী হইয়া উঠে?

এই সমস্ত প্রশ্নের প্রত্যেকটিরই সুস্পষ্ট এবং সঠিক উত্তর দেয় মার্ক্সীয় তত্ত্ব (theory)। আমাদের নিকট মার্ক্সীয় শিক্ষা পুঁজিবাদী জগতের আভ্যন্তরীণ সংগঠন ব্যাখ্যা করে, এবং ইহার বিকাশের এবং অনিবার্য্য বিনাশের আভ্যন্তরীণ কার্য্যকরী শক্তিগুলি উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়।

সরল পণ্য-উৎপাদন এবং ইহার মূল বিধি অর্থাৎ **মূল্য-বিধির** (law of value) বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করিয়াছি। সরল

পণ্য-উৎপাদনের প্রথা অবশ্যম্ভাবী রূপে নিজের মধ্যেই **পুঁজিবাদী উপাদান** সৃষ্টি করিয়া বসে। সরল পণ্য-উৎপাদন বিকাশ লাভ করিয়া পুঁজিতন্ত্রে রূপায়িত হইয়া উঠে। মূল্য-বিধিই পণ্যোৎপাদন-প্রথার বিকাশের বিধি। এই বিকাশ পুঁজিতন্ত্রে গিয়া পৌঁছায়। এই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মূল মূল্য-বিধিরও শক্তিবৃদ্ধি হয়।

পুঁজিবাদ কী? লেনিন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন নিম্নলিখিত রূপে:

> "বিকাশের সর্ব্বোচ্চ স্তরে, যখন শ্রমশক্তি নিজেই পণ্যে পরিণত হইয়া পড়ে, তখন পণ্য-উৎপাদনকে বলে পুঁজিবাদ।" *

পণ্যোৎপাদনের প্রথায় দ্রব্যসমূহ প্রত্যক্ষ ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত না হইয়া উৎপাদিত হয় বিনিময়ের জন্য, বাজারের জন্য, বিক্রয়ের জন্য। মূল্য-বিধি উৎপাদন এবং পণ্য-বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে। পণ্যের বিনিময় হয় মূল্য অনুযায়ী অর্থাৎ পণ্য-উৎপাদনে আবশ্যক সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ অনুসারে।

পণ্য-উৎপাদন এবং ইহার বিধিসমূহকে পুঁজিতন্ত্র বাতিল করিয়া দেয় না। পক্ষান্তরে, পুঁজিবাদের আওতায় পণ্য-উৎপাদন বিকাশের **সর্ব্বোচ্চ স্তরে** উপনীত হয়। পণ্য-উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণকারী বিধি পুঁজিবাদের আওতায় আরও ব্যাপক ও প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিধি পণ্য-উৎপাদনের বিধির, বিশেষত, মূল্যবিধির উপর সংস্থাপিত। মার্ক্‌স্‌ বলিয়াছেন:

"পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথা শুরু হইতেই দুইটি বিশেষ লক্ষণে

* লেনিন: 'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্ব্বোচ্চ স্তর', ৪র্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৭, মস্কো ১৯৩৪।

চিহ্নিত : (১) ইহা স্বীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদন করে পণ্য হিসাবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন পণ্য উৎপাদন করে, শুধু এই তত্ত্বই অন্যান্য উৎপাদন-পদ্ধতির সহিত ইহার পার্থক্য নির্দ্দেশ করে না। ইহার বিশেষত্ব—ইহার উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভারের কার্য্যকরী এবং নির্দ্দেশক প্রকৃতি এই যে ইহারা পণ্য। প্রথমত, ইহার তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে স্বাধীন মজুরী-শ্রমিক রূপে শ্রমিক নিজেই পণ্য-বিক্রেতার ভূমিকা গ্রহণ করে,ফলে মজুরী-শ্রম হইয়া পড়ে শ্রমের বিশেষ প্রকৃতি।

"(২) উৎপাদনের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য এবং মূল প্রেরণার উৎস রূপে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করা হইতেছে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির অপর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। পুঁজি মুখ্যত পুঁজি উৎপাদন করে; এবং ইহা যে-পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে কেবল সেই পরিমাণ পুঁজিই উৎপন্ন হয়।" *

পণ্য-উৎপাদনের কাঠামো প্রসার লাভ করে পুঁজিবাদের আওতায়। **নূতন একটি পণ্য** দেখা দেয়—শ্রমশক্তি। এই পণ্যের কোনো অস্তিত্বই ছিল না সহজ পণ্যোৎপাদনের ব্যবস্থায়। ইহা কোন প্রকারের পণ্য? মার্ক্স্ এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন নিম্নলিখিত রূপে:

"শ্রমশক্তি বা শ্রম করিবার ক্ষমতার দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত সেই সমস্ত মানসিক এবং শারীরিক কর্ম্মশক্তির সমষ্টিকে বুঝিতে হইবে যাহা কোনো প্রকার ব্যবহার-মূল্য উৎপাদনের সময়ে মানুষ প্রয়োগ করিয়া থাকে।" †

* মার্ক্স্: 'ক্যাপিটাল', ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০২৫-২৬, চার্লস্ এইচ কার এণ্ড কোং, ১০৯।

† মার্ক্স্: 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪৫।

অন্য কথায় বলা চলে, শ্রমশক্তি হইতেছে মানুষের শ্রমের ক্ষমতা, তাহার উৎপাদনের কর্ম্মক্ষমতা। মার্ক্‌স্‌ বলেন ঃ

> "পুঁজিপতি শ্রমশক্তি ক্রয় করে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, আর ব্যবহারে নিয়োজিত্‌ শ্রমশক্তিই হইতেছে শ্রম।" *

পুঁজিবাদী প্রথায় শ্রমশক্তি পণ্যে পরিণত হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রম-শক্তি কি সর্ব্বদাই পণ্য? সব সময় নিশ্চয়ই নয়। ক্ষুদ্র উৎপাদকের কথাই ধরা যাক। সে তাহার নিজের জমিতে অথবা নিজের কারখানায় নিজেই কাজ করে। আপনার উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় করিলেও সে কিন্তু নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে না, নিজের শ্রমশক্তি সে নিজেই ব্যবহার করে। ব্যাপারটি খুবই স্পষ্ট যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে নিজের জমির অথবা কারখানার মালিক থাকে কেবলমাত্র ততক্ষণই তাহার শ্রমশক্তির এইরূপ ব্যবহার সম্ভব। কারিগরের হাত হইতে তাহার হাতিয়ার যন্ত্রপাতি সরাইয়া লইলে, ক্ষুদ্র কৃষকের নিকট হইতে তাহার জমি লইয়া গেলে তাহাদের শ্রমশক্তি আর তাহারা নিজেদের ব্যবসায়ে নিয়োগ করিতে পারে না।

তখন তাহাদের আর কী করিবার থাকে? অনশনের হাত এড়াইবার জন্য তাহারা কারখানা, খামার, জমি, কল বা রেলপথের যাহারা মালিক সেই সমস্ত পুঁজিপতিদের নিকটে কাজের জন্য আবেদন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পুঁজিপতির নিকট ভাড়া খাটিবার অর্থ কী? ইহার অর্থ—শ্রমশক্তি বিক্রয় করা।

ইহা হইতে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, পুঁজিতন্ত্রের অভ্যুত্থানের জন্য প্রয়োজন সুনির্দ্দিষ্ট **অবস্থা** অর্থাৎ পূর্ব্বগামী পরিবেশ। ইহার

* ঐ।

জন্য প্রয়োজন, উৎপাদনের উপকরণসমূহ (অথবা এই সমস্ত উপকরণ ক্রয়ের জন্য যথেষ্ট অর্থসম্ভার) সমাজের কতিপয় সভ্যের করতলগত থাকিবে ; আবার অপর পক্ষে ইহাও প্রয়োজনীয় যে, শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য এমন এক শ্রেণীর লোকও সমাজে থাকিবে।

"পুঁজির উৎপত্তির ঐতিহাসিক আবশ্যকীয় পরিবেশ হইতেছে—প্রথমত, সাধারণ পণ্য-উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার অধীনে ব্যক্তি বিশেষের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সঞ্চয় ; দ্বিতীয়ত, এমন শ্রমিকের অস্তিত্ব যাহারা দ্বিবিধ অর্থেই 'স্বাধীন'। তাহাদের শ্রমশক্তির বিক্রয় সম্বন্ধে যে-কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা হইতেই তাহারা 'মুক্ত' ঃ জমি হইতে বা উৎপাদনের সর্ব্বপ্রকার উপকরণ হইতে স্বাধীন অর্থাৎ বিষয়সম্পত্তিহীন শ্রমিক বা 'সর্ব্বহারা' : নিজেদের শ্রমশক্তির বিক্রয় ব্যতিরেকে নিজেদের অস্তিত্ব ইহারা বজায় রাখিতে পারে না।"*

আদিম সঞ্চয়

পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাব হয় পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজব্যবস্থার অর্থাৎ ভূম্যধিকারী (সামন্ত) আর্থিক ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের উপর। ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থার ক্রোড়েই পুঁজিতন্ত্র জন্মলাভ করে। পূর্ব্বপ্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের এক ব্যাপক রূপান্তর সাধন করে পুঁজিতন্ত্র।

পুঁজিপতিরা প্রকৃতপক্ষে কিরূপে অর্থ লাভ করিল ? পুঁজিবাদী যুগের আদিতে, প্রায় তিন বা চারি শত বৎসর পূর্ব্বে, তদানীন্তন অগ্রণী ইয়োরোপীয় দেশগুলি (স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড) এক সুবিস্তৃত বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্য গঠন করিয়া তুলিয়াছিল।

* লেনিন : 'মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্-মার্ক্সবাদ,' "কার্ল মার্ক্স," পৃঃ ১৮।

সাহসী পর্য্যটকগণ প্রাচ্যের দূরবর্ত্তী এবং সম্পদশালী দেশগুলির (ভারতবর্ষ এবং মহাচীনের) পথ আবিষ্কার করিলেন। আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল। বারুদের আবিষ্কারে ইয়োরোপীয়দের পক্ষে এই সমস্ত দেশের অধিবাসীদের প্রতিরোধের প্রচেষ্টাকে পরাভূত করা সহজ হইল। সমগ্র আমেরিকা পরিণত হইল কতকগুলি উপনিবেশে। ইয়োরোপীয়, বিশেষ করিয়া বৃটিশ, পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের অন্যতম সর্ব্বপ্রধান উৎস ছিল সাগরপারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্পদশালী দেশগুলি লুণ্ঠন করা। অপর একটি উৎস ছিল খাস ইয়োরোপের দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ এবং পরাজিত দেশগুলি লুণ্ঠন। সর্ব্বোপরি তেজারতি কারবারের মারফতে স্বদেশীয় জনসাধারণকে লুণ্ঠন, বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্যে অত্যধিক দাম আদায় করিয়া লুণ্ঠন, এবং অংশত প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন (বিশেষত জলদস্যুবৃত্তি)—পুঁজির জন্মের ইতিহাসে যে-সব পদ্ধতি নিয়োজিত হইয়াছে দেখা যায় তাহাদের মধ্যে এইগুলি কম উল্লেখযোগ্য নয়।

কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার আবির্ভাবের জন্য যে সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন, সম্পদ সঞ্চয় তাহার অর্দ্ধাংশ মাত্র। অপরার্দ্ধ হইতেছে যথেষ্ট সংখ্যক **স্বাধীন শ্রমিক** পাওয়া।

যতক্ষণ স্বাধীন ভাবে নিজে নিজে কাজ করিবার উপায় থাকে ততক্ষণ কেহই পুঁজিপতির কাজ করিতে যাইবে না। ক্ষুদে উৎপাদকের নিকট হইতে উৎপাদনের উপকরণসমূহ সরাইয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে সে তাহার একমাত্র অবশিষ্ট যথাসর্ব্বস্ব অর্থাৎ শ্রমশক্তি লইয়া বাজারে যাইতে বাধ্য হইবে। মজুরী-শ্রমের অপর একটি আবশ্যকীয় শর্ত্ত হইতেছে এই যে, স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার জন্য, স্বাধীন ভাবে তাহাদের শ্রমশক্তি বিনিময় করিতে পারিবার জন্য জনসাধারণ ব্যক্তিগত ভাবে অবশ্যই স্বাধীন হইবে।

ইয়োরোপ ব্যাপী ভূমিদাসত্বের যুগে এই অবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। পুঁজিতন্ত্র যে পূর্ব্ববর্ত্তী ভূমিদাস-প্রথার বিনাশ সাধন করে সে এই কারণেই।

কিন্তু পুঁজির স্বার্থের খাতিরে কৃষককে মুক্ত করাই যথেষ্ট নয়। তাহাদিগকে এমন অবস্থায় ফেলিতে হইবে যাহাতে সে **পুঁজিপতির** কারখানায় **কাজ খুঁজিতে** বাধ্য হয়। সত্য বটে যে, পুঁজির প্রভাবে সর্ব্বস্বান্ত কারিগর এবং হস্তশিল্পীদের মধ্য হইতে কতিপয় শ্রমিক পুঁজিই সংগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা আদৌ যথোপযুক্ত নয়। নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যক বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের। উপরন্তু, পুঁজির জন্য কিছু শ্রমিক সকল সময়েই মজুত রাখিতে হয়। এ-বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

অতএব, ভূমিদাসত্ব হইতে কৃষকের 'মুক্তি'র সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি 'মুক্তি'ও সাধিত হয়—তাহাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। যে-জমিতে সে কাজ করিত তাহা হইতেও কৃষকের মুক্তি হইয়াছে। কৃষকের হাতে জমির কেবল সেই অংশই থাকে (এবং তাহাও সে কিনিয়া লয়) যাহার দ্বারা ভূম্যধিকারীর অধীনে তাহার খাওয়া পরা চলিত। জমির স্বল্পতা কৃষককে পুঁজির মুঠার মধ্যে ঠেলিয়া দেয়। 'অতিরিক্ত' শ্রমজীবী গ্রাম ত্যাগ করিয়া মজুরী-শ্রমিকের এক মজুত বাহিনী গঠন করিয়া তোলে। এই বাহিনী পুঁজিবাদী শিল্পের অধীনস্থ হয়।

আদিম সঞ্চয় এইরূপেই পুঁজিতন্ত্রের অভ্যুত্থানের উপযোগী **আবশ্যকীয় পরিবেশ** সৃষ্টি করে। যে-আবশ্যকীয় **অবস্থা** ব্যতিরেকে পুঁজিতন্ত্র চলিতে পারে না, আদিম সঞ্চয় সেই অবস্থা গড়িয়া তোলে। এই অবস্থা কী তাহা আমরা জানি। এক দিকে সমাজের ক্ষুদ্র এক অংশের

হাতে সম্পদের সঞ্চয়, অন্য দিকে উৎপাদনের উপকরণবিহীন সর্ব্বহারা অবস্থায় বিশাল শ্রমিক সম্প্রদায়ের রূপান্তর এবং তাহার ফলে শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে সর্ব্বহারাদের বাধ্য হওয়া। আদিম সঞ্চয় এইরূপে উৎপাদককে তাহার স্বীয় উৎপাদনের উপকরণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। দস্যুবৃত্তি এবং লুণ্ঠন, হত্যা এবং অত্যাচারের নৃশংসতম পদ্ধতির সাহায্যে এই বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা হয়। পুঁজিতন্ত্রের উৎপত্তির জন্য এই সব অবস্থা সৃষ্টি হইবার পর খাস পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ফলে সেগুলি আরও দৃঢ়মূল হয়। পুঁজিবাদী কারখানায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যাইতে থাকিলেও শ্রমিকরা শোষকদের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াই চলে। নিজেরা কিন্তু সেই বঞ্চিত সর্ব্বহারাই থাকিয়া যায়, নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

পুঁজি সর্ব্বপ্রথম মুদ্রা রূপে আবির্ভূত হয়। সুতরাং ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন-পদ্ধতি হইতে পুঁজিতন্ত্রে বিবর্ত্তনে মুদ্রা এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। পণ্য-উৎপাদনের পদ্ধতির বিকাশের এক বিশেষ পর্য্যায়ে মুদ্রা পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়।

মুদ্রার পুঁজিতে রূপান্তর

পণ্য-সঞ্চালনের সূত্র সাধারণত এইরূপ :—প (পণ্য)—মু (মুদ্রা)—প (পণ্য) অর্থাৎ একটি পণ্য ক্রয়ের জন্য অপর একটি পণ্য বিক্রয়। পুঁজির সাধারণ সূত্র ইহার বিপরীত : মু (মুদ্রা)—প (পণ্য) —মু (মুদ্রা), অর্থাৎ (মুনাফা সহ) বিক্রয়ের জন্য ক্রয়।

এই দুইটি সূত্রের পার্থক্য কী ? প-মু-প সূত্রটি সরল পণ্য-উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে একটি পণ্যের সহিত অন্য একটি পণ্যের বিনিময় হয়। মুদ্রা কেবল বিনিময়ের বাহন হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষেত্রে বিনিময়ের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ধরা যাক, চাউলের সহিত মুচি তাহার জুতা বিনিময় করে। একটি ব্যবহার-মূল্যকে অপর একটির সহিত

বিনিময় করা হয়। পণ্য-উৎপাদক তাহার পক্ষে যে-পণ্য অপ্রয়োজনীয় সেই পণ্যের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় পণ্য গ্রহণ করে।

অপর পক্ষে পুঁজি সঞ্চালনের সূত্রটি সর্ব্বতোভাবেই ভিন্ন প্রকৃতির। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা লইয়া বাজারে যায় পুঁজিপতি। এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইল—পণ্যের পরিবর্ত্তে মুদ্রা। নিজের মুদ্রার দ্বারা পুঁজিপতি পণ্য ক্রয় করে। কিন্তু পুঁজির গতি ইহাতেই শেষ হয় না। পুঁজিপতির পণ্য রূপান্তরিত হয় মুদ্রায়। এইরূপে পুঁজির গতির সূচনা এবং সমাপ্তি এক হইয়া মিলিয়া যায়। শুরুতেও পুঁজিপতির হাতে ছিল মুদ্রা, শেষেও তাহার হাতে থাকে মুদ্রা। কিন্তু, ইহা সুবিদিত যে মুদ্রা সর্ব্বদাই অভিন্ন: ইহার গুণগত কোনো পার্থক্য হয় না, কেবল পরিমাণগত পার্থক্য হয়। অন্যান্য পণ্যের মধ্যে যেরূপ বিপুল গুণগত পার্থক্য রহিয়াছে, মুদ্রায় তাহা নাই। পুঁজি সঞ্চালনের সূচনায় এবং শেষে যদি সমান পরিমাণ পুঁজি পুঁজিপতির থাকে, তবে পুঁজি-সঞ্চালনের এই সম্পূর্ণ গতি আগাগোড়াই অর্থহীন হইয়া পড়ে। পুঁজির অস্তিত্বের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য, ইহার গতির পূর্ণ তাৎপর্য্য এই যে, গতির আরম্ভে সঞ্চালনে যত মুদ্রা ছাড়া হয় গতির শেষে তাহা অপেক্ষা অধিক তুলিয়া লওয়া হয়। পুঁজির লক্ষ্য মুনাফা সংগ্রহ করা। সরল উৎপাদনের সূত্রের মত পুনরায় ক্রয়ের জন্য বিক্রয় ইহার সূত্র নয়। ইহার সূত্র হইল ক্রয় এবং মুনাফার জন্য বিক্রয়।

কিন্তু কী উপায়ে মুনাফা লাভ করা হয়? যদি কোনো পুঁজিপতি নিজের মুদ্রার দ্বারা কোনো সাধারণ পণ্য ক্রয় করে এবং পড়তা মূল্যের উপরে বিক্রয় করে, তবে তাহার সম্পদ বাড়ে। এই সম্পদ বৃদ্ধি হয় অন্য পুঁজিপতিদের ক্ষতি করিয়া। হয় যাহাদের নিকট হইতে সে পণ্য ক্রয় করে এবং প্রকৃত মূল্য না দিয়া ঠকায় তাহাদের ক্ষতি করিয়া, নতুবা, যাহাদের নিকটে সে অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে তাহাদের ক্ষতি

করিয়া, অথবা, উভয়েরই ক্ষতি করিয়া তাহার এই সম্পদ বাড়ে। কিন্তু আত্মবঞ্চনা করিয়া বা স্বতন্ত্র পুঁজিপতিদের পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া পুঁজিপতি শ্রেণী সমৃদ্ধ হইতে পারে না। তাহা হইলে মুনাফা লাভ করে সে কী প্রকারে? পুঁজিপতিকে মুদ্রা লইয়া বাজারে যাইয়া এক বিশেষ রকমের পণ্য সংগ্রহ করিতেই হইবে। সে-পণ্য এমন একটি পণ্য হইবে যাহা ব্যবহারের সময়ে মূল্য সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী অবস্থায় এমন একটি পণ্য আছেও। সে-পণ্য হইতেছে শ্রমশক্তি।

পণ্যগত আর্থিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি পণ্য স্বীয় মূল্যে বিক্রীত হয়। শ্রমিক কী বিক্রয় করে? শ্রমিক বিক্রয় করে তাহার শ্রমশক্তি।

শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয় এবং তাহার মূল্য

এই শ্রমশক্তি পুঁজিপতির প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অপরিহার্য্য। আমরা জানি যে প্রত্যেকটি পণ্যের মূল্য আছে। আরও জানি, এই মূল্য নির্দ্ধারিত হয় পণ্য উৎপাদনে আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ের পরিমাণের দ্বারা। শ্রমিক যে-পণ্যটি বিক্রয় করে, সেই পণ্যটির, সেই শ্রমশক্তির **মূল্য** কী?

ইহা সুস্পষ্ট যে মানুষ যখন খাওয়া-পরার ও মাথা গুঁজিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয়, কেবল তখনই সে কাজ করিতে পারে। যখন মানুষ তাহার যাবতীয় প্রয়োজন, অন্তত পক্ষে একান্ত প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণ করিতে পারে কেবল তখনই সে কাজ করিতে সক্ষম। ক্ষুধাকাতর বা কাপড়চোপড়ের অভাবে দুস্থ শ্রমিক শ্রমের অযোগ্য হইয়া পড়ে—সে তাহার শ্রমশক্তি হারায়। সুতরাং এইরূপ মনে করা যায় যে, শ্রমিকের অপরিহার্য্য প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণ করা হইতেছে শ্রমশক্তির উৎপাদন।

আবার ইহাও সুবিদিত যে মানুষের প্রয়োজনপূরক এই দ্রব্যসম্ভার (খাদ্যবস্ত্রাদি এবং আশ্রয়স্থল) পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পণ্য বলিয়া পরিগণিত

হয়; বিনা মূল্যে এই সব পাওয়া যাইতে পারে না। এই সমস্ত উৎপাদন করিতে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয়। এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমই উৎপাদনের মূল্য নির্দ্ধারণ করে। সুতরাং 'শ্রমশক্তি' বলিয়া কথিত পণ্যটির মূল্য হইতেছে শ্রমিকের এবং তাহার পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, স্বীয় শ্রমশক্তি পুনঃসঞ্চয়ের জন্য ও পুঁজিপতিদের স্বার্থে ভবিষ্যৎ শ্রমশক্তির সরবরাহ সুনিশ্চিত করিবার জন্য শ্রমিক **যে-সব পণ্য ব্যবহার করে তাহাদের মূল্যের** সমান।

> "সাধারণ শ্রমিকের জীবনধারণের পক্ষে সাধারণ যে-সব জিনিস প্রয়োজন সেই সব জিনিসের মূল্যের দ্বারা শ্রমশক্তির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়।" *

কিন্তু এই সমস্ত পণ্যের মূল্য নির্ভর করে ইহাদের উৎপাদনে আবশ্যক শ্রমের উপর।

অন্য কথায় বলা চলে যে শ্রমশক্তি নামক পণ্যটির মূল্য নির্দ্ধারিত হয় এই বিশেষ পণ্যটির উৎপাদনে আবশ্যক শ্রমের পরিমাণের দ্বারা। আবার শ্রমিক যে-খাদ্যবস্ত্রাদি ব্যবহার করে তাহার দ্বারাই এই পণ্যটি গঠিত হয়। শ্রমশক্তি নামক পণ্যের এই মূল্যই পুঁজিপতি মজুরী হিসাবে দেয়।

পুঁজিপতি হইল কারখানার অধিকারী: সেখানে ইমারতে যন্ত্রপাতি, গুদামে কাঁচা মাল এবং জ্বালানি ও সর্ব্ববিধ আনুষঙ্গিক উপাদান থাকে। মানুষের শ্রম ব্যতীত এ সমস্তই অব্যবহার্য্য। সেই জন্যই পুঁজিপতি শ্রমিক ভাড়া করে। ইহাই তাহার শেষ প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়। ইহার পর সমস্তই ঠিকঠাক, উৎপাদন আরম্ভ হইতে পারে। শ্রমিকরা কাজ আরম্ভ করে, কারখানা চালু হয়, যন্ত্রপাতিও হইয়া পড়ে গতিশীল।

* মার্কস্: 'ক্যাপিটাল,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৭।

শ্রমিককে ভাড়া করিয়া এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহার শ্রমশক্তি ক্রয় করিয়া পুঁজিপতি শ্রমিককে কাজ করায়। তাহার শ্রমশক্তি ক্রয়ের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য নিহিত আছে ইহারই মধ্যে।

শ্রমের সহিত শ্রমশক্তি মিশাইয়া ঘুলাইয়া ফেলা কাহারও পক্ষে উচিত নয়। **শ্রম এবং শ্রমশক্তি এক ও অভিন্ন বস্তু নয়।** শ্রমশক্তি হইল মানুষের কর্ম্মক্ষমতা অর্থাৎ কাজ করিবার সামর্থ্য। শ্রম মূল্যের স্রষ্টা ; কিন্তু সে নিজে পণ্য হইতে পারে না। **পণ্য হইতেছে শ্রমশক্তি।**

আমরা জানি যে রেলইঞ্জিন এবং রেল-ইঞ্জিনের গতির মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন স্টেশনে রেল-ইঞ্জিন অচল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। এক্ষেত্রে রেল-ইঞ্জিন আছে, কিন্তু কোনো গতি নাই। কিন্তু রেল-ইঞ্জিনের গতিশীল হওয়ার সামর্থ্য আছে, প্রয়োজন হইলে গতিশীল হয়ও। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, শ্রমশক্তির মালিক অর্থাৎ শ্রমিক যদি বেকার হয় তবে শ্রমশক্তি এই রকম অব্যবহৃত থাকিতে পারে। কিন্তু পীড়িত না হইলে বা ক্ষুধায় অবসন্ন না হইলে বেকার শ্রমিকেরও শ্রমশক্তি থাকে এবং দীর্ঘ সময় নিশ্চল থাকার পর গতিশীল হইতে পারা রেল-ইঞ্জিনের মত সেও উপযুক্ত সময়ে কাজ আরম্ভ করিতে পারে।

পূর্ব্ববর্ত্তী এক অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে পণ্যের দাম ইহার মূল্যের উপরে বা নিচে হইতে পারে। যাহা হোক, অধিকাংশ অন্যান্য পণ্যের মত না হইয়া শ্রমশক্তির দামের সর্ব্বদাই মূল্যের **নিচে** থাকিবার ঝোঁক থাকে। ইহার অর্থ এই যে শ্রমিক তাহার সমস্ত অভাব পূরণ করিবার উপযোগী জীবনধারণের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে পায় না। যখন আমরা বলি যে শ্রমশক্তির মূল্য নির্দ্ধারিত হয় শ্রমিকের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার মত জীবন ধারণের প্রয়োজ

উপকরণসমূহের মূল্যের দ্বারা, তখন আমরা আদৌ প্রতিপাদন করিতে চাহি না যে শ্রমিক সকল সময়েই তাহার শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্য পায়। পক্ষান্তরে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে তাহার শ্রমশক্তি মূল্যের অপেক্ষা **কম** দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। যাহা হোক, শ্রমিক যখন শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্যও পায়, তখনও পুঁজিপতি উৎপাদন হইতে উদ্বৃত্ত মূল্য পায় এবং ইহা তাহার সম্পদবৃদ্ধির উৎস রূপে কাজ করে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি কী প্রকারে বিভিন্ন পণ্য তাহাদের মূল্যে বিনিময় হয়। এখন দেখা যাক, একের সৃষ্ট মূল্য কিরূপে অপরের কুক্ষিগত হয়। কারবার আরম্ভ করিয়া পুঁজিপতি উৎপাদনের জন্য আবশ্যক প্রত্যেকটি জিনিসই ক্রয় করে: যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল, জ্বালানী। শ্রমিক ভাড়া করিয়া সে প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তিও ক্রয় করে। কারখানায় আরম্ভ হয় উৎপাদন: জ্বালানি জ্বলে, যন্ত্র চালু হয়, শ্রমিকরা শ্রম করে, কাঁচা মাল রূপান্তরিত হয় পণ্যে। যখন পণ্য তৈরী হইয়া যায় তখন তাহা বিক্রয় হয় এবং বিক্রয়লব্ধ মুদ্রার দ্বারা পুঁজিপতি নূতন করিয়া উৎপাদন-চক্র চালু করিতে পারে।

পুঁজিপতির মুনাফার উৎস কী?

এইরূপে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য কত? তাহাদের মূল্য প্রথমত তাহাদের উৎপাদনে যে-সমস্ত পণ্য ব্যয় হইয়াছে তাহাদেরই মূল্য: যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি, নিঃশেষিত জ্বালানি এবং ব্যবহৃত কাঁচা মাল। ধরা যাক এই সমস্তের মূল্য ছিল ৩০০০ ঘণ্টার শ্রম বা ৩০০০ শ্রম-ঘণ্টা। পরে নির্দ্দিষ্ট কারখানায় শ্রমিকদের দ্বারা সৃষ্ট একটি নূতন মূল্য উপস্থিত হয়। ধরা যাক কুড়ি জন লোক প্রত্যেকে প্রতিদিন দশ ঘণ্টা করিয়া পাঁচ দিন কাজ করিল। সহজেই বুঝা

যায় যে তাহারা এইরূপে ১,০০০ শ্রম-ঘণ্টার মূল্য সৃষ্টি করিল। সুতরাং পুঁজিপতি নূতন যে-পণ্য পাইল তাহার পূর্ণ মূল্য হইল ৩,০০০+১,০০০=৪,০০০ শ্রম-ঘণ্টা।

এখন প্রশ্ন উঠে যে ইহার জন্য পুঁজিপতি নিজে কত খরচ করিল? ইহা সুস্পষ্ট যে, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতির দরুন, নিঃশেষিত জ্বালানির দরুন এবং কাঁচা মালের দরুন পুঁজিপতিকে এই সবের পূর্ণ মূল্য অর্থাৎ ৩,০০০ শ্রম-ঘণ্টার মূল্যের তুল্য পরিমাণ মুদ্রা দিতেই হয়। কিন্তু ৩,০০০ শ্রম-ঘণ্টা ছাড়াও যে ১,০০০ শ্রম-ঘণ্টা শ্রমিকরা খাটিয়াছে তাহাও নূতন পণ্যের মূল্যের মধ্যে আছে। পুঁজিপতি কি তাহার শ্রমিকদের ১,০০০ শ্রম-ঘণ্টার তুল্য মূল্যও দিয়া দিয়াছে? পুঁজিবাদী শোষণের সমস্ত রহস্যের সমাধান এইখানেই।

পুঁজিপতি তাহার ২০ জন শ্রমিককে ৫ দিনের জন্য তাহাদের **শ্রমশক্তির** মূল্য দেয়। অর্থাৎ তাহাদের ৫ দিনের শ্রমশক্তি উৎপাদন করিবার পক্ষে যথেষ্ট এমন পরিমাণ বেতন তাহাদের দেয়। সহজেই বুঝা যায় যে এই সংখ্যা ১,০০০ শ্রম-ঘণ্টার মূল্য অপেক্ষা কম। কারখানায় শ্রমিকরা যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয় করে তাহা এক জিনিস: অপর পক্ষে, শ্রমিকদের কাজ করার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহের মূল্য সম্পূর্ণ আলাদা। মার্ক্‌স্ বলেন:

> "...শ্রমশক্তির মূল্য এবং শ্রম-প্রক্রিয়ায় সেই শ্রমশক্তি যে-মূল্য তৈরী করে—এই দুই মূল্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিমাণ।" *

আমাদের উদাহরণে ফিরিয়া আসা যাক। ধরিয়া লওয়া গেল যে প্রত্যেক শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য দাঁড়ায় ৫ শ্রম-ঘণ্টা। তাহা হইলে

* মার্ক্‌স্: 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪।

পুঁজিপতি তাহার শ্রমিকদের বেতন দিবে ৫০০ শ্রম-ঘণ্টার তুল্য-মূল্য পরিমাণ।

এখন যোগ করিয়া দেখা যাক। পুঁজিপতির খরচ দাঁড়ায় ৩০০০ + ৫০০ = ৩৫০০ শ্রম-ঘণ্টা। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, পণ্যের মূল্য হইয়াছিল ৩০০০ + ১০০০ = ৪০০০ শ্রম-ঘণ্টা।

পুঁজিপতির মুনাফা আসে কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তর এখন সহজেই দেওয়া যায়। মুনাফা হইল শ্রমিকের অতিরিক্ত অর্থাৎ **উদ্বৃত্ত শ্রমের** ফল। তাহারা রোজের ৫ ঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের মজুরীর সমপরিমাণ মূল্য উৎপাদন করে এবং অন্যান্য ৫ ঘণ্টা ধরিয়া উৎপন্ন করে **উদ্বৃত্ত মূল্য**, এই মূল্যই পুঁজিপতির পকেটে যায়। শ্রমের মজুরীহীন অংশই হইল উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস, সকল রকমের মুনাফার এবং অনুপার্জ্জিত আয়ের উৎস।

উদ্বৃত্ত শ্রম ও উদ্বৃত্ত মূল্য

"মজুরী-শ্রমিক জমি, কারখানা ও শ্রমযন্ত্রের মালিকদের নিকট নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে। দিনের এক ভাগ শ্রমিক নিজের আর পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয় সঙ্কুলানের (মজুরীর) জন্য ব্যবহার করে, অপর অংশে কোনো রকম মজুরী না পাইয়াই শ্রম করিয়া পুঁজিপতির জন্য **উদ্বৃত্ত মূল্য** সৃষ্টি করে। ইহাই হইল পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফার, সম্পদের উৎস।

"উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বই হইতেছে মার্কসের অর্থনৈতিক মতবাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" *

উদ্বৃত্ত মূল্যের এই মার্ক্সীয় সিদ্ধান্ত পুঁজিবাদী শোষণের রহস্য উদ্ঘাটন

* লেনিন: 'মার্ক্স্-এঙ্গেল্স্-মার্ক্সবাদ', "মার্ক্সবাদের তিনটি উৎস এবং তিনটি অংশ," পৃঃ ৫২-৩।

করিয়াছে। এই কারণে পুঁজিতন্ত্রের ধ্বংসের জন্য, নূতন সাম্যবাদী সমাজ সৃষ্টির জন্য সংগ্রামরত সর্ব্বহারাদের হাতে এই শিক্ষা এক বিশেষ অমূল্য অস্ত্র। এই জন্যই উদ্বৃত্ত মূল্যের মার্ক্সীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং ইহার 'বিজ্ঞ' অনুচরদের এত আক্রোশ। এই জন্যই এই সিদ্ধান্তকে 'মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে' এবং 'বানচাল করিতে' তাহারা নিয়তই সচেষ্ট।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উদ্বৃত্ত মূল্যের মার্ক্সীয় তত্ত্ব মার্ক্সের মূল্য-সম্বন্ধীয় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। মূল্য সম্বন্ধীয় মার্ক্সীয় তত্ত্বকে সর্ব্বপ্রকার বিকৃতির কবল হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন, কারণ **শোষণ-তত্ত্ব** (থিওরি অফ এক্সপ্লয়টেশন) গড়িয়া উঠিয়াছে ইহারই ভিত্তিতে।

এখন আমরা পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধির উৎস সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণের সার সংকলন করিতে পারি। লেনিনের লেখায় আমরা উদ্বৃত্ত মূল্য সম্বন্ধীয় তত্ত্বের যে-সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাই তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় :

"পণ্য-সঞ্চালন হইতে উদ্বৃত্ত মূল্য আসিতে পারে না, কারণ তাহা কেবল তুল্য-মূল্য বস্তুর বিনিময় মাত্র ; দর বৃদ্ধি হইতেও ইহা আসিতে পারে না, কারণ ক্রেতা ও বিক্রেতার লোকসান ও লাভ একে অপরের সমান ; এবং এখানে আমাদের কারবার ব্যক্তি লইয়া নয়, পরন্তু জনসমবায়, সাধারণ সামাজিক সমস্যা লইয়া। উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়ার জন্য 'অর্থলোভীদের···বাজারে এমন একটি পণ্য পাইতেই হইবে, মূল্য সৃষ্টি করিবার মত অসাধারণ গুণ যে-পণ্যের ব্যবহার-মূল্যের আছে',* ইহা এমনই একটি পণ্য যে ইহার ব্যবহারের বাস্তব প্রক্রিয়াই

* মার্ক্স্ : 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫।

যুগপৎ মূল্য উৎপাদনেরও প্রক্রিয়া। এমন একটি পণ্য আছে, তাহা হইতেছে মানুষের শ্রমশক্তি। শ্রমশক্তির প্রয়োগ হইতেছে শ্রম, আবার শ্রমই সৃষ্টি করে মূল্য। অর্থশালীরা মূল্য দিয়া শ্রমশক্তি ক্রয় করে। অন্যান্য সব পণ্যের মূল্যের মতই ইহার মূল্যও ইহার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ভাবে আবশ্যক শ্রম-সময়ের দ্বারা (অর্থাৎ শ্রমিক ও তাহার পরিবারের ভরণ-পোষণের খরচ) নির্দ্ধারিত হয়। শ্রমশক্তি ক্রয় করিয়া অর্থশালীরা ইহাকে ব্যবহার করিতে অধিকারী হয় অর্থাৎ ইহাকে সারা দিনের জন্য, ধরা যাক ১২ ঘণ্টার জন্য, কাজে নিয়োগ করিতে অধিকারী হয়। ইতিমধ্যে ৬ ঘণ্টা সময়ে (প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ে) শ্রমিক তাহার নিজের ভরণ-পোষণের খরচ পরিশোধ করিবার মত যথেষ্ট পণ্য উৎপাদন করে; এবং পরবর্ত্তী ৬ ঘণ্টায় ('উদ্বৃত্ত' শ্রম-সময়) সে 'উদ্বৃত্ত' দ্রব্য বা 'উদ্বৃত্ত' মূল্য উৎপাদন করে। ইহার জন্য পুঁজিপতি তাহাকে কোনো মজুরী দেয় না।" *

পুরাকালে, মানুষ যখন পর্যান্ত বর্ব্বর অবস্থা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই, আদিম মানুষ জীবিকা নির্ব্বাহের একান্ত আবশ্যক দ্রব্যসমূহ সংগ্রহের জন্যই তাহার সকল শক্তি ও উদ্যম ব্যয় করিত। নিজের শ্রমের ফলে সে যাহা পাইত তাহার দ্বারা বর্ব্বর মানুষ কোনো প্রকারে নিজেকে ক্ষুধায় মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিত।

আদিম মানুষ যখন অতি কষ্টে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিত, তখন মানুষে-মানুষে সামাজিক বৈষম্য সম্ভবপর ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, পশু-সমাজেও অনুরূপ বৈষম্য নাই। উদ্বৃত্ত শ্রমের প্রচলনের ফলে

* লেনিন: 'মার্ক্স্-এঙ্গেলস্-মার্ক্সবাদ', "কার্ল মার্ক্স্", পৃঃ ১৭-১৮।

বৈষম্যের উদ্ভবের, মানুষ কর্ত্তৃক মানুষের শোষণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কাহারও কাহারও উদ্বৃত্ত শ্রম অপরের সুবিধা সৃষ্টি করে, অপরের উপকারে লাগে। এই উদ্বৃত্ত শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর করতলগত হয়। এই শ্রেণী নিম্নতর শ্রেণীসমূহকে শোষণ করে।

অনুরূপ পরিস্থিতি পুঁজিবাদী যুগ পর্য্যন্ত, এমন কি পুঁজিবাদী যুগেও, বজায় থাকে। এ-কথা সত্য যে শোষণের রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। দাসতন্ত্রে, সামন্ততন্ত্রে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষণের বিভিন্ন রূপ থাকিলেও মূলত শোষণ একই। শাসকশ্রেণী কর্ত্তৃক সমগ্র সমাজের উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করা হইতেছে সেই শোষণ।

"সমাজের বিভিন্ন আর্থিক রূপের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে, (যেমন দাস-শ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ এবং মজুরী-শ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যে মূল পার্থক্য); যে-পদ্ধতিতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রকৃত উৎপাদকের (অর্থাৎ শ্রমিকের) নিকট হইতে উদ্বৃত্ত শ্রম আদায় করা হয়, সেই পদ্ধতির মধ্যেই এই পার্থক্য নিহিত থাকে।" *

মার্ক্‌স্ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে পুঁজি উদ্বৃত্ত শ্রম সৃষ্টি করে নাই। যেখানেই শোষক ও শোষিতদের লইয়া সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, এমন সর্ব্বক্ষেত্রেই শাসক শ্রেণী কঠোর শ্রমরত বিশাল জনসমবায় এবং শোষিত জনসাধারণের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত শ্রম বলপূর্ব্বক আদায় করিয়া নেয়। যাহা হোক, যে-কোনো পূর্ব্বগামী শ্রেণীসমাজের তুলনায় পুঁজিতন্ত্রের আওতায় উদ্বৃত্ত শ্রম আদায়ের লালসা অদম্য হইয়া উঠে।

দাসত্ব এবং ভূমি-দাসত্বের যুগে স্বাভাবিক উৎপাদনের প্রাধান্য ছিল;

* মার্ক্‌স্: 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০০।

উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করাও ছিল সীমাবদ্ধ। প্রয়োজন বা অভিলাষ পূরণের জন্য যে-পরিমাণ শ্রমের আবশ্যক হইত দাস-মালিক বা সামন্ত ভূঁইয়ারা সেই পরিমাণ শ্রমই শোষিত জনসাধারণের নিকট হইতে জোর করিয়া আদায় করিয়া লইত। পক্ষান্তরে, পুঁজিতন্ত্রের যুগে উদ্বৃত্ত শ্রমের জন্য যে-লালসা তাহার কোনো সীমা নাই। পুঁজিপতি শ্রমিকদের নিকট হইতে যে-উদ্বৃত্ত শ্রম পীড়ন করিয়া আদায় করে তাহাই রূপান্তরিত হয় মুদ্রায়। ইহাকেই নূতন এবং অতিরিক্ত পুঁজি হিসাবে কাজে লাগাইয়া নূতন উদ্বৃত্ত মূল্য উপায় করা যায়। উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতির বিশেষত্ব হইতেছে উদ্বৃত্ত শ্রম আদায়ের এই অদম্য এবং তৃপ্তিহীন লালসা। পুঁজিবাদের আওতায় শ্রমিকদের বর্দ্ধিত হারে শোষণ করিবার প্রবৃত্তি কোনো সীমা মানে না। পুঁজিপতিরা তাহাদের মজুরী-দাসদের বর্দ্ধিত হারে শোষণ করিবার কোনো উপায়কেই উপেক্ষা করে না।

ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই, পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের বিলোপ সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই পুঁজিপতিদের সুবিধার জন্য শ্রমিকদের নিকট হইতে যে-উদ্বৃত্ত শ্রম আদায় করিয়া লওয়া হয় তাহাও বন্ধ হয়। পুঁজির আধিপত্যের আমলে যে-অর্থে কাজের দিনকে প্রয়োজনীয় এবং উদ্বৃত্ত ঘণ্টা হিসাবে ভাগ করা হয় সেই অর্থে সেই ভাগাভাগির পরিসমাপ্তি ঘটে। মার্ক্‌স্‌ বলিয়াছেন ঃ

> "কেবলমাত্র পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি দাবাইয়া রাখিয়াই কর্ম্ম-দিবসের দীর্ঘতা কমাইয়া আবশ্যক শ্রম-সময়ে পরিণত করা যায়। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও আবশ্যক শ্রম-সময় বৃদ্ধি পাইবে। এক দিকে, জীবিকা ও ভরণপোষণের উপকরণ সম্বন্ধীয় ধারণা যথেষ্ট পরিপুষ্টি লাভ করায়

শ্রমিকরা এক সম্পূর্ণ পৃথক জীবনযাত্রার মান দাবী করিবে; অন্যদিকে, এখন যাহা উদ্‌বৃত্ত শ্রম তাহারই এক অংশ তখন আবশ্যক শ্রম বলিয়া পরিগণিত হইবেঃ সংরক্ষণ এবং সঞ্চয়ের জন্য একটি ভাণ্ডার গঠনের উদ্দেশ্যে যে-শ্রম দরকার আমি তাহারই কথা বলিতেছি" * (উৎপাদন এবং জীবন-ধারণের উপকরণের এক সংরক্ষিত ভাণ্ডার; ইহারই সাহায্যে শিল্প-বিস্তার ও আকস্মিক দুর্ঘটনা ইত্যাদির দরুন সম্ভাব্য ক্ষতির পূরণ করা সম্ভব হইবে)। সোভিয়েট ইউনিয়নের (যেখানে শ্রমিকদের শোষণ লোপ পাইয়াছে) সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাস্তব অবস্থা কী তাহা বুঝিবার পক্ষে মার্কসের এই কথাগুলি সাহায্য করে।

শ্রেণী-শোষণের মূল সমাজের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম উৎপাটিত হইয়াছে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহেই। পুঁজি-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় দুইটি বিরোধী শ্রেণীর অস্তিত্ব, সোভিয়েট প্রতিষ্ঠানসমূহে তাহা নাই। প্রতিষ্ঠানগুলি সোভিয়েট রাষ্ট্রের, সর্ব্বহারার একনায়কত্বের সম্পত্তি। যে-শ্রেণী কলকারখানার মালিক, এবং যে-শ্রেণী এই সব প্রতিষ্ঠানে শ্রম করে, তাহারা উভয়েই এক এবং অভিন্ন শ্রেণী। সোভিয়েট ব্যবস্থায় শ্রমিক এক বিরোধী ও বিপক্ষ শ্রেণীর প্রতিনিধির নিকট নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় কোনো উদ্‌বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন হয় না এবং হইতে পারে না। শ্রমিকের শ্রম তাহার উপার্জ্জনের উপরে যে-বাড়তি উৎপন্ন করে তাহা সেই একই শ্রমিক শ্রেণীর এবং ইহারই একনায়কত্বের সমষ্টিগত প্রয়োজন (যেমন, দেশের

* মার্কস্: 'ক্যাপিট্যাল,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৩৯-৪০।

সাধারণ প্রয়োজন, সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়, দেশরক্ষার প্রয়োজন ইত্যাদি) পরিপূরণ করে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের শিল্পসমূহ প্রধানত রাষ্ট্রীয়-পুঁজিতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নয়—ট্রট্স্কিপন্থীদের এই উদ্ভাবন তাই বিপ্লববিরোধী বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সাংগঠনিক কর্ম্মকাণ্ড ধ্বংস করিবার দেশদ্রোহী প্রচেষ্টা এই সমস্ত অপবাদের দ্বারা ট্রট্স্কিবাদ প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করে।

পুঁজি কী?

উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন আমরা বিশ্লেষণ করিয়াছি। পুঁজিপতি কর্ত্তৃক শ্রমিকদের মজুরীহীন শ্রম আত্মসাৎ করিবার গতি-বিজ্ঞানও আমরা আলোচনা করিয়াছি। ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে সর্ব্বহারাদের শ্রমই পুঁজিপতিদের অনুপার্জ্জিত সম্পদের একমাত্র উৎস। যে-অদৃশ্য শক্তি মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির খেয়ালের নিকট কোটি কোটি জনসাধারণকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে, তাহাকেই এবার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাক। পুঁজির শক্তি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আমরা আলোচনা করিব—পুঁজি কী তাহার বিশ্লেষণ করিব।

পুঁজিবাদের আওতায় সকল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয় বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে, এবং কেবল এই জন্যই পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ সম্ভবপর হয়। উৎপাদনের উপকরণ এবং জীবন ধারণের উপাদানের মালিক হইতেছে পুঁজিপতিরা। এই দুইটির একটিও শ্রমিকের নয়। সমাজের সমস্ত সম্পদ একচেটিয়া (অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে একক দখল) করিয়াছে এই বুর্জোয়ারা।

"উৎপাদনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক উপকরণসমূহের উপর পুঁজিপতি শ্রেণীর এবং বড় বড় জমিদারের একচেটিয়া

মালিকানা ; উৎপাদনের উপকরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বহারাদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হওয়া, তাহাদের মজুরী-শ্রমকে শোষণ করা ; মুনাফার জন্য পণ্য-উৎপাদন এবং এই সকলের সহিত সংযুক্ত সমগ্র উৎপাদন-প্রথার পরিকল্পনাহীন বিশৃঙ্খল প্রকৃতি ;—পণ্য-উৎপাদনের ভিত্তিতে যে-পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব হইয়াছে সেই সমাজের বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে এই গুলি।" *

কমিউনিস্ট আন্তর্জ্জাতিকের প্রোগ্রামে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এইরূপ প্রকৃতিই বর্ণনা করা হইয়াছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্ব্বহারা শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণ হইতে বঞ্চিত হয়। **উৎপাদনের উপকরণ** বলিতে আমরা মানুষের কাজ করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারই বুঝি। সহজেই বুঝা যায় যে, উৎপাদনের উপকরণ কতিপয় প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রথমত, **শ্রমের যন্ত্র**—মুচির অত্যন্ত সহজ আরা (বেধন-যন্ত্র বা awl) হইতে শুরু করিয়া আধুনিক কলকারখানার জটিল সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত। আর আছে **কাঁচা মাল**। এই কাঁচা মাল ব্যবহার করিতেই হইবে। জুতার জন্য কাঁচা মাল হইল চামড়া ; লৌহ গলাইয়া পরিষ্কার করিবার জন্য কাঁচা মাল হইল লোহার 'ওর' (খনি হইতে নানা ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত যে-লোহা তোলা হয়) : বয়নের জন্য কাঁচা মাল হইল তুলা। আর সর্ব্বশেষে চাই তেল, বালি, চূন প্রভৃতি কতকগুলি আনুষঙ্গিক মালমসলা।

কাজের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণের এই বিভিন্ন উপাদানের ভাগ্য এক নয়। শ্রমের যন্ত্র দীর্ঘকাল টিকে। কাপড়ের কলে একই

* 'কমিউনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিকের প্রোগ্রাম,' পৃঃ ১৩, মডার্ণ বুকস্ লিঃ লণ্ডন, ১৯৩২

তাঁতে বহু কাপড় প্রস্তুত হয়। ব্যবহৃত জিনিসগুলির পরিণতি সম্পূর্ণ পৃথক। উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় কাঁচা মাল অদৃশ্য হইয়া এক নূতন উৎপন্ন দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়। মুচির হাতে চামড়া পরিণত হয় জুতায়, দর্জির হাতে কাপড় পরিণত হয় পোশাকে, ধাতু পরিষ্কারের কারখানায় লোহার 'ওর' রূপান্তরিত হয় বিশুদ্ধ লোহায়; আনুষঙ্গিক জিনিসগুলি উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্যে পুরাপুরি ব্যবহৃত হইয়া যায়ঃ কারখানায় বয়লার গরম করিতে অদৃশ্য হয় জ্বালানী, যন্ত্রের মধ্যে অন্তর্হিত হয় তেল।

উৎপাদনের যে-উপকরণ ব্যতিরেকে কোনো কাজই করা সম্ভব নয়, পুঁজিবাদের আওতায় সে সমস্তই বুর্জোয়া শ্রেণীর করতলগত। ইহারই ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজের উপরে প্রভূত কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে উৎপাদনের উপকরণগুলি পরিণত হইয়াছে শোষণের উপকরণে; কারণ, এই উপকরণগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত, আর জনসংখ্যার বিপুল অংশ ইহা হইতে বঞ্চিত, এবং তাহারই ফলে নিজেদের শ্রম-শক্তি বিক্রয় করিতে তাহারা বাধ্য হয়।

মার্ক্স বলিয়াছেন—পুঁজি কোনো অচেতন পদার্থ নয়, পুঁজি বিশিষ্ট একটি **সামাজিক সম্বন্ধ**। বুর্জোয়া শ্রেণীর হস্তগত জিনিসগুলি (উৎপাদনের উপকরণ এবং অন্যান্য সকল প্রকার পণ্য) স্বতই পুঁজি নয়। কেবলমাত্র এক বিশেষ সমাজব্যবস্থা এই সমস্ত পদার্থকে শোষণের উপকরণে পরিণত করে, যে-সামাজিক সম্বন্ধকে আমরা পুঁজি বলি ইহাদিগকে তাহারই বাহনে পরিবর্তিত করে। **"পুঁজি হইতেছে ইতিহাস কর্তৃক নির্দিষ্ট এক বিশেষ সামাজিক উৎপাদন-সম্বন্ধ"** (লেনিন)। উৎপাদনের উপকরণের যাহারা মালিক সেই শ্রেণী, এবং

উৎপাদনের উপকরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাহারা শোষণ বরদাশ্ত্ করিতে বাধ্য হয় সেই শ্রেণী—পুঁজি হইতেছে এই দুই শ্রেণীর মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক।

পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপকরণসমূহের বেচাকেনা হয় বলিয়াই তাহারা পণ্য। আর পণ্য হিসাবে তাহাদের মূল্যও আছে এবং মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত (অর্থাৎ বিক্রীত) হইতেও পারে। অপর পক্ষে মুদ্রার বিনিময়ে লোকে উৎপাদনের উপকরণ পাইতে (অর্থাৎ ক্রয় করিতে) পারে। অতএব অন্য কথায় বলিতে গেলে, পুঁজি হইতেছে সেই মূল্য যাহ মজুরী-শ্রমকে শোষণ করিয়া **উদ্বৃত্ত মূল্য** আনিতে সক্ষম। কিন্তু মূল্য রূপায়িত (অর্থাৎ দানা বাঁধা) শ্রম ব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রমের পরিণতিই হইল মূল্য। মূল্য ব্যয়িত, নিঃশেষিত শ্রম। এই জন্যই মার্ক্স্ বলেন ঃ—

> "পুঁজি হইল নিঃশেষিত শ্রম ; রক্তশোষক বাদুড়ের ন্যায় ইহা কেবল প্রাণবন্ত শ্রমকে শোষণ করিয়াই বাচিয়া থাকে...।"*

পুঁজিবাদী শোষণ সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে হইলে পুঁজিকে স্থির পুঁজি এবং পরিবর্ত্তনশীল পুঁজিতে ভাগ করা দরকার। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে পণ্যের পূর্ণ মূল্যের মধ্যে আছে কাঁচা মাল এবং ব্যবহৃত জ্বালানির মূল্য, এবং যন্ত্রপাতির মূল্যের এক অংশ ইত্যাদি। মূল্যের পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হয় না ঃ পুঁজির যে-অংশ ব্যয় হয় সেই অংশের আদিতে যে-মূল্য ছিল ততখানি মূল্যই নূতন পণ্যে বর্ত্তে। এই জন্যই আমরা পুঁজির এই অংশকে অর্থাৎ কারখানার ইমারত, যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল এবং জ্বালানিকে **স্থির পুঁজি** বলি।

স্থির এবং পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি

* মার্ক্স্ ঃ 'ক্যাপিটাল,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬।

উপরন্তু ইহাও আমরা জানি যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অর্থাৎ কারখানায় শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন মূল্য নূতন পণ্যের মূল্যের অন্তর্গত হয়। ধরা যাক, কোনো প্রতিষ্ঠানে ১০০ শ্রমিক প্রত্যেকে রোজ ১০ ঘণ্টা করিয়া কাজ করে। এক ঘণ্টা শ্রমের মূল্য যদি এক আনা হয়, তাহা হইলে প্রতিদিন তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন সমস্ত নূতন মূল্যের পরিমাণ হইল হাজার আনা অর্থাৎ ৬২৸০।

আমরা বিশেষ করিয়াই জানি যে, শ্রমিকরা তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন নূতন মূল্য অপেক্ষা কম পরিমাণ মজুরী পায়। নূতন উৎপন্ন মূল্যের যে-অংশ শ্রমিকের ভরণ-পোষণের জন্য আবশ্যক শ্রম রূপে গণ্য হয়, মজুরীর পরিমাণ কেবলমাত্র সেই অংশেরই সমান। আর অতিরিক্ত শ্রম যে-উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে তাহা পুঁজিপতির কুক্ষিগত হয়।

যদি আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ হয় দৈনিক ৫ ঘণ্টা, তাহা হইলে পুঁজিপতি একজন শ্রমিককে দৈনিক মজুরী দেয় পাঁচ আনা (অর্থাৎ দশ আনার অর্দ্ধেক) অথবা ১০০ শ্রমিককে দেয় একত্রিশ টাকা চার আনা (অর্থাৎ টাকা ৬২৸০ আনার অর্দ্ধেক)। পুঁজিপতি পুঁজির যে-অংশ শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করিল তাহার পরিমাণ হইল ৩১৷০ আনা, কিন্তু সেই শ্রমশক্তি যে-মূল্য তৈয়ার করিল তাহার পরিমাণ হইল ৬২৸০ আনা। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে পুঁজির এক অংশ উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া দ্বিগুণ হইয়াছে,—অবশ্য আপনা আপনি হয় নাই, হইয়াছে শ্রমিকের মজুরীহীন উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করিয়া। তাই, শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য (অর্থাৎ শ্রমিকদের মজুরী দেওয়ার জন্য) ব্যবহৃত পুঁজির অংশকে আমরা বলি **পরিবর্ত্তনশীল** পুঁজি।

পুঁজিপতিদের দৃষ্টিতে পুঁজির মধ্যে আর এক প্রকারের পার্থক্য আছে। পুঁজির যে-অংশ তাড়াতাড়ি আবর্ত্তিত হয় তাহার প্রতি পুঁজিপতির

বিশেষ দৃষ্টি থাকে এবং যে-অংশ ধীরে ধীরে আবর্ত্তিত হয় তাহা হইতে এই অংশকে সে পৃথক করিয়া দেখে। কারখানার ইমারত, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দীর্ঘকাল টিঁকে বলিয়া এই সমস্তকে বলা হয় **স্থায়ী** (fixed) **পুঁজি**। অপর পক্ষে, পুঁজির যে-অংশ শীঘ্র শীঘ্র আবর্ত্তিত হয় তাহাকে বলে **চল্‌তি** (circulating) **পুঁজি**। কাঁচা মাল, জ্বালানি এবং শ্রমিকের মজুরীর জন্য যে-পুঁজি ব্যয় হয় তাহা চল্‌তি পুঁজির অন্তর্ভুক্ত।

উৎপাদনের প্রক্রিয়াতে এবং পরিণামে সঞ্চালনের প্রক্রিয়াতেও পুঁজির এই অংশ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। তাহাদের স্থায়িত্বের সময় বিভিন্ন। ধরা যাক, কারখানার ইমারত ৫০ বৎসর টিকিয়া থাকে; ফলে, এই ইমারতের মূল্যের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্যের সহিত মিশিয়া যায়। এই ইমারতের জন্য পুঁজিপতি যে-পরিমাণ মূল্য ব্যয় করিয়াছে কেবল মাত্র ৫০ বৎসরের মধ্যেই সে-মূল্য তাহার নিকট ফিরিয়া আসে। অনুমান করা যাক যে, একটি যন্ত্র ১৫ বৎসর কাজ করিবে। তাহা হইলে ইহার মূল্য উৎপন্ন পণ্যের দামের মধ্য দিয়া ১৫ বৎসরে পুঁজিপতির নিকট ফিরিয়া আসিবে। এই ১৫ বৎসরের প্রত্যেকটি বৎসরে পুঁজিপতি তাহার পণ্য বিক্রয়ের ভিতর দিয়া যন্ত্রটির মূল্যের ১৫ ভাগের এক ভাগ করিয়া পায়। অপর পক্ষে কাঁচা মাল এবং জ্বালানি উৎপাদনে পুরাপুরি ব্যয় হইয়া যায়। যদি কোনো শিল্পপতি হাজার গাঁইট তুলা ব্যবহারোপযোগী পণ্যে রূপান্তরিত করিয়া বিক্রয় করে, তাহা হইলে কাঁচামাল সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ সর্ব্বাংশে তৎক্ষণাৎ তাহার করতলগত হয়। শ্রমশক্তি সম্বন্ধেও এই একই কথা সত্য।

স্থির এবং পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি রূপে পুঁজির বিভাগ ইহার স্থায়ী এবং চল্‌তি পুঁজি রূপে বিভাগের সহিত মিলে না।

কাঁচামাল, জ্বালানি ও আনুষঙ্গিক জিনিসের জন্য চল্‌তি পুঁজির যে-অংশ ব্যয় হয় সেই অংশ এবং স্থায়ী পুঁজি স্থির পুঁজির অন্তর্গত। সাধারণত, উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় যে-শ্রম ব্যয় হয় স্থির পুঁজি দ্বারা সেই শ্রম ক্রয় করা হয় (অন্য কথায় যাহাকে বলা হয় নিঃশেষিত শ্রম)। পক্ষান্তরে, পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি ব্যবহৃত হয় কেবল মাত্র শ্রমিকের মজুরীর জন্য।

পুঁজি-বিভাগের এই দুই পদ্ধতি নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ করা যায়—

আবর্ত্তনের গতি অনুযায়ী বিভাগ	পুঁজির অংশ	শোষণ-প্রক্রিয়াতে ভূমিকা অনুযায়ী বিভাগ
স্থায়ী পুঁজি	কারখানা ইমারত যন্ত্রপাতি	স্থির পুঁজি
চল্‌তি পুঁজি	কাঁচামাল, জ্বালানী আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র	
	মজুরী	পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি

পুঁজি-বিভাগের এই দুই পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্থির এবং পরিবর্ত্তনশীল রূপে পুঁজির বিভাগ হইতে এক নিমেষেই লক্ষ্য করা যায়, উদ্‌বৃত্ত মূল্যের প্রকৃত এবং একমাত্র উৎস কী। স্থায়ী এবং চল্‌তি পুঁজিতে পুঁজির বিভাগ উদ্‌বৃত্ত মূল্যের প্রকৃত স্রষ্টা অর্থাৎ শ্রমকে অপরাপর উপাদানের সহিত মিশাইয়া ফেলে। এই সমস্ত উপাদান কোনো নূতন মূল্যই সৃষ্টি করে না। এইরূপে পুঁজিবাদী প্রথার প্রচলিত রীতিতে পুঁজি-বিভাগের যে-পদ্ধতি তাহা পুঁজিবাদী শোষণের সারমর্ম প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

উদ্‌বৃত্ত মূল্যের হার

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে দেখা গিয়াছে যে শ্রমিকরা দৈনিক ৬২৷৷০ আনার নূতন মূল্য উৎপাদন করিয়া মজুরী স্বরূপ পায় মাত্র ৩১।০ আনা। ইহা প্রত্যক্ষ যে অপর ৩১।০ আনা উদ্‌বৃত্ত মূল্য রূপে পুঁজি আত্মসাৎ করিয়া ফেলে।

শ্রমিকের শ্রমের কোন অংশ পুঁজিপতির কুক্ষিগত হয় তাহা জানাও একান্ত প্রয়োজন। পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের পরিমাণ নির্দ্দেশ করে এমন একটি নির্দিষ্ট মান ইহা হইতেই পাওয়া যাইবে।

এই মান হইতেছে **উদ্বৃত্ত মূল্যের হার**। উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বলিতে আমরা বুঝি পরিবর্ত্তনশীল পুঁজির সহিত উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাত। অন্য কথায় বলা যায়, প্রয়োজনীয় শ্রমের সহিত মজুরী-শ্রমের অনুপাত। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হইবে নিম্নলিখিত রূপ :—

$$\frac{\text{৩১৷০ আনা উদ্বৃত্ত মূল্য}}{\text{৩১৷০ আনা পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি}} = \text{শতকরা ১০০}$$

উদ্বৃত্ত মূল্যের হার যদি শতকরা ১০০ হয়, তাহা হইলে শ্রমিকের শ্রম আবশ্যক এবং উদ্বৃত্ত শ্রমে সমান ভাবে বিভক্ত হয় ; উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ হয় পরিবর্ত্তনশীল পুঁজির সমান ; শ্রমিককে দেওয়া হয় মাত্র তাহার অর্দ্ধেক শ্রমের মজুরী এবং বাকী অর্দ্ধেক উদরস্থ হয় পুঁজিপতির।

স্পষ্টই বুঝা যায় যে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য পাইবার জন্য প্রত্যেক পুঁজিপতিই সচেষ্ট। কেমন করিয়া এই উদ্দেশ্য সে সাধন করে ? সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ

উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়াইবার দুইটি পদ্ধতি

করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা। যখন ১০০ শ্রমিক ৩১৷০ আনার সমান উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে, তখন ২০০ শ্রমিক পুঁজিপতিকে মুনাফা দেয় ৬২৷৷০ আনা। কিন্তু উৎপাদন দ্বিগুণ করিতে অতিরিক্ত পুঁজি প্রয়োজন। পুঁজিপতির যদি এই অর্থ বা প্রয়োজনীয় উপকরণাদি থাকে তবে স্বভাবতই সে তাহা করিবে, ইহা তো সোজা কথা।

কিন্তু প্রশ্ন হইল—নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়াও কি ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়ানো যায়। এ বিষয়ে পুঁজিপতির দুইটি উপায় সম্বল।

আমরা জানি যে শ্রমের রোজ গঠিত হয় দুইটি অংশ লইয়া—মজুরী-প্রাপ্ত আবশ্যক শ্রম আর মজুরী-বিহীন উদ্বৃত্ত শ্রম। অনুমান করা গেল যে, একটি শ্রমের রোজ ১২ ঘণ্টা। এই ১২ ঘণ্টার মধ্যে ৬ ঘণ্টার জন্য শ্রমিক মজুরী পায়, এবং অন্য ৬ ঘণ্টা তাহার উদ্বৃত্ত শ্রম। ১২ অংশে বিভক্ত একটি রেখাকে শ্রমের রোজ হিসাবে ধরা যাক। এই রেখার প্রত্যেকটি অংশ এক একটি ঘণ্টার সমান, যথা—

১২ ঘণ্টা (রোজ)

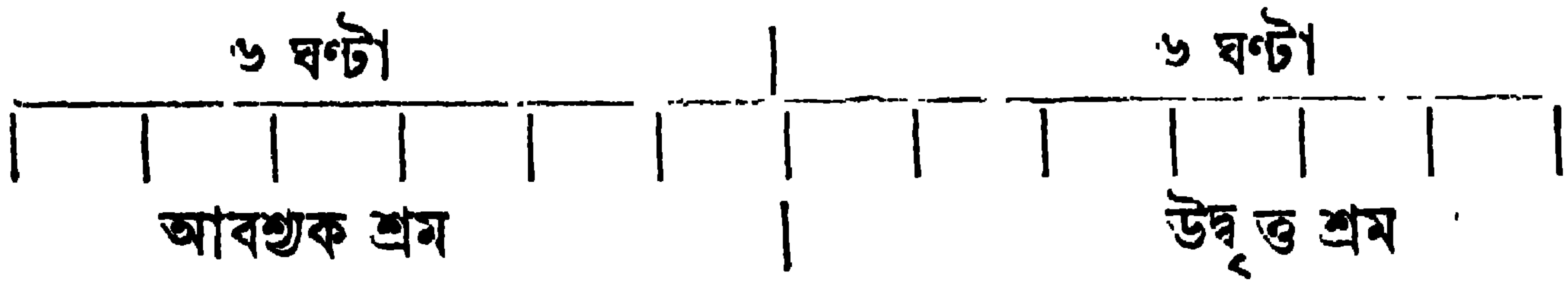

এইরূপ অবস্থায় **শ্রমের রোজের সময় বাড়াইয়া** পুঁজিপতি তাহার পাওনা উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। আবশ্যক শ্রম অপরিবর্ত্তিত থাকায় উদ্বৃত্ত শ্রমের অংশ বৃদ্ধি পাইবে। মনে করা যাক, শ্রমের রোজ দীর্ঘ করিয়া ১৪ ঘণ্টা করা হইল। ইহাতে আমরা নিম্নলিখিত রূপ হিসাব পাই—

১৪ ঘণ্টা (রোজ)

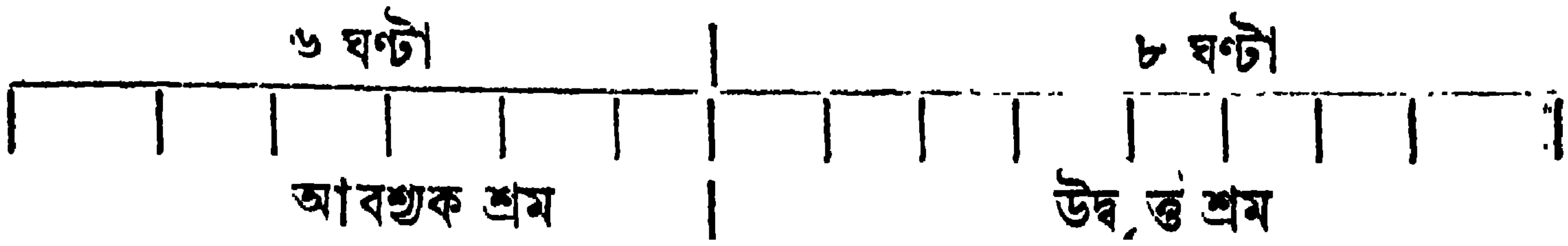

এই ক্ষেত্রে আমরা পাই নির্ব্বিশেষ উদ্বৃত্ত মূল্যের বৃদ্ধি: গোটা শ্রমের রোজ নির্ব্বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইবার ফলে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধির আরও একটি উপায় আছে। আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ পুঁজিপতি যদি কোনো রকমে কমাইতে পারে, তাহা হইলে শ্রমের রোজের আকৃতি কিরূপ দাঁড়ায়? ইহার উত্তর দেওয়া সোজা। ধরা যাক, আবশ্যক শ্রম কমাইয়া ৪ ঘণ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রমের রোজ এইরূপ দেখায়:

১২ ঘণ্টা (রোজ)

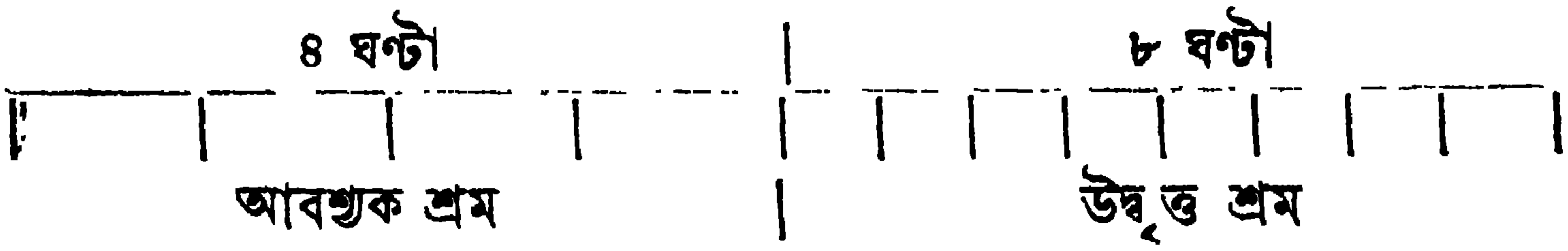

এইবারে আমরা পাই **আপেক্ষিক** উদ্বৃত্ত মূল্যের বৃদ্ধি। কেবল মাত্র উদ্বৃত্ত শ্রমের সহিত আবশ্যক শ্রমের অনুপাত পরিবর্ত্তনের ফলেই উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু গোটা শ্রমের রোজ থাকে অপরিবর্ত্তিত। পূর্ব্বে এই অনুপাত ছিল ৬/৬, আবশ্যক শ্রম-সময় হ্রাসের ফলে অনুপাত তখন দাঁড়াইল ৪/৮। কিন্তু আবশ্যক শ্রম-সময়ে এই হ্রাস কি প্রকারে সম্পাদিত হয়?

শিল্প-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকের জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন করিতে অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রম লাগে। এই সমস্ত উপকরণের মূল্য হ্রাস পায়। আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ হ্রাস করা হয় ও উদ্বৃত্ত মূল্যের আপেক্ষিক পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, এবং এই ভাবে শ্রমশক্তির মূল্য হ্রাস পায়।

আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ কমাইবার জন্য পুঁজিপতি শ্রমিকদের স্ত্রী এবং সন্তানদের কাজে নিয়োগ করে। পূর্ব্বে পরিবারের অভিভাবক একা যাহা পাইত এখন সমগ্র পরিবার মজুরী হিসাবে প্রায় তাহাই পায়। শিল্প-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে শ্রমিকদের কাজ শুধু যন্ত্রপাতির উপর নজর রাখা এবং অত্যন্ত সহজ কারিকুরিতে পর্য্যবসিত হয়; ফলে যুবক পুরুষ শ্রমিকদের স্থান শিশু এবং নারীদের শ্রমই পূরণ করিতে পারে। এই জাতীয় শ্রম সস্তা হওয়ায় পুঁজিপতিরা বেশি পছন্দ করে। একজন পুরুষের স্থানে যে নারী শ্রমিক কাজ করে সে পুরুষ শ্রমিকের মাত্র অর্দ্ধেক মজুরী পায়, শিশুদের মজুরী আরও কম।

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যবৃদ্ধির নিম্নলিখিত পদ্ধতিটি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। মুনাফা বাড়াইবার জন্য সর্ব্বপ্রকারের প্রচেষ্টা প্রত্যেক পুঁজিপতিই করে। এই উদ্দেশ্যেই সে এমন সর্ব্ববিধ উন্নত পদ্ধতিই প্রবর্ত্তন করে যাহাতে উৎপাদনের ব্যয় কম হয়। পুঁজিপতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এই

অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য

শিল্প সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক নূতন পদ্ধতি যত দিন পর্য্যন্ত একই জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সে অতি-মুনাফা, অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য পায়। পণ্যের পড়তা হয় কম, অথচ সেইগুলিকে সে বিক্রয় করে পূর্ব্বের সমান দামে অথবা তাহা অপেক্ষা কিছু কমে।

বিশেষ কোনো একটি প্রতিষ্ঠান এই প্রকার সুযোগ-সুবিধা সাধারণত খুব কম সময়ের জন্যই ভোগ করিতে পারে। অপরাপর প্রতিষ্ঠানও এইরূপ উন্নত পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করে। পণ্যের উৎপাদনে যে-শ্রম ব্যয় হয়, পণ্যের মধ্যে সেই শ্রম নিহিত আছে বলা যায়। সামাজিক ভাবে আবশ্যক গড়পড়তা যে-শ্রম পণ্যের মধ্যে এই ভাবে

নিহিত থাকে, সেই শ্রমের দ্বারাই পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। এই কারণে সাধারণ ভাবে কাজের উন্নত পদ্ধতির প্রবর্ত্তনের ফলে পণ্যের মূল্য হ্রাস পায় এবং ফলে প্রতিষ্ঠান বিশেষ ইহার বিশেষ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়।

পুঁজিবাদের আওতায় শিল্প-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রধান চালক শক্তি হইল অতি-মুনাফা লাভের সম্ভাবনা। অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্যের জন্য প্রতিযোগিতার ফলে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধি পায়; কারণ, ইহার ফলে শ্রমিকের জীবন ধারণের উপকরণসমূহ উৎপাদনের জন্য যে-শ্রম আবশ্যক তাহার পরিমাণ হ্রাস পায়। অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যেরই রূপান্তর মাত্র।

ইহা সুস্পষ্ট যে পুঁজিপতির পক্ষে মুনাফা বাড়াইবার সহজতম উপায় হইল নির্ব্বিশেষ উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধি করা। ইহার জন্য শিল্প সংক্রান্ত কোনো নূতন উন্নতির প্রয়োজন করে না। একমাত্র প্রয়োজন কাজের রোজের সময় বাড়ানো। বস্তুত, পুঁজিপতিরা কাজের রোজকে সব সময়েই চরম ভাবে বাড়াইতে চেষ্টা করে। পারিলে শ্রমিককে তাহারা ২৪ ঘণ্টারও বেশী খাটাইত। কাজের রোজ দীর্ঘ করার পক্ষে অবশ্য একটি স্বাভাবিক দৈহিক অন্তরায় আছে। উপরন্তু, এইরূপ করিলে ক্রমশ অধিক পরিমাণে শ্রমিকদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। এই কারণেই নির্ব্বিশেষ উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টাতেই পুঁজিপতিরা সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধির জন্যও প্রয়াস পায়। ইহারই মধ্যে তাহারা দেখিতে পায় অপরিমিত সম্ভাবনা।

পুঁজিবাদী যুগের প্রারম্ভে সকল দেশেই কাজের রোজ ছিল নিরতিশয় দীর্ঘ। শিল্প-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি তখনও ছিল সামান্য;

এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই যে, শ্রমিকরা ছিল তখন বিক্ষিপ্ত, এবং সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কাজেই নির্ব্বিশেষ উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের প্রাধান্য ছিল তখন সর্ব্বত্র।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজের রোজ ছিল প্রায় পূর্ণ ২৪ ঘণ্টা। ঘুমের জন্য কেবলমাত্র সামান্য কয়েক ঘণ্টা অবসর শ্রমিক পাইত। আর বাকী সময় ছিল পুঁজিপতির অধিকারে। শ্রমিকের জীবনে এই রকম নৃশংস শোষণের পরিণাম যে কী তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়।

এখনও অনেক দেশে কাজের রোজ দীর্ঘ। উদাহরণ স্বরূপ চীনের কথাই ধরা যাক। সেখানকার অনেক কারখানায় কাজের রোজ ১৬ হইতে ১৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দীর্ঘ। এমন কি, মাটির নিচে কয়লার খনিতে কাজের রোজও এই রকমের অতিরিক্ত ভাবে দীর্ঘ। কেবল মাত্র পুরুষদের বেলাতেই যে কাজের রোজ এই রকম দীর্ঘ তাহা নয়, নারী ও শিশু শ্রমিকদের বেলাতেও ইহার ব্যতিক্রম নাই।

মার্ক্স্ বলেন—পুঁজিবাদী সমাজে জনগণের সমগ্র জীবনকে শ্রম-সময়ে পরিণত করিয়া একটি শ্রেণী তাহার স্বচ্ছন্দ অবসর যাপনের সুবিধা করিয়া নেয়।

সর্ব্বহারা শ্রেণী তাহার অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিবা মাত্রই তাহার প্রাথমিক দাবীগুলির অন্যতম হিসাবে **কাজের রোজ সীমাবদ্ধ করিবার** দাবী উপস্থাপিত করে। বিগত শতাব্দীর পঞ্চম দশকে অপেক্ষাকৃত পুরাতন পুঁজিবাদী দেশগুলিতে (ইংলণ্ডে ও তারপরে ফ্রান্সে) শিশুদের শ্রম এবং কাজের রোজ সীমাবদ্ধ করার আইন বিধিবদ্ধ হয়। সর্ব্বত্রই শ্রমিক শ্রেণীর তীব্র সংগ্রামের পরেই কেবল শ্রমিক-আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বুর্জোয়া গভর্নমেণ্ট সমগ্র ভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। এক দিকে কেবল শ্রমিক-আন্দোলনের চাপে এবং অন্য দিকে

শ্রমিক ব্যতীত পুঁজিপতিদের কোনো মুনাফা হয় না বলিয়াই শ্রমিকদের জীবন বাঁচাইয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়াই তাহারা এই প্রকার আইন প্রণয়নে সম্মতি দেয়।

মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) আগের যুগে খুব উন্নত দেশগুলির অধিকাংশে ১০ঘণ্টা কাজের রোজ প্রচলিত ছিল। কেবল মাটির নিচে কাজের (কয়লা এবং ধাতুর খনিতে) কয়েকটি ক্ষেত্রে দৈনিক কাজের সময় ছিল অপেক্ষাকৃত কম। শিশু এবং স্ত্রীলোকের শ্রমের (রাত্রিতে কাজ করার নিষেধ) উপর কিছু কিছু বাধানিষেধও ছিল।

মহাযুদ্ধের পরে শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ যখন পুঁজিতন্ত্রের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করিয়া তুলিল, তখন বহু দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য হইল। সারা দুনিয়ায় ৮ ঘণ্টা কাজের রোজ প্রবর্ত্তনের জন্য এক বিশেষ প্রস্তাবের খসড়া পর্য্যন্ত তৈরী হইয়াছিল ১৯১৯ সালে ওয়াশিংটনে। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে পুঁজির তরফ হইতে আক্রমণ শুরু হইবার পর অধিকাংশ সুবিধাই প্রত্যাহৃত হয়। সর্ব্বত্রই ৮ ঘণ্টা কাজের রোজের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের হামলা চলার দরুন অধিকাংশ দেশেই ৮ ঘণ্টা কাজের রোজের অস্তিত্ব লোপ পায়।

শ্রমিকদের নিকট হইতে অধিকতর উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করার এক অতি উপযোগী উপায় হইল শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি করা। একই সময়ের

শ্রমের তীব্রতা

মধ্যে শ্রমিক অধিকতর শ্রম নিয়োগ করিতে, অধিকতর উদ্যম ব্যয় করিতে বাধ্য হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করা যায়। সেই ক্ষেত্রে সে অধিক পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করিবে; ফলে পুঁজিপতির আত্মসাৎ হইবার উদ্বৃত্ত মূল্যই বৃদ্ধি পাইবে।

যন্ত্রপাতির গতিবেগ বৃদ্ধি করিয়া শ্রমের তীব্রতা অধিকাংশ সময়ে বাড়াইয়া দেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির সহিত তাল রাখিবার জন্য শ্রমিককে চেষ্টা করিতেই হইবে। এই তাল রাখিতে অপারগ হইলে তাহাকে তাহার কাজ খোয়াইতে হইবে। অপরাপর ক্ষেত্রেও মজুরীর বিশেষ পদ্ধতির সহায়তায় পুঁজিপতিরা ক্রমেই অধিকতর তীব্র ভাবে শ্রমিকদের কাজ করাইতে চেষ্টা করে।

অত্যন্ত দীর্ঘ কাজের রোজের মতই শ্রমের অতিরিক্ত তীব্রতাও শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও জীবনের পক্ষে সমান ক্ষতিকর। কাজের রোজ আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িলে পুঁজিপতিরা শ্রমের তীব্রতা অপরিমিত রূপে বৃদ্ধি করিয়াই তাহাদের 'পথ করিয়া' নেয়। অধিকাংশ পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানেই শ্রমের তীব্রতা এত বেশী যে শ্রমিকরা অকালে শ্রমের ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে, অচিরেই হইয়া পড়ে জরাজীর্ণ এবং নানাবিধ রোগে কবলিত। পুঁজিপতির পক্ষে শ্রমের তীব্রতা সাধন হইতেছে শ্রমিকের উপর শোষণ ও তাহার গোলামীর মাত্রা বৃদ্ধি করিবার এক অমোঘ উপায়।

পুঁজিতন্ত্র এবং শিল্পসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি

বর্ত্তমান সময়ে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এক ভয়ানক এবং দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটের কবলে পড়িয়া শিল্পসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতির শত্রু রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। যন্ত্রপাতিকে সর্ব্ববিধ অনর্থের কারণ হিসাবে বর্ণনা করিতে পুঁজিপতিরা এবং তাহাদের পণ্ডিত অনুচরেরা প্রায়ই চেষ্টা করে। তাহারা প্রচার করে—অত্যধিক কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, অধিক সংখ্যক যন্ত্রদানব, লৌহদানব সৎলোকদের কাজ কাড়িয়া নেয়; এই সব যন্ত্রপাতির দ্বারা অতিরিক্ত পণ্যসম্ভার উৎপাদিত হইয়া পরে বাজারে কাটতি হয় না। কিন্তু শ্রমিকরা জানে যন্ত্রপাতিই বেকারী, সঙ্কট প্রভৃতি

সৃষ্টি করে না। এই সমস্ত অনিষ্টের কারণ হইতেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং ইহার দৃঢ়মূল বিরোধ। যন্ত্রপাতি শ্রমিকের অন্নবস্ত্র কাড়িয়া নেয় না, বরং শোষণের উপায় হিসাবে যন্ত্রপাতির পুঁজিবাদী প্রয়োগের ফলেই শ্রমিক তাহার অন্নবস্ত্র হইতে বঞ্চিত হয়।

বর্ত্তমান সঙ্কটের অবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণী যান্ত্রিক উৎপাদন হইতে হস্তশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে। উন্নতির পরিপন্থী এইরূপ পাগলের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা তাহাদের পক্ষে অসাধারণ কিছু নয়। আমেরিকায় বহু বাষ্পচালিত কোদাল ও মাটি-কাটা যন্ত্র বিনা কাজে পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার শ্রমিককে সরকারী কাজে গাঁইতি এবং কোদালের সাহায্যে মেহনত করানো হয়। এই অবস্থায় সারা দুনিয়ায় আজ একটি মাত্র দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নই সর্ব্বক্ষেত্রে নূতনতম এবং খুব উন্নত যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিতে আগাইয়া আসিতেছে। যে-দেশে সমাজতন্ত্র গড়িয়া তোলা হইতেছে সে-দেশই যান্ত্রিক উন্নতির বিজয়পতাকা ঊর্দ্ধে উড্ডীন রাখিয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবিদ্যা শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা শত-সহস্র গুণ বাড়াইয়া তুলিতেছে।

একজন শ্রমিক দৈনিক ৪৫০ খানা ইট হাতে তৈয়ার করিতে পারে। একটি আধুনিক ইট প্রস্তুতকারী যন্ত্রে নিয়োজিত প্রত্যেকটি শ্রমিক দৈনিক ৪ লক্ষ ইট তৈয়ার করিতে পারেন অর্থাৎ ১ হাজার গুণ বেশী।

একটি হস্তচালিত ময়দার কল দৈনিক ২২৫-৩২৫ সের নিকৃষ্ট শ্রেণীর ময়দা উৎপাদন করে। মিনিয়াপোলিসে (যুক্তরাষ্ট্র) আধুনিক ময়দার কলে নিয়োজিত প্রত্যেকটি শ্রমিক দৈনিক ৬৫ লক্ষ সের উৎকৃষ্ট ময়দা উৎপাদন করে অর্থাৎ আগের চেয়ে প্রায় ২০ হাজার গুণ বেশী।

একটি আধুনিক জুতার কারখানা প্রতি ৬ দিনে শ্রমিক প্রতি ৮৩ জোড়া জুতা উৎপাদন করিতে পারে। একজন শ্রমিক কিন্তু নিজে কাজ করিয়া উৎপাদন করিতে পারিত মাত্র ১ জোড়া জুতা।

যাহা হোক, আধুনিক মুমূর্ষু পুঁজিতন্ত্র এই সব সুবিধা কাজে লাগাইতে অক্ষম। এমন কি, বর্ত্তমান সঙ্কটের পূর্ব্বেও যান্ত্রিক উন্নতির প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদশালী পুঁজিতান্ত্রিক দেশ খাস আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও বিষম বাধার সম্মুখীন হইয়াছিল।

১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ২,৭৩০টি ইট প্রস্তুতকারী কারখানায় ৩৯ হাজার শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ৮০০ কোটি ইট উৎপাদন করিত। কিন্তু প্রত্যেকটিতে মাত্র ১০০ জন শ্রমিক কাজ করে এমন ৬৭টি আধুনিক কারখানাই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের চাহিদা সম্পূর্ণ রূপে পূরণ করিতে পারিত।

১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৩২৫ কোটি সের ময়দা উৎপন্ন হইয়াছিল। মিনিয়াপোলিসের উপরোক্ত ময়দার কলের স্বাভাবিক উৎপাদন-ক্ষমতায় এই পরিমাণ ময়দা উৎপাদন করিতে প্রয়োজন হইত মাত্র ১৭ জন শ্রমিকের। প্রকৃত পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ময়দার কলে কিন্তু ১৭ জন শ্রমিক ছিল না, ছিল ২৭,০২৮ জন।

এমন কি, ১৯২৯ সালেও অর্থাৎ সর্ব্বাধিক সমৃদ্ধির যুগেও যুক্তরাষ্ট্রের পাদুকাশিল্পে ২০৫,৬৪০ জন শ্রমিক উৎপাদন করিত ৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ জোড়া জুতা। ইহাতে সপ্তাহে শ্রমিক প্রতি ৮৩ জোড়া জুতা না হইয়া পড়তা পড়িত ৩৫ জোড়া। অনুরূপ অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করা যায়।

মনে রাখা আবশ্যক যে পুঁজিতন্ত্র তাহার সমৃদ্ধির যুগে মানব-সমাজের উৎপাদন-শক্তির প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিল। পুঁজিতন্ত্রের

আবির্ভাবের পূর্ব্বে আধুনিক বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ইহার উন্নত যান্ত্রিক বিকাশ, যানবাহন এবং যোগাযোগের আধুনিক উপায়ের কথা কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই। পুঁজিতন্ত্রই আপনার সঙ্গে লইয়া আসিল যান্ত্রিক উৎপাদন, তমসাচ্ছন্ন ভূগর্ভের ঘুমন্ত ঐশ্বর্য্যময়ী সম্পদলক্ষ্মীকে সে প্রাণ দান করিল; অতিশয় উন্নত যন্ত্র-কৌশল উদ্ভাবন করিয়া পুঁজিতন্ত্র মানুষের শ্রমভার যথেষ্ট লাঘব করিল এবং প্রকৃতির উপরে মানুষের প্রভাব বাড়াইয়া তুলিল।

যাই হোক, পুঁজিতন্ত্রের প্রসাদে সমাজের উৎপাদন-শক্তির এই ক্রমোন্নতি এক শ্রেণী কর্ত্তৃক অপর শ্রেণীর উপর প্রাণঘাতী শোষণ চালাইবার কাজে নিয়োজিত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আওতায় উৎপাদনের প্রকৃষ্ট উপায় শ্রমিক শ্রেণীকে নিংড়াইয়া উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পের চালক শক্তি হইতেছে লাভের জন্য প্রতিযোগিতা, মুনাফার জন্য প্রতিযোগিতা। পুঁজিপতি নূতন যান্ত্রিক আবিষ্কারকে প্রয়োগ করে কেবলমাত্র মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই।

এই জন্যই পুঁজিতন্ত্রের অধীনে উৎপাদন-শক্তির অধিকতর উন্নতির অর্থ হইল এই যে ইহার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণের বৃহৎ অংশকে নিঃস্ব করিয়া কতিপয় পুঁজিপতির অতুল ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রবিজ্ঞানের দিক হইতে অতি উন্নত ধরনের বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া, মনুষ্য-শ্রমের যান্ত্রিক (technical) শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া পুঁজিতন্ত্র সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বাস্তব ভিত্তিও প্রস্তুত করে, সর্ব্বহারা যে-আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিতেছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার অনুকূল বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করে। এইখানেই, সর্ব্বহারা-বিপ্লবের বিজয়ের আবশ্যক প্রস্তুতির

ভিত্তি গঠন করার মধ্যেই নিহিত আছে পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা।

বুর্জোয়ারা প্রচার করে যে ধনী ও দরিদ্র, ভুরিভোজী ও বুভুক্ষু, অলস ও অতিরিক্ত পরিশ্রমী শ্রমিক সকলেই 'সমান'। ইহা অপেক্ষা কদর্য্য ভণ্ডামি আর নাই। বস্তুত, বুভুক্ষু কঙ্কালসার হাতের তাড়নায় কঠোরতম আইন অপেক্ষাও কার্য্যকরী ভাবে শ্রমিক পুঁজিপতির দাসত্বের কবলে গিয়া পড়ে। পুঁজিতন্ত্র সর্ব্বহারা শ্রেণীর জীবনযাত্রার অবস্থাকে নিয়তই অধিকতর মন্দের দিকে টানিয়া নামায়। পুঁজিতন্ত্র বিশাল শ্রমিক সাধারণের মধ্যে নিয়ত **দারিদ্র্য** বৃদ্ধি করিয়া চলে। শ্রমিক অঞ্চলে অতিথিরূপে ক্ষুধার সাক্ষাত মেলে ঘন ঘন। মার্ক্স্ বলেন:

মজুরী-দাসত্ব

> "প্রাচীন রোমের দাসদের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখা হইত। মজুরী-শ্রমিক নিজের মালিকের নিকট এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ। অনবরত মনিব বদল এবং চুক্তির মিথ্যা আইনের সাহায্যে স্বাধীনতার ঠাট বজায় রাখা হয়।" *

বস্তুত কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অপর এক পুঁজিপতির কারখানায় কাজ লইবার জন্যই কেবল আগের পুঁজিপতির কাজ ছাড়িবার স্বাধীনতা শ্রমিকের আছে।

বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অছিলায় পুঁজিপতিরা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিল। শ্রমের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা হইতেছে—এই ধুয়া তুলিয়া পৃথিবীর একমাত্র স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে আধুনিক দাসপ্রভুদের এই অভিযান

* মার্ক্স্: 'ক্যাপিটাল,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮৬।

অপেক্ষা জঘন্য আর কিছু কল্পনা করা কঠিন। পৃথিবীর একমাত্র দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নেই মজুরী-দাসত্বের অবসান করা হইয়াছে। মানুষের ইতিহাসে এইখানেই সর্ব্বপ্রথম অগণিত শ্রমিক সাধারণ সুস্থ ও স্বাধীন শ্রমের সুযোগ লাভ করিয়াছে—এই শ্রমের সাহায্যে তাহারা নিজেদের কল্যাণ করিতে পারিবে, শোষক ও শোষিতের অস্তিত্ববিহীন এক সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।

সমগ্র পুঁজিবাদী জগতে শ্রমিক সাধারণ ক্লান্তিকর ঘৃণ্য শ্রমের সহিত অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এই শ্রমের ফল কেবল তাহাদের দাসত্বকেই বাড়াইয়া দেয়, পুঁজিবাদী শৃঙ্খলকে করে কঠোরতর। মুষ্টিমেয় অলস ব্যক্তির জন্য অপরিমেয় সম্পদ সৃষ্টি করিয়া শ্রমিকরা নিজেরাই বুভুক্ষা এবং অভাবের তাড়নায় পীড়িত হয়। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে মার্ক্‌স্ বলিয়াছেন:

> "পরিদর্শকের শাস্তির খাতা দাসপ্রভুর চাবুকের স্থান গ্রহণ করিয়াছে।" *

তত্ত্বাবধায়কের (ফোরম্যানের) জরিমানার খাতা—কাজ হারাইয়া অনাহারে মৃত্যুর শাশ্বত আশঙ্কা—বর্ত্তমানের শ্রমিককে দাসপ্রভুর চাবুক হইতে যে কম শঙ্কিত করে না ইহা নিঃসন্দেহ।

তবুও আধুনিক পুঁজিবাদী দেশেও তত্ত্বাবধায়কের চাবুক চালনা কোনো রকমেই বিরল নয়। কতকগুলি দেশে, বিশেষ করিয়া উপনিবেশসমূহে, পুঁজিপতিদের লাভের জন্য শ্রমিকরা প্রকৃত দাসের মত শ্রম করিতেছে। পুঁজি 'স্বাধীন' মজুরী-শ্রম কাজে লাগাইয়া প্রচুর মুনাফা লাভ করে; কিন্তু অনুকূল অবস্থায় দাসশ্রমেরও 'সদ্ব্যবহার' করিতে সে বিমুখ নয়।

* মার্ক্‌স্: 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৪।

এমন কি, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে আমরা দাসযুগের অনুরূপ অবস্থা দেখিতে পাই।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের অবস্থায় বুর্জোয়ারা 'শ্রমিক-সেবার' বিভিন্ন ব্যবস্থায় প্রকৃত প্রস্তাবে বাধ্যতামূলক শ্রম (প্রধানত বেকার যুবক) নিয়োগ করে। জার্মান 'শ্রমিক-সেবার' শিবিরগুলিতে শত-সহস্র যুবক শ্রমিক যেন সৈন্যছাউনির মতো সামরিক ব্যবস্থার মধ্যে বাস করে। অতি দুষ্কর কাজের জন্য তাহারা পায় নগণ্য জীবিকা মাত্র। সেই সঙ্গে জার্মান ফাশিজম্ শিবিরের অধিবাসীদের সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য করে, সামরিক অভিযানের বলি হিসাবে তাহাদের প্রস্তুত করিয়া তোলে।

নিগ্রো দাস-শ্রমের অস্তিত্ব আজও আমেরিকায় বর্ত্তমান। তথাকার প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ নিগ্রোর মধ্যে অধিকাংশই হইল শ্রমিক এবং সামান্য খামারের কৃষক। ১৮৬৩ সালে আইনত দাসত্বের অবসান ঘটিলে পরেও অধিকাংশ নিগ্রো শ্রমিককে তাহাদের মনিবদের উপর একান্ত নির্ভরশীল হইতে বাধ্য করা হয়।

দক্ষিণ দেশীয় রাষ্ট্রসমূহে অনেক ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারীরা নিগ্রো পরিবারকে ফসলের সময় না আসা পর্য্যন্ত জমি, বীজ, খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি দিয়া থাকে। রায়তী কৃষককে তাহার সম্পূর্ণ ফসল ভূম্যধিকারীকে দিতে হয়। ভূম্যধিকারী ইহাতে তাহার প্রাথমিক ব্যয় নির্ব্বাহ করে। কিন্তু নিগ্রো যাহাতে সর্ব্বদাই তাহার খাতক হইয়া থাকে তাহার জন্য ভূম্যধিকারী সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করে। মনে করা যাক যে, এক নিগ্রোর ১০০ গাঁইট তুলা আছে; বাজারে ইহার দাম হইল ১২,০০০৲ টাকা। এমন ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী দেখাইবার চেষ্টা করিবে যে সে ১৬,০০০৲ টাকা খাটাইয়াছে। সুতরাং সমগ্র ফসল দিলেও ভূম্যধিকারীর নিকট নিগ্রোর ঋণ থাকিবে ৪,০০০৲ টাকা; কাজেই

একই শর্তে সে চুক্তিটি পুনরায় সম্পাদিত করিতে বাধ্য হয়। এই ধাপ্পাবাজী বৎসরের পর বৎসর চলে। বিচারালয়ে আবেদন করিলেও নিগ্রোর কথায় কেহ কানই দেয় না; নিগ্রোর কথায় কোনো শ্বেতাঙ্গের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ভূম্যধিকারীরা যে কেবল নিজেদের আবাদের মধ্যেই একচ্ছত্র প্রভু তাহা নয়—সমগ্র সম্প্রদায়ের উপরও তাহাদের অসীম প্রভাব। 'বিচারালয়ের' সামনে তাহাদের যে কেহ যাহাই বলিবে তাহাই হইবে আইন। কি অবস্থায় নিগ্রোদের কাজ করিতে হইবে, দক্ষিণ আমেরিকায় তাহা ঠিক করিয়া দেয় ভূম্যধিকারীরাই। মনিবের বে-আইনি কাজে অসহিষ্ণু হইয়া কোনো শ্রমিক পালাইবার চেষ্টা করিলে শিক্ষিত কুকুরের সহায়তায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে। ধরা পড়িলে নিগ্রোকে ভবঘুরে অথবা পলাতক বিবেচনা করিয়া ভূম্যধিকারীর হাতেই ফেরত দেওয়া হয়।

সস্তা শ্রমশক্তি সংগ্রহ করিতে ভূম্যধিকারী আরও অনেক চালাকির সাহায্য নেয়। অত্যন্ত নিষ্ঠুর দাসোচিত অবস্থার মধ্যেই এই শ্রমশক্তিকে নিয়োগ করা হয়।

শ্রমশক্তির দরকার হইলেই ভূম্যধিকারী স্থানীয় আদালতে আবেদন করে, এবং পুলিস প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিককে গ্রেফতার করিয়া আনে। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকারের মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। আদালত নিগ্রোদের জরিমানা করে। জরিমানা দিতে না পারায় তাহারা ভূম্যধিকারীর নিকট দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়, কারণ সে-ই উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাদের জরিমানা মিটাইয়া দিয়া পরে তাহাদের মজুরী হইতে কাটিয়া নেয়।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মম ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রমের অস্তিত্ব রহিয়াছে উপনিবেশগুলিতে। এই সব জায়গায় সাম্রাজ্যবাদীরা দেশীয় জনগণকে পুরাপুরি দাসে পরিণত করে। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সোনা এবং অন্যান্য ধাতুর খনিতে, আবাদে, রাস্তা তৈয়ারের কাজে বাধ্যতামূলক শ্রম ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়।

উপনিবেশসমূহে দাসত্ব

প্রভু-ভৃত্য আইন অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকায় মনিবকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে দেশীয় লোককে অপরাধী বিবেচনা করা হয়, এবং মনিবের নিকট ফিরিয়া যাইতে তাহাকে বাধ্য করা হয়। সে যে কোনো ইয়োরোপীয়ের অধীনে কাজ করিয়াছে, এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য সেই ইয়োরোপীয়ের ছাড়পত্রই তাহাকে সর্ব্বত্র দেখাইতে হয়। তাহার 'ছাড়পত্র' ঠিক না থাকিলে তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আগেকার মনিবের নিকট ফিরিয়া যাইতে অথবা অন্য কাহারও নিকট কাজ করিতে বাধ্য করা হয়।

খনিশিল্পে, বিশেষত স্বর্ণ ও হীরকের খনিতে, দেশীয় শ্রমিকরা কাঁটা তারের বেড়ায় ঘেরা এক রকমের বিশেষ আশ্রয়ে বাস করে। ইহাকে বলে 'খোঁয়াড়'। তাহার ভাড়াটিয়া জীবনের সমগ্র সময়ের মধ্যে এই কয়েদখানা পরিত্যাগ করিবার অধিকার শ্রমিকের নাই। সশস্ত্র প্রহরী সারাক্ষণ পাহারা দেয়। বাহিরের লোক বেড়ার ভিতরে ঢুকিতে পারে না। তাহার গড়পড়তা দৈনিক মজুরী দেড় টাকারও (আধ ডলার) কম। ইহা দ্বারাই তাহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এই সামান্য মজুরীর জন্যই তাহাকে খাটিতে হয় দৈনিক ১২ হইতে ১৪ ঘণ্টা।

আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশেও নিতান্ত অমানুষিক শোষণ-পদ্ধতি প্রচলিত। সচরাচর লোকদের একত্রে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া খনিতে আনা হয়। সশস্ত্র প্রহরীর তদারকে কাজ চলে। মদ খাওয়াইয়া মাতাল

করিবার পর দেশীয় শ্রমিককে দিয়া একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করানো হয় এবং অনেক সময়ে সে জানেই না এই চুক্তির অর্থ কি।

দাসত্বের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকাশ্য দাস-ব্যবসাও চলে; উদাহরণ স্বরূপ, পর্ত্তুগিজ আফ্রিকা (এ্যাঙ্গোলা এবং বিশেষ করিয়া মোজাম্বিক) অথবা লাইবেরিয়ার 'স্বাধীন সাধারণতন্ত্রে'র উল্লেখ করা যায়; শেষোক্ত স্থানটি সম্পূর্ণ রূপে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের করতলগত।

প্রকাশ্য দাসত্বের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে ঋণ-দাসত্ব। যে-ঋণ কাজ করিয়া পরিশোধ করিতে হইবে এবং বংশানুক্রমে যে-ঋণ চলিতে থাকিবে, সেইরূপ ঋণের সাহায্যে শুধু ব্যক্তিগত ভাবে শ্রমিকই নয়, তাহার সমগ্র পরিবারই মালিকের ও তাহার পরিবারের বংশানুক্রমিক দাসে পরিণত হয়—মার্ক্সের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইহাই হইল ঋণ-দাসত্বের তাৎপর্য্য।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। পুঁজির আদিম সঞ্চয় কী কী লইয়া গঠিত?

২। শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে শ্রমিককে বাধ্য করে কী?

৩। শ্রমশক্তির মূল্য কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়?

৪। শ্রমশক্তি ও শ্রমের মধ্যে পার্থক্য কী?

৫। পুঁজি কী?

৬। কোনটি বড়: স্থির অথবা স্থায়ী পুঁজি?

৭। শ্রম-শোষণের মাত্রার মানদণ্ড কী?

৮। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়াইবার পদ্ধতি কী?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুঁজিতন্ত্রের অধীনে শ্রমিক শ্রেণীর মজুরী এবং দারিদ্র্য

শ্রমশক্তির মূল্য ও দাম

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক নিজের শ্রম বিক্রয় করে পুঁজিপতির নিকট। পুঁজিপতি নিজের সুবিধার জন্য শ্রমিক ভাড়া করিয়া তাহাকে দিয়া কাজ করায়, শ্রমিক পায় মজুরী। ইহাই হইল শ্রমশক্তির ক্রয় ও বিক্রয়।

কিন্তু শ্রমশক্তি হইল **এক বিশেষ ধরনের পণ্য**। দুইটি মূল শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে যে-সম্পর্ক আছে, শ্রমশক্তির ক্রয় ও বিক্রয় সেই সম্পর্ক নির্দ্দেশ করে। আমরা জানি, শ্রমিকের জীবন ধারণের আবশ্যকীয় উপকরণসমূহের মূল্যের দ্বারাই শ্রমশক্তির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পুঁজিপতিরা সর্ব্বদাই এই সীমারেখার নিচে মজুরী কমাইতে চেষ্টা করে। শ্রমিক কি করিয়া জীবন যাপন করে তাহা লইয়া পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাহারও কোনো মাথাব্যথা নাই। প্রায়ই সে বেকারই থাকে এবং মরেও অনাহারে। এমন কি, কাজ জোগাড় হইলেও তাহার মজুরী নিতান্ত প্রাথমিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ করিবার পক্ষেও সব সময়ে পর্য্যাপ্ত হয় না।

শ্রমিকের জীবন ধারণের উপকরণসমূহের মূল্যের দ্বারা শ্রমশক্তির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু জীবন ধারণের আবশ্যকীয় উপকরণসমূহই বা কি ভাবে নির্দ্ধারিত হয়? ইহা সুস্পষ্ট যে শ্রমিকের জীবন ধারণের

উপকরণসমূহ, সেই সব জিনিসের পরিমাণ ও প্রকৃতি কয়েকটি অবস্থার উপর নির্ভর করে। মার্ক্‌স্‌ দেখাইয়াছেন যে :

> "প্রত্যেক দেশেই শ্রমের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় **জীবন ধারণের প্রচলিত মানের দ্বারা।** এই জীবনধারণ কেবলমাত্র শরীরধারণ নয়; পরন্তু, যে-সামাজিক অবস্থার মধ্যে মানুষ বাস করে এবং লালিত-পালিত হয় সেই সামাজিক অবস্থার তাগিদেই কতকগুলি প্রয়োজনের উদ্ভব হয়; জীবন ধারণের অর্থ এই সব প্রয়োজনের পূরণ।" *

শ্রমশক্তির মূল্যের নির্দ্ধারণ অপরাপর পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হইতে ভিন্ন ধরনের। শ্রমশক্তির মূল্য নির্দ্ধারণে এক **ঐতিহাসিক** বা **সামাজিক** উপাদানের প্রভাব আছে। শ্রমিকের সাধারণ জীবনযাত্রার মান চিরস্থায়ী ও সনাতন কিছু নয়। পক্ষান্তরে, ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই মানও পরিবর্ত্তিত হয়। সেইজন্যই ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের স্তর ভেদে এই মান বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের। পুঁজিতন্ত্র কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান এক অত্যন্ত নিম্ন স্তরে টানিয়া নামাইতে সর্ব্বদাই প্রয়াস পায়। মুদ্রার অঙ্কে ব্যক্ত পণ্যের মূল্যই হইতেছে পণ্যের দাম। ইতিপূর্ব্বে দেখা দিয়াছে যে, পণ্যের দাম অনবরত তাহার মূল্যের উপরে বা নিচে উঠা-নামা করে। মজুরী হইতেছে 'শ্রমশক্তি' নামক পণ্যের বিশেষ ধরনের দাম। ইহা প্রত্যক্ষ যে, মজুরীর মান শ্রমশক্তির মূল্যের উপরে এবং নিচে উঠা-নামা করে; কিন্তু অপরাপর পণ্যের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, এক্ষেত্রে দামের উঠ্‌তি-পড়্‌তি মুখ্যত মূল্যের নিচেই থাকে।

* মার্ক্‌স্‌: 'মূল্য, দাম ও মুনাফা,' পৃঃ ৮৬।

মজুরী—পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের মুখোশ

আমরা জানি যে পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে মজুরী-শ্রমিকের শ্রম দুইটি অংশের সমষ্টি: মজুরীপ্রাপ্ত আবশ্যক শ্রম এবং মজুরীহীন উদ্বৃত্ত শ্রম। শ্রমিকের মজুরী পাওয়ার সময়ে এ-বিষয়টি আদৌ বাহ্যত বুঝা যায় না যে এই মজুরী কেবল মাত্র আবশ্যক শ্রমের দরুনই পাওয়া, উপরন্তু শ্রমিককে মজুরী না দিয়াই তাহার উদ্বৃত্ত শ্রম মালিক আত্মসাৎ করে। পক্ষান্তরে, পুঁজিবাদের আওতায় সমস্ত ব্যাপার এমন করিয়া চিত্রিত করা হয় যাহাতে মনে হয় যে শ্রমিকের সম্পূর্ণ শ্রমের পারিশ্রমিকই বুঝি শ্রমিককে দেওয়া হইয়াছে।

একজন খনি-মজুরের কথাই ধরা যাক। মজুরী দেওয়া হয় তাহাকে ফুরন কাজের ভিত্তিতে। অনুমান করা যাক যে যত কয়লা সে তোলে তাহার **প্রতি মণে** সে পায় দুই আনা। প্রতিদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়াও কেবল মাত্র চাউল কিনিবার মত পয়সাই সে উপার্জ্জন করে। এইরূপ শোষণের অবিচার সম্পর্কে সে তাহার খনি-মালিকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিলে মালিক যদি কৃপাপরবশ হইয়া নিতান্তই কথা বলিতে চায় তবে বলিবে:

> 'প্রতি মণে তুমি পাও দুই আনা, পার্শ্ববর্ত্তী খনিসমূহে বা অন্যত্র ইহার অধিক মজুরী কোথাও দেওয়া হয় না, তুমি তো ন্যায্য মজুরীই পাও। তোমার শ্রমের দাম ইহার বেশী নয়। বেশী কয়লা তুলিতে চেষ্টা কর, তোমার মজুরীও বাড়িয়া যাইবে।'

এই রকম করিয়াই এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় যে শ্রমিক কাজ করিয়া যাহা উৎপাদন করে তাহার পূর্ণ মূল্যই সে পায়।

মনে করা যাক যে আমাদের এই খনি-শ্রমিকের একজন বন্ধু নিকটবর্ত্তী কোনো রাসায়নিক কারখানায় কাজ করে। ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর

অবস্থার মধ্যে দৈনিক ৯ ঘণ্টা কাজ করিয়া সে মাসে পায়, ধরা যাক, পঁচিশ টাকা। তাহার মনিব যে তাহাকে শোষণ করিতেছে এই সত্যটি কেমন করিয়া সে উপলব্ধি করে? এ-বিষয়ে মনিবকে কিছু বলিতে গেলেই তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে তাহাকে উত্তর দেওয়া হইবে:

> 'তোমার জায়গায় অন্য কেহ কাজ করিলে যাহা পাইত তুমিও তাহাই পাও; যদি চাও তবে দুই দফাতেই (শিফ্‌ট্‌) কাজ করিতে পার, দ্বিগুণ মজুর পাইবে; কিন্তু দৈনিক ন' ঘণ্টার শ্রমে মাসে তুমি মাত্র পঁচিশ টাকার কাজই কর। তোমাকে ইহার বেশী মজুরী দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না।'

বস্তুতই, শ্রমিক কি করিয়া জানিবে যে সে তাহার মনিবের জন্য কি পরিমাণ মূল্য প্রতিদিন উৎপাদন করে? ৯ ঘণ্টার রোজ আর দৃশ্যত বিভক্ত হয় নাই যে সে বুঝিবে: দিনের এই ভাগে কাজ করি আমি মজুরীর জন্য এবং এই সময় আমি মনিবের জন্য বিনা মজুরীতে খাটি। শ্রমের সকল ঘণ্টাই এক রকমের, এবং সে তাহার মজুরী বাড়াইবার, দ্বিগুণ করিবার সুযোগও পায়, অবশ্য শ্রমের রোজ দ্বিগুণ করিয়া। এই প্রকার ব্যাপার প্রকৃত পক্ষে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে; এইরূপ মনে হয় যে শ্রমিক যে-পরিমাণ মূল্য উৎপাদন করে পুঁজিপতি যেন তাহাকে সেই পরিমাণ মজুরীই দেয়।

পুঁজিবাদী শোষণ এমনি করিয়া প্রচ্ছন্নই রহিয়া যায়। এই ব্যাপারে জনগণের মানসিক **দাসত্বের** সমস্ত শক্তি মনিবদের সহায় হয়। ধর্ম্ম প্রচার করে যে পার্থিব ব্যবস্থা ভগবানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, কাজেই এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য সকল রকমের চেষ্টাই পাপ। বুর্জোয়াদের পুঁজিবাদী সংবাদপত্র, বিজ্ঞান, নাট্যশালা, ছায়াচিত্র, সাহিত্য এবং শিল্প সমস্তই শোষণের বিষয়টি গোপন করিয়া রাখে, সমস্তই

ব্যাপারটিকে এমন ভাবে দেখাইতে চায় যে ঠিক যেন নির্ম্মল শারদীয় সূর্য্যের আলোর মতই পুঁজিপতির সমৃদ্ধি লাভও স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী।

"এইরূপে মজুরী-ব্যবস্থা আবশ্যক শ্রম ও উদ্বৃত্ত শ্রম, মজুরীপ্রাপ্ত শ্রম ও মজুরীবিহীন শ্রম রূপে শ্রমের রোজের বিভাগের সকল চিহ্নই লোপ করিয়াছে। সমগ্র শ্রমই মজুরীপ্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়। বেগার প্রথায় নিজের জন্য শ্রমিকের শ্রম এবং মনিবের জন্য তাহার বাধ্যতামূলক শ্রম স্থান-কাল ভেদে যতদূর সম্ভব পৃথক। দাস-শ্রমের বেলাতে, এমন কি শ্রমের রোজের যে-অংশে মেহনত করিয়া দাস তাহার জীবন ধারণের উপকরণসমূহের মূল্যই শুধু পূরণ করিতেছে, সুতরাং কার্য্যত তাহার নিজের জন্য কাজ করিতেছে, তাহাও তাহার মনিবের জন্য শ্রম বলিয়াই মনে হয়। দাসের সমগ্র শ্রমই মজুরী-বিহীন বলিয়া প্রতিভাত হয়। অপর পক্ষে মজুরী-শ্রমে এমন কি উদ্বৃত্ত শ্রম, মজুরী-বিহীন শ্রমও মজুরীপ্রাপ্ত শ্রম বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" *

শ্রমিকরা বহু পূর্ব্বেই ট্রেড ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে শুরু করিয়াছে। শ্রমের অবস্থার উন্নতি বিধান করা এবং অপরিমিত শোষণ সংযত করার জন্য এই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন (বা মজদুর ইউনিয়ন) সংগ্রাম পরিচালনা করে।

মজুরী এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম

আমরা দেখিয়াছি যে মজুরী শ্রমশক্তির মূল্যের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। মজুরী কিন্তু প্রথমত বিশেষ করিয়া শ্রমশক্তির মূল্যের নিচেই যথেষ্ট পরিমাণে উঠা নামা করে; দ্বিতীয়ত, শ্রমশক্তির মূল্য কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে বলিয়া যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়।

* মার্ক্স: 'ক্যাপিটাল', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫০।

মজুরীর মান লইয়া বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অবিরত সংগ্রাম চলে, এই সংগ্রামে প্রত্যেক পক্ষের সংগঠন এবং একতার পরিমাণের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

যতদিন শ্রমিকদের সংগঠিত মজদুর ইউনিয়ন ছিল না, ততদিন প্রত্যেক পুঁজিপতি বিক্ষিপ্ত, অসংহত জনতা লইয়া কারবার করিত। এইরূপ ক্ষেত্রে মজুরীর সংগ্রামে পুঁজিপতি সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। কোনো শ্রমিক কাজের খারাপ অবস্থা মানিয়া না নিলেই তাহাকে বরখাস্ত করা হয় এবং তাহার জায়গায় কাজ করিবার মত লোকও মালিক শীঘ্রই জোগাড় করে।

মজদুর ইউনিয়ন অন্দোলন বিদ্যমান থাকিলেই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। এই প্রকার অবস্থায় পুঁজিপতির বিরুদ্ধ পক্ষ আর অসংগঠিত শ্রমিকের বিক্ষিপ্ত জনতা নয়, পুঁজিপতিকে এখন কারবার করিতে হয় সমগ্র (বা সংখ্যাধিক) শ্রমিকের সঙ্ঘের সহিত। শ্রমিক-সঙ্ঘ একই রকম দাবী, একই রকমের শর্ত্ত দাবী করে। পুঁজিপতি প্রথমত চুক্তি করিত ব্যষ্টির সহিত। এখন তাহাকে চুক্তি করিতে হয় সমষ্টিগত ভাবে ইউনিয়নের সহিত। হার সম্পর্কেও বিশেষ চুক্তির দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয় শ্রমিকদের মজুরী।

এমন কি মজদুর ইউনিয়নের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও পুঁজিপতির শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার অবশ্য বহু উপায় আছে। তাহারাও মালিক সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

ইহা সুস্পষ্ট যে শ্রমিক সঙ্ঘগুলির কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সংগ্রামের সাহায্যেই শ্রমিক শ্রেণী ক্রমবর্দ্ধমান পুঁজিবাদী শোষণ, দারিদ্র্য এবং দুস্থতা হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে পারে না। ইহার জন্য প্রয়োজন সর্ব্বহারার পূর্ণ স্বরাজ। সেই স্বরাজ লাভ করা যায় কেবলমাত্র **বিপ্লবের**

সাহায্যেই। তারপর পুঁজিতন্ত্রকে ধ্বংস করিতে সর্ব্বহারারা তাহাদের দুস্থতার কারণ রূপ শ্রেণীশোষণকে ধ্বংস করে। এই সম্পর্কে মার্ক্স্ লিখিয়াছেন:

"পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ ঝোঁক মজুরীর গড়পড়তা বা সাধারণ মান বৃদ্ধি করা নয়, পরন্তু হ্রাস করা বা **শ্রমের মূল্যকে** তাহার **নিম্নতম সীমায়** টানিয়া নামানো। এই ব্যবস্থায় সমস্ত **জিনিসের** এইরূপ ঝোঁক হওয়ায় একথা কি বলা যায় যে পুঁজির অন্যায় এবং অনধিকার লাভের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিরোধ পরিত্যাগ করা উচিত এবং তাহাদের অস্থায়ী উন্নতির জন্য সাময়িক সুযোগের যথোচিত সদ্ব্যবহারের প্রচেষ্টাও পরিত্যাগ করা উচিত? শ্রমিক শ্রেণী যদি সেইরূপই করিত, তবে তাহারা হতভাগ্যদের অভিশপ্ত পর্য্যায়ে নামিয়া আসিত। আমি মনে করি আমি প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, মজুরীর মানের জন্য তাহাদের সংগ্রাম সমগ্র মজুরী-ব্যবস্থা হইতে অবিচ্ছিন্ন। তাহাদের মজুরী বৃদ্ধির প্রচেষ্টার শতকরা ৯৯টিই হইতেছে শ্রমের প্রদত্ত মূল্য বজায় রাখার চেষ্টা মাত্র, এবং পুঁজিপতির সহিত তাহাদের দাম লইয়া বিতণ্ডা করার আবশ্যকতা তাহাদের নিজেদের পণ্য রূপে বিক্রীত হওয়ার অবস্থার মধ্যে নিহিত আছে। পুঁজির বিরুদ্ধে তাহাদের দৈনন্দিন সঙ্ঘর্ষ ভীরুর ন্যায় ত্যাগ করিলে তাহারা নিশ্চয়ই যে কোনো বৃহত্তর আন্দোলন আরম্ভ করার পক্ষে নিজেদের অযোগ্য করিয়া ফেলিবে।

"সেই সঙ্গে এবং মজুরী-ব্যবস্থার সহিত জড়িত সাধারণ দাস্যবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে এই সব দৈনন্দিন সঙ্ঘর্ষের চরম কার্য্য-কারিতা সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণীর কোনোরূপ অতিরঞ্জিত ধারণা রাখা উচিত নয়। তাহাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে তাহারা কার্য্যের

(effects) সহিত সংগ্রাম করিতেছে, কার্য্যের কারণের (causes) সহিত নয়; তাহারা নিম্নমুখী গতিবেগকে মন্থর করিয়া রাখিতেছে, কিন্তু ইহার গতিপথ পরিবর্ত্তন করিতেছে না; তাহারা রোগের উপশমক ঔষধ প্রয়োগ করিতেছে, ব্যাধি আরোগ্য করিতেছে না। সুতরাং পুঁজির অবিরত জুলুমের ফলে বা বাজারের পরিবর্ত্তনের ফলে অপরিহার্য্য তাহাদের এই সকল গেরিলা সংগ্রামে সম্পূর্ণ রূপে ব্যাপৃত থাকা উচিত নয়। তাহাদের অনুধাবন করা উচিত যে বর্ত্তমান ব্যবস্থা তাহাদের ঘাড়ে সকল দুঃখ কষ্ট চাপাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য আবশ্যকীয় **বাস্তব অবস্থা** এবং সামাজিক **কাঠামোও** সৃষ্টি করিয়া বসে। **'ন্যায্য কাজের জন্য ন্যায্য মজুরী'**— এই **রক্ষণশীল** নীতিবাক্যের বদলে তাহাদের পতাকায় এই **বিপ্লবী** প্রতিজ্ঞা-বাক্যটি লিখিয়া লওয়া উচিত—**'মজুরী-ব্যবস্থার অবসান**।' " *

পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে মজুরী দেয়। মজুরী প্রদানের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে দুইটি প্রধান।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা পারিশ্রমিক পায় শ্রম-সময় অনুযায়ী। এই অবস্থায় ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ বা মাসের হিসাবে মজুরীর হিসাব করা হয়। ইহাকে মজুরীর সময় ঘটিত পদ্ধতি বা সময় মজুরী (time wages) বলে। অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরী নির্ভর করে তাহার উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভারের পরিমাণের উপর। শ্রমিক কত মণ কয়লা তুলিয়াছে বা কত গজ ছিট্

মজুরী-পদ্ধতি

* মার্কস্: 'মূল্য, দাম ও মুনাফা', পৃঃ ৯২-৩।

কাপড় বুনিয়াছে বা কয়টি তালা তৈয়ার করিয়াছে, এই সব অনুযায়ী তাহাকে মজুরী দেওয়া হয়। ইহাকে বলা হয় মজুরীর **ফুরন কাজ** পদ্ধতি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শ্রমিকদের মজুরী দেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে, ইহার কোনো কোনোটি আবার বিশেষ জটিল। এই সব পদ্ধতি সময় বা ফুরন কাজের ভিত্তির উপর এবং কখনও কখনও উভয়ের বিশেষত্বের মিলিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমত এইরূপ মনে হইতে পারে যে সময়ানুযায়ী মজুরী-পদ্ধতি এবং ফুরন কাজ অনুযায়ী মজুরী-পদ্ধতির কোথাও মিল নাই, এই দুইটি পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাহা নয়। সময়ানুযায়ী কাজের ক্ষেত্রে, শ্রমিককে একটি নির্দ্দিষ্ট সাপ্তাহিক মজুরী দেওয়ার সময় পুঁজিপতি হিসাব করে যে মজুর সেই সময় কি পরিমাণ কাজ করিবে। এই হিসাব না করিলে অচিরাৎ সে দেউলিয়া হইয়া পড়িবে। আবার ইহা আরও গুরুত্বপূর্ণ যে ফুরন কাজ আর সময়ানুযায়ী কাজ মূলত একই। ফুরন কাজের হার নির্দ্ধারণের সময় শ্রমিকের প্রতি ঘণ্টা, রোজ বা সপ্তাহের উৎপাদনের পরিমাণ বিবেচনা করা হয়। এই জন্যই ফুরন কাজেও সাধারণ শ্রমিক কেবল মাত্র নিতান্ত আবশ্যকীয় বস্তুই পাইতে পারে।

ফুরন কাজ এবং সময়ানুযায়ী কাজ উভয়ই পুঁজিপতির দ্বারা শ্রমশক্তি ক্রয়ের বিভিন্ন রূপ মাত্র। কোনো বিশেষ শিল্পে কী রূপ অবলম্বন করা হইবে তাহা নির্ভর করে সেই শিল্পে প্রচলিত বিশেষ অবস্থার উপর। অবস্থা বিশেষে ইহার প্রত্যেকটি রূপ পুঁজিপতির পক্ষে সুবিধাজনক।

সময়ানুযায়ী কাজ

যে-সব ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যতদূর সম্ভব বাড়াইবার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক শ্রমিককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার পক্ষে মালিকের কোনো কারণ থাকে না, সেখানে সময়ানুযায়ী কাজের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্র অনেক।

অনেক শিল্পে এখনও শ্রমিকের দক্ষতা ও সামর্থ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উৎপন্ন পণ্যের গুণাগুণ ইহারই উপর নির্ভর করে,। যে-সব ক্ষেত্রে কারবার হইল আধা-কারিগরী ধরনের শিল্প লইয়া সেখানে মালিক তাহার অতিশয় দক্ষ শ্রমিককে সপ্তাহ অনুসারে (সময় অনুসারে) মজুরী দেওয়া ভালো মনে করে। পরিমাণের জন্য চেষ্টা না করিয়া শ্রমিক প্রত্যেকটি পণ্য অত্যন্ত যত্নের সহিত উৎপাদন করে। পরিমাণগত ক্ষতি পুঁজিপতি পণ্যের উৎকর্ষে পোষাইয়া লয়।

অপর পক্ষে, অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক পরিণত হইয়া পড়ে যন্ত্রের লেজুড়ে। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যন্ত্রপাতির গতিবেগের উপরই সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে। এইরূপ ক্ষেত্রেও পুঁজিপতি সময়ানুযায়ী কাজই পছন্দ করে।

ফুরন কাজ

অন্য দিকে, যে-সব ক্ষেত্রে পুঁজিপতি শ্রমিককে যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে আকৃষ্ট করিতে চায় সেখানে ফুরন কাজের নানাবিধ পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। ফুরন কাজে মালিকের পক্ষে তাহার শ্রমিকদের কাজ তদারক করার দরকার হয় না, উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণের উপর মজুরী নির্ভর করে বলিয়া ফুরন কাজে শ্রমিকের নিকট হইতে তীব্রতম শ্রম আদায় করা সুনিশ্চিত হয়। যে-সমস্ত শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ (অংশ, ওজন, আয়তন বা দৈর্ঘ্য অনুসারে) হিসাব বা পরিমাপ করা সহজ, তাহাতেই সাধারণত ফুরন কাজ সম্ভব।

পুঁজিবাদের আওতায় শ্রমিকের শ্রমের তীব্রতা বাড়াইয়া তাহার

উপর শোষণ বৃদ্ধির পছন্দসই উপায় হইল ফুরন কাজ। ফুরন কাজের মজুরীর হার সাধারণত সর্ব্বাপেক্ষা পটু এবং ত্বরিতকর্ম্মা শ্রমিকদের মজুরীর অনুপাতে স্থিরীকৃত হয়। প্রয়োজনীয় নিম্নতম মজুরী উপার্জ্জন করিবার জন্য অন্যান্য শ্রমিক সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ শ্রমিক তাহাদের মজুরী বাড়াইতে পারিয়াছে দেখিতে পাইলেই মালিক মজুরীর হার কমাইয়া দেয়। ফলে পূর্ব্বতন মজুরী পাইতে শ্রমিককে আরও কঠোর ভাবে কাজ করিতে হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রচলিত অবস্থায় মজুরী প্রদানের ফুরন পদ্ধতির তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এক্ষেত্রে শ্রমিক তাহার কাজ কোনো শোষক শ্রেণীর নিকট বিক্রয় করে না। সর্ব্বহারার রাষ্ট্রের সম্পত্তিভূত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে তাহার শ্রম ব্যবহৃত হয়। শ্রমিকেরা সোভিয়েট ইউনিয়নে যে-মজুরী পায় তাহা হইতেছে শ্রমের সামাজিক স্বীকৃতি বা ভাতা, এবং তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ ও উৎকর্ষের অনুপাত অনুসারে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় মজুরী দানের ফুরন পদ্ধতি হইল ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ ও উৎকর্ষের সহিত প্রত্যেক শ্রমিকের মজুরীর সামঞ্জস্য বিধানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ। শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিক শ্রেণীর স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির ইহা এক শক্তিশালী উপায়। সুতরাং পুঁজিবাদের আওতায় চলতি ফুরন পদ্ধতি হইতে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কোনো কোনো সময় পুঁজিপতি মজুরীর একটা অংশ বোনাস (উপরী মজুরী) রূপে দিয়া থাকে। তাহারা মনে মনে হিসাব করে যে বোনাস

বোনাস বা উপরি মজুরী এবং মুনাফার বাঁটোয়ারা

বা উপরী মজুরী শ্রমিকদের বিশেষ শক্তি নিয়োগ করিতে উৎসাহিত করিবে এবং তাহাদের চরম তীব্রতার সহিত কাজ করিতে বাধ্য করিবে।

ইহা অপেক্ষাও বড় রকমের ধাপ্পাবাজি হইতেছে তথাকথিত **মুনাফার বাঁটোয়ারা**। পুঁজিপতি মূল মজুরী এই অজুহাতে কমাইয়া দেয় যে ব্যবসায়টি মুনাফাজনক করাতে শ্রমিকরাও মনে হয় আগ্রহশীল; যে-মজুরী আগেই কাটা হইয়াছে, মুনাফার শেয়ার-এর নামে মজুরীর সেই কাটা অংশই মাত্র শ্রমিককে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। পরিণামে 'মুনাফার বাঁটোয়ারায়' শ্রমিক প্রায়ই কেবল মজুরী লইয়া যে কাজ করে তাহার অপেক্ষাও কম পায়।

পুঁজিপতি এই উপায়ে শ্রমের তীব্রতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিতেই কেবল চেষ্টা করে না, পরন্তু কোনো কোনো সময়ে অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ শ্রমিকদের স্তর বিশেষকে সর্ব্বহারাদের শ্রেণী-আন্দোলন হইতে দূরে থাকিতে এবং ফলে পুঁজির সমর্থক রূপে কাজ করিতে প্রবৃত্ত করে।

রক্ত জলকরা ব্যবস্থা

ফুরন-কাজের ভিত্তিতে ইংলণ্ড ও আমেরিকায়, বিশেষত সেখানকার সূচীশিল্পব্যবসায়ে, তথাকথিত 'রক্ত জলকরা ব্যবস্থার অস্তিত্ব আছে। বাড়ীতে বসিয়া করার জন্য কাজ বিলি করা হয়, এবং ফুরনের হার অত্যন্ত কম। রক্ত জলকরা ব্যবস্থার অধীন দর্জিকে অনশন এড়াইবার জন্য প্রকৃতই দিবারাত্রি খাটিতে হয়।

শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠন। টেলর ও ফোর্ড ব্যবস্থা

সর্ব্বহারার শ্রমশক্তি ক্রয় করিয়া পুঁজিপতি তাহা হইতে নিজের জন্য যতদূর সম্ভব লাভ করিতে চেষ্টা করে। সম্প্রতি চতুর এবং ক্ষমতাশালী পুঁজিপতিরা শ্রমের তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক সংগঠন' প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মোটামুটি তাহা এইরূপ।

কারখানায় যে বিভিন্ন প্রকারের কাজ করিতে হয় তাহার প্রত্যেকটি কাজকে ওস্তাদরা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করিয়া দীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণ ও

গবেষণার পর এই সব কাজের সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি স্থির করে। এইরূপ কাজের এমন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয় যে সেই পদ্ধতিটি শ্রমিকের অনাবশ্যক গতি ও উদ্যম বাঁচাইয়া দেয়। তাহার সকল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সুসম্বদ্ধ ভাবে সাজানো হয় এবং শ্রমিকের শ্রম যাহাতে আসল কাজ হইতে বিক্ষিপ্ত না হয় তাহার জন্য অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থাও করা হয়। এই সমস্ত অবস্থার অধীনে শ্রমিকের নিযুক্ত শক্তি ও উদ্যম বিনা অপচয়ে সবই কার্য্যকরী কাজেই লাগে, তাহার করণীয় কাজেই সম্পূর্ণ ভাবে ব্যয় হয়। এইরূপে তাহার কাজ হইতে শিল্প সর্ব্বাধিক সুবিধা লাভ করায় শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

মানুষের উদ্যমের সুসম্বদ্ধ ব্যবহারে শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠন এক শ্রেষ্ঠ অবদান। পুঁজিতন্ত্রের উচ্ছেদের পর সর্ব্বহারার গভর্নমেণ্টের অধীনে শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠনের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু পুঁজিবাদী যুগে পুঁজিপতিরা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সাফল্যের ন্যায় শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠনকেও তাহাদের নিজেদের সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থের জন্য ব্যবহার করে। শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠন পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের নিকট হইতে অধিকতর উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করিয়া লইবার অন্যতম উপায়ে পরিণত করিয়াছে।

শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠনের কথা প্রথম যাঁহারা বলিয়াছেন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়র টেলর তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ব্যবস্থা-প্রণালীকে বলা হয় টেলর প্রণালী। উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়াইবার জন্য এই ব্যবস্থা-প্রণালী বহু কল-কারখানায় প্রয়োগ করা হয়। শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণ বাড়াইয়া শ্রমিকদের যন্ত্রে পরিণত করিয়া টেলর ব্যবস্থা-প্রণালী শ্রমিকদের শেষ শক্তি বিন্দু পর্য্যন্ত নিঃশেষিত

করিয়া লইয়া কয়েক বৎসর পরে তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। টেলর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পর ফুরন কাজের হার কমানো হয়, ফলে একই মজুরী এবং কোনো কোনো সময় কম মজুরীর জন্যও শ্রমিককে কঠোরতর পরিশ্রম করিতে হয়।

আমেরিকান মোটর গাড়ির রাজা হেনরী ফোর্ড শোষণের যে সূক্ষ্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছেন যুদ্ধোত্তর যুগে তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার শোষণ-পদ্ধতি কেবল আমেরিকাতেই দ্রুত বিস্তার লাভ করে নাই, পরন্তু ইয়োরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গতিশীল মঞ্চের (Conveyor) পাশে পাশে অবিরাম ধারায় উৎপাদনই হইতেছে ফোর্ড ব্যবস্থার মূল বিশেষত্ব। মঞ্চের গতি বৃদ্ধি করিয়া কাজের গতি দ্রুত এবং শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি করা হয়। মঞ্চের সহিত তাল রাখিতে অক্ষম হইলেই পুঁজিবাদী কারখানায় শ্রমিককে চাকুরী হারাইতে হয়। এইরূপে দেখা গেল যে পুঁজিপতি যন্ত্র সংক্রান্ত প্রত্যেকটি উন্নতিকে সর্ব্বহারার দারিদ্র্য ও দাসত্ব বাড়াইবার যন্ত্রে পরিণত করে, শ্রমিকদের জীবনীশক্তি নিঃশেষে নিংড়াইয়া বাহির করিবার যন্ত্রে রূপান্তরিত করে।

আগের দিনে কোনো শ্রমিককে 'জন' লওয়া হইলে তাহার কাজের জন্য টাকা সে কদাচিৎ পাইত। ব্যবস্থা ছিল এই রকম :—শ্রমিক মনিবের নিকট হইতে আহার পাইত; তা ছাড়া গ্রীষ্মের শেষে পাইত কিছু শস্য। এই ক্ষেত্রে শ্রমিককে মজুরী দেওয়া হইত জিনিসের হিসাবে। সে তাহার শ্রমশক্তির বিনিময়ে জীবন ধারণের আবশ্যক উপকরণসমূহ সরাসরি পায়। এইরূপ সরল লেনদেন উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ের অনুরূপ—মনে করা যাক, চাউলের বিনিময়ে কোদালি।

জিনিসপত্রে অথবা টাকায় মজুরী দান

বিনিময় যখন এই রকম সরল রূপ গ্রহণ করে তখন ইহা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে শ্রমশক্তির মূল্যের মূলে রহিয়াছে জীবন ধারণের আবশ্যক উপকরণ-সমূহের মূল্য।

পুঁজিবাদী শিল্পে কেবল মাত্র দ্রব্যে মজুরী অতি কদাচিৎ দেওয়া হয়। তবুও পুঁজিবাদী শিল্প-ব্যবস্থাতেও কোনো কোনো সময় আংশিক মজুরী দ্রব্যে দেওয়া হয়। মজুরী দেওয়ার এই পদ্ধতি শ্রমিকদের ক্ষতি করিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির এক সুবিধাজনক উপায় মাত্র। কারখানার মালিকদের দোকান (কোম্পানি স্টোর্স্) হইতে শ্রমিকদের সকল প্রকার পুরাতন জিনিস-পত্র তিন গুণ দামে সরবরাহ করা হয়। শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী এইরূপে যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যায়। কাজেই শ্রমিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্ব্বদাই এইরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কোনো কোনো সময় পুঁজিপতিরা আরও চতুর সূক্ষ্ম উপায়ে শ্রমিকদের চড়া দামে জিনিস ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধনের (অর্থাৎ শ্রমিকদের মজুরী হ্রাসের) চেষ্টা করে; তাহারা শ্রমিকদের বসতি বা জেলার সমস্ত দোকানের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে। শ্রমিকরা মুদ্রায় তাহাদের মজুরী পাইয়া ঠিক পূর্ব্বের মতই চড়া দামে জিনিস ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। শ্রমিকরা ক্রেতাদের সমবায়-সমিতি গড়িয়া তুলিয়া এইরূপ শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার চেষ্টা করে।

অল্প কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সমস্ত ক্ষেত্রেই উন্নত পুঁজিবাদী শিল্পে মুদ্রার দ্বারা মজুরী দেওয়া হয়। অন্য যে-কোনো পণ্য বিক্রয়ের মতই তাহার শ্রমশক্তি বিক্রয় করিয়া দাম বাবদে শ্রমিক এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা পায়।

বাহ্যিক বা নামমাত্র মজুরী এবং প্রকৃত মজুরী

শ্রমিকের কিন্তু মুদ্রার প্রয়োজন মুদ্রার জন্যই নয়, আবশ্যকীয়

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার পাওয়ার জন্যই তাহার মুদ্রার প্রয়োজন। নির্দ্দিষ্ট মজুরী পাইয়া শ্রমিক তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার ক্রয় করে। সেই সময়ে ইহাদের বাজারে প্রচলিত দাম সে দেয়।

কিন্তু আমরা জানি যে পণ্যের দামের মান অপরিবর্ত্তিত থাকে না। নানাবিধ কারণে মুদ্রার ক্রয়শক্তি পরিবর্ত্তিত হয়। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে সোনা সস্তা হওয়ার দরুন দাম চড়িতে পারে; স্বর্ণের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই মুদ্রার ক্রয়শক্তি পড়িয়া যায়। বহুল পরিমাণে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত হইলে কাগজী মুদ্রা সঞ্চালনের সঙ্গে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সেই সঙ্গে পণ্যের দামে বিরাট ও দ্রুত পরিবর্ত্তন আসে।

তাই, আমরা যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরী তুলনা করিতে চাই তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহারা কি পরিমাণ মুদ্রা পায় কেবল তাহা জানাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কি পরিমাণ দ্রব্যসম্ভার সেই মুদ্রার দ্বারা ক্রয় করা সম্ভব তাহাও জানা দরকার। আমরা কেবল মজুরীর **বাহ্যিক হার** (মজুরীর বাহ্যিক হারের অর্থ শ্রমিকদের প্রাপ্ত মুদ্রার পরিমাণ) তুলনা করি না। প্রাপ্ত মুদ্রার **ক্রয়শক্তি**ও আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। কেবল তাহা হইলেই **প্রকৃত** (real) মজুরী আমরা সঠিক ভাবে নির্ণয় করিতে পারিব। নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার দ্বারা যে-পরিমাণ ব্যবহার-মূল্য ক্রয় করা যায় তাহার দ্বারাই ইহার পরিমাপ হয়।

দক্ষ শ্রমিকের মজুরী

প্রত্যেকেই জানে যে বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকেরা বিভিন্ন হারে মজুরী পায়। কোনো বিশেষ যান্ত্রিকশিক্ষাহীন সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা অতিশয় দক্ষ শ্রমিকেরা অনেক বেশী মজুরী পায়। সাধারণত যত বেশী দক্ষতা তত বেশী মজুরী।

শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন প্রকার দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন। তাই বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকদের মজুরী এক নয়।

বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকদের মজুরীর হারের বিভিন্নতা ছাড়াও একই শিল্পে শ্রমিকের দক্ষতার স্তরভেদে মজুরীর বিভিন্নতা বর্ত্তমান। দক্ষ শ্রমিক আধা-নিপুণ শ্রমিক অপেক্ষা বেশী পায়; আধা-নিপুণ শ্রমিক সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা বেশী পায়।

দক্ষতা অনুযায়ী মজুরী হারের এই বিভিন্নতার কারণ কি? ইহা বুঝা কঠিন নয়। যে-কাজে দক্ষতা দরকার হয় না তেমন কাজ যে কেহই করিতে পারে। কিন্তু দক্ষ শ্রমিককে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ধরিয়া তাহার কাজ শিখিতে হয়, এই দক্ষতা অর্জ্জনের জন্য বহু সময় ও উদ্যম ব্যয় করিতে হয়। মজুরীর হারে পার্থক্য না থাকিলে কেহই কোনো শিল্প শিক্ষার জন্য সময় ও উদ্যম ব্যয় করিতে রাজী হইত না। দক্ষতার বিশেষ একটি মান অর্জ্জনের জন্য কেহ চেষ্টাও করিত না।

কিন্তু দক্ষতা যতই থাকুক না কেন, পুঁজিবাদের আওতায় অমানুষিক অবিরত শোষণের কবল হইতে শ্রমিক তবুও রক্ষা পায় না।

নূতন যন্ত্রের প্রবর্ত্তনের ফলে সাধারণত বহু সংখ্যক অতিশয় দক্ষ শ্রমিক অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। স্বীয় দক্ষতা অর্জ্জন করিতে বহু বৎসর ব্যয় করিয়াছে এমন সব দক্ষ ওস্তাদরা পূর্ব্বে যাহা উৎপন্ন করিত এখন তাহা যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়। দক্ষ শ্রমিকদের একটা বেশ বড় অংশ প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং বেকার হইয়া পড়ে। অনাহারে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাহারা অনেক কম মজুরীতে দক্ষতাবিহীন শ্রম করিতে বাধ্য হয়।

বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে মজুরীর মান এক নয়। বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যের কারণ বহুবিধ।

বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে মজুরীর মান

এক দেশের পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের সহিত তাহাদের সম্পর্কের ব্যাপারে অন্য দেশের পুঁজিপতিদের অপেক্ষা সহৃদয়, এমন কথা মনে করাই হাস্যকর। প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বত্রই পুঁজিপতিরা যত দূর সম্ভব নিম্নতম সীমায় মজুরী নামাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের অবস্থায় যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ইতিহাস। যেমন আমেরিকার পুঁজিতন্ত্র এমন অবস্থার মধ্যে বিকশিত হইয়াছে যাহাতে শ্রমিকের বাহুল্য অপেক্ষা অভাবই অনুভূত হইত: অনধিকৃত জমির প্রাচুর্য্য ইয়োরোপীয় দেশসমূহের দেশত্যাগীদের পক্ষে জমিতে বসবাসের সুযোগ দিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত পুরাতন পুঁজিবাদী দেশসমূহে শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিপতিদের বাধা দেওয়ার জন্য পূর্ব্বেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। অধিকতর অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশসমূহে শ্রমের তীব্রতা এবং শ্রমিকের গড়পড়তা (সাধারণ) দক্ষতার মান অত্যন্ত উচ্চ।

এই সব অবস্থার ফলে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে মজুরীর বিভিন্ন মান সৃষ্টি হইয়াছে।

যদি উদাহরণ স্বরূপ ইংলণ্ডের মজুরীকে ১০০ ধরা যায়, তবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে অন্যান্য অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশসমূহে মজুরী (ঘণ্টানুযায়ী গড়পড়তা হার) নিম্নলিখিত রূপ ছিল:

ইংলণ্ড	১০০	ফ্রান্স	৬৪
জার্মানি	৭৫	যুক্তরাষ্ট্র	২৪০

অন্ত হিসাব অনুযায়ী শ্রমিকদের গড়পড়তা বাৎসরিক মজুরী (১৯০০-১৯০৭) ছিল :

যুক্তরাষ্ট্র	১৩৮৯ টাকা	অষ্ট্রীয়া	৫০১ টাকা
ইংলণ্ড	৭৭৪ "	রুশিয়া	২৯১ "
জার্মানি	৭১১ "	জাপান	১৬৫ "

যুদ্ধোত্তর কালে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে মজুরীর হারে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। প্রধান প্রধান দেশের বড় বড় শহরে **প্রকৃত** মজুরীর পার্থক্য নির্দ্দেশকারী সংখ্যা এখানে দেওয়া হইল। নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের অবস্থা নির্দ্দেশ করে। লণ্ডনের ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের প্রকৃত মজুরীর মানকে ১০০ ধরিয়া এই হিসাব তৈরী করা হইয়াছে।

ফিলাডেলফিয়া	২০৬	বার্লিন	৭৭
ডাবলিন	১০৬	মাদ্রিদ	৫৭
লণ্ডন	১০৫	ব্রুসেল্স্	৫২
স্টকহ্ম	৯৩	মিলান	৫০
আম্স্টারডাম	৮৮	রোম	৪৪

দেখা যায় যে, যে-সব দেশে পুঁজিবাদ সম্প্রতি মাত্র বিকশিত হইয়াছে, সেই সব দেশেই মজুরীর হার বিশেষ ভাবে নিচু। এই সব দেশে আদিম সঞ্চয় কৃষক ও কারিগরদিগকে কর্ম্মপ্রার্থী বেকার বাহিনীর পর্য্যায়ে নামাইয়া ধ্বংস করে। উপনিবেশগুলিতে সর্ব্বহারাদের জীবন যাপনের মান অত্যন্ত নিচু। বিশেষ করিয়া চীন দেশের শ্রমিকেরা নিতান্ত অমানুষিক ভাবে শোষিত হয়। চীন দেশের শ্রমিক এক মুঠি ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, প্রায়ই রাস্তায় বা সরকারী পার্কে ঘুমায় এবং ছেঁড়া নেকড়ায় লজ্জা নিবারণ করে বলিয়া পুঁজিপতিদের নজরে

সে-ই হইল সারা দুনিয়ার আদর্শ শ্রমিক। অধিকতর নির্লজ্জ পুঁজিপতিরা ইয়োরোপীয় শ্রমিকদের চীনা শ্রমিককে আদর্শ রূপে গ্রহণ করিতে, তাহার মত 'মিতব্যয়ী ভাবে' জীবন যাপন করিতে বলে। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান কালে এই প্রকার উপদেশ প্রায়ই শুনা যাইতেছে।

পুঁজিবাদী শোষণের বৃদ্ধি

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে **শ্রমিক শ্রেণীর উপর শোষণও** বাড়িয়া চলে। যে-অবস্থার মধ্যে শ্রমিকরা মজুরীর জন্য পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সে-অবস্থা ক্রমশ তাহাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। পুঁজিতন্ত্র আপনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক শ্রেণীর আপেক্ষিক এবং নির্ব্বিশেষ **দারিদ্র্য** সৃষ্টি করিয়া চলে।

পুঁজিপতিদের অংশ বাড়ে আর শ্রমিকদের অংশ কমিতে থাকে। কতিপয় পুঁজিবাদী দেশের হিসাব দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইংলণ্ডের বিষয় দেখা যাক। যদি আমরা দেশের মোট মূল্য (তথাকথিত জাতীয় আয়) ধরি ১০০, তাহা হইলে শ্রমিকদের প্রাপ্ত অংশের নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে:

বৎসর	জাতীয় আয়ের পরিমাণ (১০ লক্ষ টাকার সংখ্যায়)	মজুরীর পরিমাণ (১০ লক্ষ টাকার সংখ্যায়)	জাতীয় আয়ে শ্রমিকদের অংশ (শতকরা)
১৮৪৩	৭৭২৫	৩৫২৫	৪৫·৬
১৮৬০	১২৪৮০	৫৮৮০	৪৭·১
১৮৮৪	১৯১১১	৭৮১৫	৪১·৪
১৯০৩	২৫৬৫০	৯৮২৫	৩৮·৩
১৯০৮	২৭৬৬০	১০৫৭৫	৩৮·১

শ্রমিকের অংশ ক্রমাগত **কমিয়াছে**।

সেই সময়েই অবশ্য দেশের জাতীয় আয়ে পুঁজিপতিদের অংশ অবিরত বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমিক শ্রেণী যাহা হারায় পুঁজিপতিরা তাহাই লাভ করে।

গত মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পূর্ব্বে লিখিত একটি প্রবন্ধে লেনিন শ্রমিক শ্রেণীর দুস্থতা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া নিম্নলিখিত সংখ্যাসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৮০ এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানিতে মজুরী বৃদ্ধি পাইয়াছিল গড়পড়তা শতকরা ২৫ ভাগ। পক্ষান্তরে এই সময়ে জীবন ধারণের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ। জার্মানিতে সাংস্কৃতিক মান ছিল উচ্চ ; ধর্ম্মঘটের স্বাধীনতা, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা এবং আপেক্ষিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা সেখানে ছিল ; মজদুর ইউনিয়নের সদস্য-সংখ্যা আর শ্রমিক সংবাদপত্রের পাঠক ছিল লক্ষ লক্ষ ; শ্রমিকদের অবস্থা ছিল সেখানে অনেক উন্নত ; বিপ্লবের আগের রুশিয়ার শ্রমিকদের অবস্থার সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না ; তবুও লেনিন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে খাস জার্মানির মত এমন একটা সমৃদ্ধ অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশেই এই ঘটনাটি সংঘটিত হইল। ইহা হইতে লেনিন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঃ

"শ্রমিককে **নির্ব্বিশেষে** নিঃস্ব করা হয় অর্থাৎ পূর্ব্বের অপেক্ষা সে দরিদ্রতর হইয়া পড়ে, নিকৃষ্ট অবস্থায় বাস করিতে বাধ্য হয়, অধিকতর অপ্রচুর খাদ্য খায়, অর্দ্ধভুক্ত হইয়া পড়ে, মাটির নিচের কুঠুরী বা চিলে কোঠায় আশ্রয় খোঁজে। দ্রুত-সমৃদ্ধিশালী পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকের আপেক্ষিক অংশ ক্রমাগতই হ্রাস পাইতেছে, কারণ কোটিপতিরা সততই দ্রুততর গতিতে সম্পদশালী হইতেছে ···। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক সাধারণের দারিদ্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অচিন্তনীয় দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় সম্পদ।" *

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ১৬শ খণ্ড, 'পুঁজিবাদী সমাজে দারিদ্র্য', রুশ সংস্করণ, পৃঃ ২১২।

পৃথিবীর যে-সব সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদশালী পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিপতিরা উপনিবেশ হইতে প্রচুর লাভের দরুন শ্রমিকদের কিছুটা সুবিধা দিতে পারে সেখানেই এইরূপ অবস্থা। অবশ্যই অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশে, উপনিবেশে যেখানে সহজে মুনাফা লাভের জন্য পুঁজি রপ্তানি করা হয়, সেখানে শ্রমিকদের উপর শোষণ **আরও দ্রুত গতিতে** বাড়িয়া চলে।

এইরূপে দেখা যায় যে পুঁজিবাদী শোষণ অবিরত বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই বিস্তৃত এবং গভীরতর হইয়া উঠে। সকল দেশের সুবিধাবাদীরা সামাজিক বৈপরীত্য বা বিরোধের হ্রাস, শ্রেণীসমূহের মধ্যে বেসামরিক বা সাধারণ ঘরোয়া শান্তির আবশ্যকতা, এমন কি, পুঁজিতন্ত্রের অধীনে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনবরত বলিয়া বেড়ায়। শ্রমিক শ্রেণী অবশ্য কেবলমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর মুনাফার অপরিমেয় বৃদ্ধির তুলনায় আপেক্ষিক হিসাবেই দরিদ্রতর হয় না, নির্ব্বিশেষ ভাবেও দরিদ্রতর হয়। এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদশালী পুঁজিতন্ত্রী দেশসমূহেও শ্রমিকদের খাদ্য ক্রমাগত নিকৃষ্টতর হয়। তাহারা আরও জনাকীর্ণ পল্লীতে বাস করে, ক্রমাগত অধিকতর অভাব ভোগ করে। সেই সঙ্গে শ্রমিকদের শ্রমের তীব্রতা অবিরত বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্বের তুলনায় শ্রমিককে প্রতি ঘণ্টার কাজের জন্য অধিক শক্তি ব্যয় করিতে হয়। শ্রমের অত্যধিক তীব্রতা ও অনবরত তাগিদের ফলে শ্রমিকের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতি সত্বর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং শ্রেণীবিরোধের হ্রাস সম্পর্কে কোন কথাই উঠিতে পারে না; উপরন্তু এই সব বৈপরীত্য বা বিরোধ অনবরত তীব্রতা লাভ করে, অবশ্যম্ভাবী রূপে বৃদ্ধি পায়।

পুঁজিতন্ত্রের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া তথাকথিত

'শ্রমের মজুত বাহিনী' সৃষ্টি করে, শিল্প প্রসারণের প্রয়োজন হইলে অথবা পুরাতন শ্রমিকরা পূর্ব্বতন শর্ত্তে কাজ করিতে আর রাজী না হইলে পুঁজিপতিরা এই বাহিনী হইতে শ্রমিক জোগাড় করিতে পারে। দেখা যাক ইহা কিরূপে ঘটে।

বেকারী ও শ্রমের মজুত বাহিনী

সূচনাতেই পুঁজিবাদ সম্ভাব্য মজুরী-শ্রমিকদের এক প্রচুর বাজার পায়। এই সরবরাহ আসে ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষক, কারিগর এবং হস্তশিল্পীদের মধ্য হইতে। ইহারা সবাই উৎপাদনের উপকরণসমূহ হারাইয়াছে। অস্তিত্ব বজায় রাখিবার মত উপকরণ দিলেই ইহারা পুঁজিপতির জন্য কাজ করিতে সম্মত। একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্বাধীন (বেকার) শ্রমিক সর্ব্বদাই মজুত থাকা প্রয়োজন। মজুরী-শ্রমিকের শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী শিল্পের উদ্ভব কেবল এই অবস্থাতেই হইতে পারে।

পুঁজিবাদের আরও বিকাশ কোথায় গিয়া পৌছায়? ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, পুঁজিতন্ত্র তাহার উন্নতি ও প্রসার লাভের সময়ে প্রতিযোগিতার দ্বারা কারিগর এবং হস্তশিল্পীর ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনকে ধ্বংস করে। কৃষকরাও উচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহাদের অনেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পুঁজিপতির দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়। নূতন নূতন শ্রমিক নিয়োজিত করিয়া পুঁজিবাদী শিল্প বাড়িয়া উঠে। নূতন কল-কারখানা স্থাপিত হয়। ক্ষুদ্রাকার উৎপাদকদের উৎসন্ন করিয়া পুঁজি তাহাদের মজুরী-শ্রমিক রূপে নিজের কবলে টানিয়া আনে।

এই সঙ্গে কিন্তু আরও একটি ঘটনা দেখা যায়। পুঁজিতন্ত্রের আওতায় উৎপাদন-ক্ষেত্রে যান্ত্রিক উন্নতি নিয়ত চলিতেছে। এই উন্নতির অর্থ কী? নূতন আবিষ্কারসমূহের গুরুত্ব কোথায়? গুরুত্ব

হইতেছে এই যে, মানুষের শ্রমের স্থান যন্ত্রের কাজের দ্বারা পূরণ হওয়ায় উৎপাদন সস্তা হয়। অতএব যান্ত্রিক উন্নতির ফলে একই পরিমাণ পণ্য উৎপাদনের জন্য কম সংখ্যক শ্রমিক প্রয়োজন হয়। যন্ত্র শ্রমিককে অপসারিত করে। যন্ত্র শ্রমিককে আরও তীব্র ভাবে কাজ করিতে বাধ্য করে। ইহার ফলেও শ্রমিক শ্রেণীর একটা অংশ বেকার হইয়া পড়ে। তাই পুঁজিতন্ত্রের প্রারম্ভে প্রকৃত শত্রু কে তাহা বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় শ্রমিকরা যন্ত্রের উপর আঘাত করিয়া তৎকালীন অবস্থার বিরুদ্ধে তাহাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করিত। যন্ত্রপাতিকেই নিজেদের শোচনীয় অবস্থার মূল কারণ মনে করিয়া শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট ও বিক্ষোভের সময় সর্ব্বপ্রথম ধ্বংস করিত যন্ত্রপাতি।

যন্ত্রের দ্বারা শ্রমিক অপসারণ

নূতন যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তন করিয়া এবং তাহার ফলে অপসারিত শ্রমিকদিগকে পথে বসাইয়া পুঁজিপতিরা নিয়ত বেকার সৃষ্টি করিতেছে।

শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়াও তাহারা বেকারের সংখ্যা বাড়াইতেছে। শ্রমিকদের একটা অংশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইয়া পড়ে। এই শ্রমিকেরা তাহাদের শ্রমের চাহিদা খুঁজিয়া না পাইয়া গড়িয়া তোলে এক বেকার শ্রমিক বাহিনী। এই বাহিনীর গুরুত্ব বাস্তবিকই অত্যন্ত বেশী। শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্থায়ী বেকার বাহিনীর অস্তিত্ব পুঁজিপতিদের একটি শক্তিশালী অস্ত্র। বেকারেরা সাধারণত যে-কোনো শর্ত্তে কাজ করিতে ইচ্ছুক। অনাহারে মৃত্যুর আশঙ্কায় তাহাদের উপায়ান্তর থাকে না। কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানকে এমনি করিয়াই বেকারেরা নিম্নাভিমুখে টানিতে থাকে। মজুত বেকার বাহিনীর অপর গুরুত্ব হইল এই যে, বাজারের অবস্থা শিল্পবিস্তৃতির অনুকূল হইলে কাজ করার শ্রমিকের অভাব হয় না। তাহাতে হাজার

হাজার বেকার কাজ পায়, কল-কারখানাসমূহে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বেকারের সংখ্যা সাময়িক ভাবে হ্রাস পায়। কিন্তু নূতন উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ আবার হাজার হাজার শ্রমিককে পথে বসাইয়া থাকে।

এই রকম করিয়া পুঁজিবাদ এক হাতে উচ্ছন্ন ক্ষুদ্র উৎপাদক শ্রেণী হইতে আগত নূতন শ্রমিকদের কাজ দিতেছে, এবং অন্য হাতে পুঁজিবাদী যান্ত্রিক উন্নতির ফলে যন্ত্রের দ্বারা অপসারিত হাজার হাজার শ্রমিকের গ্রাস হইতে শেষ খাদ্যকণা পর্য্যন্ত ছিনাইয়া লইতেছে।

পুঁজিবাদী অগ্রগতির ফল স্বরূপ যন্ত্রের দ্বারা নিয়ত এই শ্রমিক অপসারণ পুঁজিবাদী দেশসমূহে 'আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা' সৃষ্টি করিয়া

পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়ম

বসে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইবার ফলে কাজ পাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা না থাকায় লক্ষ লক্ষ লোক নিজের দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে এই অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। এই স্বদেশত্যাগীরা যে-সমস্ত দেশে যাইত সেই সব দেশের দরজাও বন্ধ হইয়াছে, সে-সব দেশে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

শ্রমসংক্রান্ত মজুত বাহিনীর ক্রমবর্দ্ধমান অস্তিত্ব শ্রমিক শ্রেণীর সমগ্র অবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। দারিদ্র্য বাড়িয়া চলে, আগামী কল্যের অনিশ্চয়তা নৈত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, মজুরী হ্রাস পায়। নিজের শ্রমের দ্বারা উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন করে শ্রমিক শ্রেণী; কিন্তু সে-উদ্বৃত্ত মূল্য যায় পুঁজিপতি শ্রেণীর পকেটে। শ্রমিক শ্রেণীর নিকট হইতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশ পুঁজিপতিরা ভোগ করিয়া নষ্ট করে, অবশিষ্টাংশ তাহাদের মূল পুঁজির সহিত যোগ করে। পুঁজিপতির মূল পুঁজি যদি ৩ লক্ষ টাকা হয়, এবং বৎসরে

সে যদি ৬০ হাজার টাকা মুনাফা রূপে শ্রমিকের নিকট হইতে নিংড়াইয়া আদায় করিয়া লইতে সমর্থ হয়, তবে সে ইহার প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ তাহার পরবর্ত্তী বৎসরের মূল পুঁজিতে যোগ করিবে। এই ক্ষেত্রে তাহার পরবর্ত্তী বৎসরের মূল পুঁজির পরিমাণ হইবে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। সে তাহার পুঁজি বাড়াইয়াও ৩০ হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছে। সুতরাং পুঁজি সঞ্চয়ের অর্থ হইল পুঁজির সহিত উদ্বৃত্ত মূল্যের যোগ। উদ্বৃত্ত মূল্য সঞ্চয়ের ফল স্বরূপ পুঁজির এইরূপ বৃদ্ধি বিশেষ বিপুল ও ব্যাপক। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ নিয়তই বাড়িয়া চলে। পুঁজিপতিদের সঞ্চিত উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বাড়িয়া বাড়িয়া তাহাদের পুঁজি বৃদ্ধি করে।

পুঁজির সঞ্চয় এমনি করিয়াই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া তোলে। শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্য শোষকদের শক্তি-বৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠে। পুঁজির সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকদের উপর শোষণের মাত্রা বাড়িতে থাকে। পুঁজিতন্ত্রের আওতায় এইরূপ ভাবেই নিজের শ্রমের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণী এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া বসে যাহাতে তাহাদের নিজেদের উপর শোষণের মাত্রাই ক্রমাগত বাড়িতে থাকে।

পুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর জীবন যাপনের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইতে থাকে। তাহাদের উপর শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

এই সমস্তই পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল। পুঁজিপতি যত বেশী পুঁজি সঞ্চয় করে, যত বেশী উৎপাদন সম্প্রসারিত করে, নূতন যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তন করে, শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য ও বেকার অবস্থাও ততই বেশী ব্যাপক হইয়া উঠে।

পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের এই সাধারণ নিয়ম মার্ক্স্ আবিষ্কার করিয়াছেন। পুঁজিবাদ কী তাহা বুঝিবার জন্য, পুঁজিবাদের বিকাশের ধারা কী তাহা জানিবার জন্য এই সাধারণ নিয়মের যথেষ্ট তাৎপর্য্য আছে।

পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে মার্ক্স্ নিম্নলিখিত রূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন :

"সামাজিক সম্পদ, কার্য্যকরী পুঁজি ও তাহার বৃদ্ধির ব্যাপকতা আর শক্তি, এবং সেই জন্য সর্ব্বহারার নির্ব্বিশেষ সংখ্যা ও তাহার শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা যতই বেশী হইবে, বেকার শ্রমিক বাহিনীও ততই বিরাট ও বৃহৎ হইবে। যে-সমস্ত কারণে পুঁজির প্রসারের ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে, তাহাই আবার পুঁজির আয়ত্তাধীন শ্রমশক্তিকেও বিকশিত করে। সুতরাং সম্পদের সম্ভাব্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গে বেকার শ্রমিক বাহিনীর আপেক্ষিক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কার্য্যরত শ্রমিক বাহিনীর অনুপাতে এই মজুত বাহিনী যতই বড় হইবে, স্থায়ী উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইবে। ইহাদের দুর্দ্দশা ও শ্রমের যন্ত্রণা বিপরীত অনুপাতে (in inverse ratio) বাড়ে কমে। পরিশেষে, শ্রমিক শ্রেণীর ভিক্ষোপজীবী অলস অংশ এবং বেকার শ্রমিক বাহিনী যতই ব্যাপক হইবে, প্রকাশ্য ভিক্ষাবৃত্তি ততই বৃদ্ধি পাইবে। **ইহাই পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের নির্ব্বিশেষ সাধারণ নিয়ম**।" *

এই নিয়ম সম্পর্কে মার্ক্স্ আরও বলেন :

"পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমের সামাজিক উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির সকল পদ্ধতিই ব্যক্তিগত শ্রমিকের ব্যয়ে গড়িয়া উঠে; উৎপাদনের উন্নতির সকল উপকরণ উৎপাদকদের উপর প্রভুত্ব ও শোষণ

* মার্ক্স্ঃ 'ক্যাপিটাল,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫৯-৬০।

চালনার উপকরণে রূপান্তরিত হয়; শ্রমিকের সর্ব্বাঙ্গীণ অবনতি ঘটে, শ্রমিক মানুষের অপভ্রংশে পরিণত হয়, যন্ত্রের একটি লেজুড়ের পর্য্যায়ে সে অধঃপতিত হয়। শ্রমিকের কাজের আনন্দ নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া ঘৃণিত পরিশ্রমে পরিণত হয়। শ্রম-পদ্ধতিতে বিজ্ঞান যে-পরিমাণে স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে যুক্ত হইয়াছে, সেই পরিমাণে শ্রমিকদের বুদ্ধি খাটাইবার সম্ভাবনা পুঁজিতন্ত্রের ব্যবস্থায় লোপ পাইয়াছে। যে-অবস্থার অধীনে সে কাজ করে সে-অবস্থার বিকৃতি ঘটে; শ্রম-প্রক্রিয়ায় শ্রমিককে অতি-ঘৃণ্য হীন যথেচ্ছচারিতার কবলে পড়িতে হয়। তাহার জীবিত কালকে শ্রমের সময়ে পরিণত করা হয়…। কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের পদ্ধতিগুলিই হইল সঞ্চয়েরও পদ্ধতি। আবার সঞ্চয়ের প্রত্যেকটি সম্প্রসারণও ঐ সব পদ্ধতির উন্নতির উপায়ে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যে-অনুপাতে পুঁজি সঞ্চিত হয় শ্রমিকের ভাগ্য (তাহার মজুরী বেশীই হউক বা কমই হউক) সেই অনুপাতে অবশ্যই খারাপ হইবে। পরিশেষে যে-নিয়ম সর্ব্বদা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা বা বেকার শ্রমিক মজুত বাহিনী এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ ও শক্তির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে, সেই-ই আবার শ্রমিককে পুঁজির সহিত দৃঢ় ভাবে গাঁথিয়া দেয়।…পুঁজি-সঞ্চয়ের অনুরূপ দুঃখ-দুর্দ্দশার সঞ্চয়ও ইহা গড়িয়া তোলে। সুতরাং, এক প্রান্তে সম্পদ সঞ্চয়ের অর্থ হইতেছে সেই সময়ে অপর প্রান্তে অর্থাৎ যে-শ্রেণী পুঁজির আকারে নিজের উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে তাহারই কাঁধে দুর্দ্দশা, শ্রমের যন্ত্রণা, দাসত্ব, অজ্ঞতা, বর্ব্বরতা ও মানসিক অবনতির পাষাণভার জমিয়া উঠে।” *

* ঐ, পৃঃ ৬৬০-৬১।

এইরূপে দেখা যায় যে পুঁজি যে-অনুপাতে সঞ্চিত হয়, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থাও অবশ্যই সেই অনুপাতে খারাপ হয়। সর্ব্বহারার অবস্থার এই সাধারণ অবনতি কেবল মজুরী হ্রাসের জন্যই হয় নাই; বেকার সমস্যা বিস্তার লাভ করে এবং বেশ সচরাচর ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেকটি শ্রমিকের উপর, শ্রমিক পরিবারের প্রত্যেক সভ্যের উপর প্রায়ই ইহার ফল দেখা যায়। শ্রমিকের শ্রম আরও তীব্র হয়, এবং তাহারই ফলে শ্রমিক সত্বরই জরাজীর্ণ হইয়া প্রায়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান-গুলি হইতে শ্রমিকদের বরখাস্ত করিবার বয়স ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে।

শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রমিক গোষ্ঠীকে হাত করিয়া পুঁজি তাহাদের বিশ্বস্ত গোলামে পরিণত করে। সর্ব্বহারাদের ভিতর হইতে এক বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত উচ্চ স্তরের সৃষ্টি হয়—শ্রমিকদের এক অভিজাত সম্প্রদায়। শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাধিক অংশের উপর অধিকতর বর্ব্বরোচিত শোষণ চালাইয়া পুঁজিপতিরা উপনিবেশ হইতে সংগৃহিত অপরিমিত মুনাফার ভাণ্ডার হইতে দক্ষ শ্রমিকদের গোষ্ঠী বিশেষকে অধিক মজুরী দিয়া থাকে।

শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা বেশী মজুরী পায় তাহাদের এক প্রধান অংশ কিন্তু সর্ব্বদাই নিরাপত্তার অভাব ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা বোধ করে। পুঁজিতন্ত্র অবশ্যম্ভাবী রূপে তাহাদের অবস্থাও উত্তরোত্তর অবনতির দিকে টানিয়া নামায়।

শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য **সঙ্কটের** সময়ে চরম অবস্থায় উপনীত হয়। পুঁজিবাদের যাবতীয় অসঙ্গতি সঙ্কটের সময়ে প্রকাশ পায় এবং

তীব্র হইয়া উঠে। সর্ব্বহারা দারিদ্র্যের নিম্নতম পর্য্যায়ে অধঃপতিত হয়।

সঙ্কটের অবস্থায় শ্রমিকের দারিদ্র্য ও বেকারী

প্রত্যেক সঙ্কটে উৎপাদন হ্রাস করা প্রয়োজন হয়, ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে পথে বসিতে হয়। যাহারা কাজে নিযুক্ত থাকে তাহাদেরও মজুরী হ্রাস পায়।

পুঁজিবাদ আজ পর্য্যন্ত যত সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, বর্ত্তমান সঙ্কট তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ ও তীব্র। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মুমূর্ষু এবং জীবন্তেই ক্ষয় পাইতেছে এবং কোটি কোটি জনসাধারণকে অভূতপূর্ব্ব নির্য্যাতনের কবলে ফেলিয়া দিতেছে। বেকারদের সংখ্যার অনুপাত সাংঘাতিক রকমে বাড়িয়া উঠিয়াছে। বেকারের সঙ্গে সেই বিরাট বাহিনীকেও যোগ করিতে হইবে যাহারা আংশিক সময় কাজ করিয়া তদনুযায়ী নিতান্ত সামান্য মজুরী পায়।

কোনো রকম ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সকল পুঁজিবাদী দেশেই বর্ত্তমান সঙ্কটের দরুন মজুরী প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সঙ্কটের সমস্ত ভার শ্রমিক শ্রেণীর ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টায় বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের মজুরী কমাইতে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। শ্রমিকদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব পূরণও অসম্ভব করিয়া তাহাদের ভিক্ষুকের পর্য্যায়ে নামাইয়া আনে। এমন কি, সর্ব্বাপেক্ষা ধনী পুঁজিবাদী দেশেও শ্রমিক শ্রেণীর জীবন যাপনের মান অবিশ্বাস্য রূপে নামিয়া গিয়াছে।

অনেক ঘটনাই ইহার সাক্ষ্য দেয়। একজন সাংবাদিক ইংলণ্ডের খনি-মজুরদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন:

"দক্ষিণ ওয়েল্‌স্ বা ডারহামের কোনো শ্রমিকের ঘরে গেলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে সুদিনে যে-সব আসবাবপত্র সে

কিনিয়াছিল তাহার সমস্তই সে বেচিয়া ফেলিয়াছে। বাড়ীর ভাড়া দেওয়ার সুবিধার জন্য একজন অতিথি বা বোর্ডার্ (যে-লোক অন্যের সহিত খায় এবং সে-জন্য তাহাকে খোরাকী দেয়) রাখিয়াছে। কিন্তু খুব সম্ভব এই বোর্ডারটির চাকুরী গিয়াছে বলিয়া সে এক কপর্দ্দকও দিতে পারে না। পরিবারের পিতার কাজ থাকিলে পুত্র নিশ্চয়ই বেকার; অথবা, পুত্রের কাজ থাকিলে পিতা বেকার। বন্ধক দিবার মত যাহা কিছু ছিল সমস্তই গিয়াছে। নিজের জন্য, পত্নী বা পুত্রের জন্য কাপড়-চোপড় কিনিয়া বিলাসিতা করিতে পারে এমন খনি-মজুর একজনও নাই। পুরাতন ছেঁড়া ন্যাকড়া কিনিয়া যা তাহাতে কোনো রকমে তালি লাগাইয়া দিলে তবেই তাহাদের পক্ষে কাপড় বদলানো সম্ভব হয়।"

এক সময়ে নিজেদের দেওয়া চাঁদায় খনি-মজুরদের বাসপল্লীতে গ্রন্থাগার ও নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রন্থাগার বর্ত্তমানে আর পুস্তকাদি কিনিতে পারে না, নাট্যশালা উঠিয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডে শিল্পের অন্যান্য কোনো কোনো শাখায় মজুরদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ল্যাঙ্কাশায়ারের বয়ন-শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা আরও নৈরাশ্যজনক।

পুরা মাত্রায় কাজ করিয়াও (অর্থাৎ প্রত্যেক তাঁতী ৪ খানা করিয়া তাঁত চালাইয়াও) একজন তাঁতীর সাপ্তাহিক মজুরী গত কয়েক বৎসরে গড়পড়তা তেইশ টাকা দশ আনার বেশী হয় নাই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজন তাঁতী মাত্র দুইটি তাঁতে কাজ করে; ফলে, যেমন বিভার্লিতে, একজন শ্রমিকের সাপ্তাহিক মজুরী ১২ হইতে ১৫ টাকার মধ্যে ওঠা-নামা করে। তবুও আবার এই মজুরীও পাওয়া যায় কেবল

কাঁচা মাল ভালো পাইলেই। সঙ্কটের অবস্থায় মালিকেরা সকল রকমের খারাপ কাঁচা মাল ব্যবহার করে। তাই তাঁতীদের মজুরীও এই কারণে আরও হ্রাস পায়। বহু সরকারী অনুসন্ধানে সংগৃহিত তথ্যাদি ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতীদের দ্রারিদ্র্যের সাক্ষ্য দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, উইগানে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের অনুসন্ধানে প্রগাণিত হইয়াছে যে নগর-গঠন-সমিতি যে-সব ঘরবাড়ি 'মনুষ্যবাসের অযোগ্য' বলিয়া বাতিল করিয়াছে সেই রকম ঘরে শত শত মজুর বাস করে। বোল্টনেও অনুরূপ একটি কমিশন প্রমাণ করিয়াছে যে, মজুরদের আবাসগৃহের অধিকাংশই 'শহরের আবর্জ্জনা, ময়লাস্তূপ বা গোবরের পাহাড়ে বেষ্টিত গোথানার ঠিক পাশেই।'

সঙ্কটের বৎসরসমূহে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পে গড়পড়তা সাপ্তাহিক মজুরী নিম্নলিখিত রূপে হ্রাস পাইয়াছিল ঃ

খৃষ্টাব্দ			গড়পড়তা সাপ্তাহিক মজুরী (টাকায়)
১৯২৯	...	...	৮৫·৫
১৯৩০	...	...	৭৭·৪
১৯৩১	...	...	৬৭·৮
১৯৩২	...	...	৫১·৩
১৯৩৩	...	...	৫৩·১

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মজুরীর কিছু উন্নতি দেখা গেলেও তাহা কিন্তু প্রকৃত উন্নতি নয়। প্রকৃত পক্ষে এই সময়ে জীবন যাপনের ব্যয় বাহ্যিক মজুরী অপেক্ষা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অত্যন্ত কম করিয়া বলা যাইতেছে, তথন সরকারী হিসাব অনুযায়ীও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জীবন ধারণের ব্যয় শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি

পাইয়াছিল, কিন্তু শ্রমিক গবেষণা দফতরের তথ্য অনুযায়ী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়াছিল শতকরা ১৮ ভাগ।

নাৎসী জার্মানিতে শ্রমিকদের অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছে। নাৎসীরা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কার্য্যত যে কয়েদ-খানার অবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছে জার্মান মজুরদের চিঠিপত্র হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। নিম্নে উদাহরণ দেওয়া গেল। সিমেন্‌সের বিখ্যাত আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কারখানায় একটি বালিকা শ্রমিক বিদেশস্থ এক জার্মান পত্রিকায় লিখিতেছে :

> "সিমেন্‌স্‌স্টাডের ছোট কারখানাগুলির চাপকলের ঘরগুলিতে কাজের অবস্থা ভয়াবহ। সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করিয়া ফুরন কাজে মজুরী খুব বেশী উঠিলে ১৫ মার্ক (প্রায় ১২ টাকা : অনুবাদক) হয়। এমন দৃষ্টান্তও আছে যেখানে একটি মেয়ে সপ্তাহে মাত্র ৪ দিন কাজ পায় এবং এই সময়ে সর্ব্বসাকুল্যে মজুরী পায় ৯ মার্ক (প্রায় ৭৶৹ আনা)। এই প্রকার অবস্থায় জীবনধারণের জন্য মোটের উপর অবশিষ্ট থাকে মাত্র দুই মার্ক (প্রায় ১৷৶৹ আনা)। কারণ ৫ মার্ক যায় ঘর-ভাড়ায় আর ২ মার্ক যায় গাড়ী ভাড়ায়। কাজের গতিবেগ ভীতিজনক। অধিকাংশ মেয়ে মজুর ফুরন কাজের অবস্থার সহিত তাল রাখিতে পারে না। জিনিস আনা এবং ফেরত পাঠানো, কাজের কার্ডের হিসাব করা, যন্ত্রপাতির ত্রুটি সংশোধন করা, প্রাতরাশ গ্রহণ প্রভৃতির জন্য ব্যয়িত সময় হিসাবে ধরা হয় না।"

সঙ্কটের সময়ে **যুক্তরাষ্ট্রের** শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্যের মাত্রা নিম্নলিখিত সংখ্যা হইতে প্রতীয়মান হয়। সঙ্কটের বৎসরগুলিতে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের এবং তাহারা যে-মজুরী পাইয়াছিল তাহার সূচক সংখ্যা

(index number) নিম্নে দেওয়া গেল। ১৯২৩-২৫ এর-সূচক সংখ্যা = ১০০

মাস ও বৎসর	নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা	প্রদত্ত মজুরীর পরিমাণ
মে, ১৯২৯	১০৫·৩	১১২·৯
মে, ১৯৩০	৯৪·৮	৯৫·৪
মে, ১৯৩১	৮০·১	৭৩·৪
মে, ১৯৩২	৬৩·৪	৪৬·৮

এই সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, অর্থাৎ সঙ্কটের পূর্ব্বে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দের প্রায় সমান ছিল ; কিন্তু মজুরী ছিল কিছু বেশী। তারপর অকস্মাৎ ভয়াবহ ভাবে মজুরী পড়িতে আরম্ভ হইল—নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা অপেক্ষা মজুরী দ্রুত পড়িতে অর্থাৎ কমিতে লাগিল। ইহার তাৎপর্য্য—প্রদত্ত মজুরীর পরিমাণ দুই কারণে হ্রাস পায় : (১) বেকারীর দরুন এবং (২) নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরী হ্রাসের দরুণ। সঙ্কটের তিন বৎসরে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়াছিল শতকরা তিরিশ ভাগ, অথচ মজুরী কমিয়াছিল শতকরা ৬০ ভাগ। সুতরাং এই সময়ে মজুরী কাটা হইয়াছিল অর্দ্ধেক।

যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ বেকার সরকার হইতে কোনো রকম সাহায্যই পায় না। তাহাদের জীবন যাপনের অবস্থা ভয়ানক শোচনীয়। হাজার হাজার বেকার বাড়ী ভাড়া শোধ করিতে না পারিয়া আশ্রয়হীন হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, ভবঘুরে হইয়া বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে তাঁবু ফেলিয়া থাকে। বেকারদের এই সব তাঁবুর আস্তানাকে আমেরিকায় বলে 'জঙ্গল'। কালিফোর্নিয়ার স্টকটনের নিকট অবস্থিত একটি তাঁবুর আস্তানা সম্পর্কে একখানা বুর্জোয়া সাময়িক পত্রিকা নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা দিয়াছে :

"যখন আমরা তাঁবু আস্তানাটি দেখিলাম, বিভিন্ন বেকার দলের নির্ম্মিত ছাউনীগুলি হইতে তখন ধোঁয়া উঠিতেছিল। প্রত্যেক ছোট ছোট দল নিজেদের খাবার রান্না করিতেছিল। সমস্ত ব্যাপারটি ছিল অদ্ভুত বিসদৃশ : এখান হইতে এক দিকে দেখা যাইতেছিল নগরী, তাহার বিপণীরাজি, শস্যপূর্ণ শস্য-উত্তোলক যন্ত্রসারি আর অন্য দিকে দেখা যাইতেছিল পোতাশ্রয়ের (ডকের) পাশে পাশে খাদ্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ পণ্যাগার বা গুদাম ঘর আর সেইখানেই কাজ করিতে ইচ্ছুক এই লোকগুলি গুদাম ঘর হইতে নিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনার মধ্যে খাদ্য অন্বেষণ করিতেছিল। সংগৃহীত আধপচা গাজর, পেঁয়াজ বা সিম পরিষ্কার করিয়া কুড়াইয়া পাওয়া পুরাতন টিনের পাত্রে তাহারা রন্ধন করিতেছিল।"

লেখকরা দারিদ্র্যের এই বিবরণটিকে নিম্নলিখিত কথায় সমাপ্ত করিয়াছেন :

"বনেদী মার্কিনী চালে আমাদিগকে বরাবর শিক্ষা দেওয়া হয়—আমাদের দেশ স্বাধীন। প্রকৃতই স্বাধীনই বটে! চুরি, অনাহারে মৃত্যু এবং আবর্জ্জনাভুক্ জন্তুতে পরিণতি—এই তিনটির মধ্যে যে কোনো একটিকে বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা এই লোকগুলির আছে।"

বুর্জোয়া সংবাদপত্র-সেবীরা অন্য একটি পথ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সে পথ হইল—পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে সর্ব্বহারার বিপ্লবী সংগ্রাম।

অভূতপূর্ব্ব ভাবে আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি, সকল রকম ব্যাধির অসম্ভাব্য বিস্তার, অসংখ্য অনাহারজনিত মৃত্যু—অমানুষিক জীবন-যাত্রার ইহাই হইল পরিণতি। লক্ষ লক্ষ মানুষকে পুঁজি নিক্ষেপ করিয়াছে ইহারই কবলে। শিশুদের মৃত্যু এবং ব্যাধি বিশেষ করিয়া বাড়িয়া চলে।

অপেক্ষাকৃত ধনী পুঁজিবাদী দেশগুলিতেই যদি সর্ব্বহারার দারিদ্র্য এই পরিমাণ হয়, তাহা হইলে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অবস্থা আরও ভয়াবহ। এই বিষয়ে একটি জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ হইল পোল্যাণ্ড। সম্প্রতি ওয়ারশ'-এর বেকারদের ২০৪টি পরিবারের অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইয়াছে। সাম্যবাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি-সম্পন্ন নয় এমন একটি বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই অনুসন্ধানের কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। দক্ষ শ্রমিকের পরিবারেই কেবল অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। অনুসন্ধানের বিবরণ এইরূপ ঃ

> "ইহা বলিতেই হইবে যে খাদ্যের পরিমাণ খুব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনাহার হইতে বাঁচাইতে পারে এমন পরিমাণের অপেক্ষাও কম ছিল। দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল ঃ—৪ জন মানুষ লইয়া গঠিত এক ঢালাইকরের পরিবার এক সপ্তাহের খোরাকির জন্য ব্যয় করে ১২ জ্লোতি (প্রায় সাড়ে চারি টাকা—অনুবাদক)। দিনে দুই বার করিয়া তাহারা খায় আলু, বাঁধাকপি আর রুটি। মাংস বা দুধ তাহারা আদৌ কেনে না। ৬ জন লোক লইয়া গঠিত একটি দর্জির পরিবার কমিশনের পরিদর্শনের কালেও তিন দিন যাবত কিছুই খায় নাই। জ্বালানী বা কেরোসিন কিছুই তাদের ছিল না। অপর একটি ক্ষেত্রে ৪ জনের একটি পরিবার তিন সপ্তাহ যাবত রন্ধন করা কোনো খাদ্যই পায় নাই। তাহাদের খাদ্য ছিল কেবল মাত্র রুটি আর চা। একটি বেকার মজুরের পরিবার স্ত্রীর উপার্জনে চলে। স্ত্রীলোকটি রাস্তায় বিস্কুট ফেরি করে। তাহার দৈনিক উপার্জনের পরিমাণ ১-১·৫ জ্লোতি (প্রায় ১৫ সেণ্ট অর্থাৎ প্রায় নয় আনা)। দশ জনের একটি পরিবারের আয়ের ইহাই হইল একমাত্র উপায়।"

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করিয়া বিবরণীতে বলা হইয়াছে ঃ

"বেকারদের প্রধান খাদ্য হইল আলু ও বাঁধাকপি, কদাচিৎ রুটি ও চা, কখনো কখনো যবাদি শস্য, অতি কদাচিৎ ময়দার পিষ্টক ইত্যাদি অথবা শাকসব্জী। যে ২০৪টি পরিবারে অনুসন্ধান করা হইয়াছে তন্মধ্যে মাত্র ২০টি পরিবার সপ্তাহে একবার মাংস খায়।"

জামা-কাপড় সম্বন্ধে অবস্থা আরও শোচনীয়। বিবরণীতে বলা হইয়াছে ঃ

"সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অভাব অনুভূত হয় জুতা ও বহির্ব্বাস সম্পর্কে। যেমন, ৬জনের একটি রুটিওয়ালার পরিবারে কোনো রকম জুতাই নাই। বাহিরে যাইবার সময় পরিবারের পিতা তাহার পায়ে এক জোড়া জুতার তলি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া নেয়; ছেলেরা বাড়ীর বাহিরে যায় না। অপর একটি ক্ষেত্রে দুইটি ছেলের একটি মাত্র কোট। মা ছোট ছেলেটিকে পাঠশালায় পৌছাইয়া দিয়া তাহার কোট খুলিয়া লয়। তারপর দৌড়াইয়া বাড়ী আসিয়া বড় ছেলেটিকে পরাইয়া দেয়। পাঠশালা হইতে ছেলেদের বাড়ী ফিরিবার সময়েও এই একই ব্যাপার ঘটে।"

বেকারদের বাসস্থানের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে বিবরণীতে এইরূপ বর্ণনা আছে ঃ

"যে-সব বাড়ী অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিতান্ত মৌলিক প্রয়োজনসমূহও পূরণ করে না।"

এখানে কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ দেওয়া গেল ঃ

"বাসস্থান হইতেছে মাটির নিচের কুঠুরীতে। দেওয়াল বাহিয়া জল ঝরে। ঘরে ঢুকিবার চাতালের মেঝেতে সর্ব্বদাই তিন সেন্টিমিটার (প্রায় সওয়া ইঞ্চি—অনুবাদক) জল জমিয়া থাকে।

এই ঘরে তিন জন বয়স্ক লোক ও চারিটি শিশু বাস করে। অনেক ক্ষেত্রে দশ জনেরও বেশী লোক এক ঘরে থাকে। যে ৯২৯ জনকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল তাহাদের মাত্র ১৯৩ জন আলাদা বিছানায় ঘুমায়। ইহার মধ্যে ১১ জন শোয় মেঝেতে, ১৪টি শিশু ঘুমায় ছোট খাটে এবং আর ৯টি শিশু শোয় বাক্স, বেঞ্চ বা চেয়ারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই, তিন বা ততোধিক ব্যক্তি একই বিছানায় শোয়। নয়টি ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে এক বিছানায় ঘুমায় ৫ জন আর তিনটি ক্ষেত্রে একই বিছানায় শোয় এমন কি ৬ জনও।"

শিল্প-উৎপাদনের কিছু কিছু বৃদ্ধি সত্ত্বেও বর্ত্তমান বৎসরে পোল্যাণ্ডের বেকার-সংখ্যা গত বৎসরের অপেক্ষা বেশী। ১৯৩৪-এর জানুয়ারীতে শ্রমিক নিয়োগ দফতরের বিবরণীতে বেকারের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ দশ হাজার। ঐ বৎসর বসন্তকালে ছিল তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু বুর্জোয়া সংবাদপত্রের সাক্ষ্য অনুসারীও বেকারের প্রকৃত সংখ্যা ছিল পনের লক্ষেরও বেশী। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বড় বড় শিল্পে শ্রমিকদের মোট প্রদত্ত মজুরীর পরিমাণ (সরকারী বিবরণ অনুসারে) ছিল ৬১ কোটি ৭২ লক্ষ ২৬ হাজার ৯ শত টাকা আর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ছিল মাত্র ২৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩ শত টাকা। মজুরী হ্রাস পাইল শতকরা ৫৫ ভাগ। শ্রমের আট ঘণ্টা রোজ উঠিয়া গিয়াছে। কতকগুলি নূতন ফাশিস্ট আইনের ফলে বেকারী ও স্বাস্থ্যবীমার ক্ষেত্রে, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি বিষয়ে শ্রমিক শ্রেণী তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত স্বল্প সুযোগ-সুবিধা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে।

পুঁজিবাদী সুসংহতকরণ (rationalization) অর্থাৎ নির্ম্মম রক্ত জল-করা ব্যবস্থা সরকারের অনুমোদন পাওয়ায় মালিকরা কারখানায় এবং খনিতে সে-ব্যবস্থা করিয়াছে। ফলে আকস্মিক দুর্ঘটনা

অভূতপূর্ব্ব ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে ১৯২৭ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সরকারী হিসাব অনুযায়ী এক খনি-শিল্পেই ১০৩৯ জন খনিমজুর নিহত হয়, ৭৪৭১ জন ভীষণ রকমে জখম এবং ৯৭৩৩১ জন সাধারণ ভাবে আহত। এই সময়ে খনিশিল্পে কর্ম্মরত মজুরের সংখ্যা ছিল কিঞ্চিদধিক এক লক্ষ।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জাপানের কয়লাশিল্পের একজন পুরুষ মজুরের দৈনিক মজুরী ছিল ১·৭২ ইয়েন (জাপানী মুদ্রা—অর্থাৎ প্রায় ২।৵) আর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ১·১১ ইয়েন (বা ১৸০ আনা)। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে একজন নারী শ্রমিকের দৈনিক মজুরী ছিল ১·৫২ ইয়েন (বা ২।০ আনা) আর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ছিল ০·৭৩ ইয়েন (বা ১/০ আনা)। শিশুরা সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করিয়া মাসিক ৫—১০ ইয়েন (অর্থাৎ ৮৵০ হইতে ১৬।০ আনা) পায়। জাপানের বয়নশিল্পে বালিকারা প্রায়ই দৈনিক ১৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাজ করে। ইহার জন্য তাহারা পায় কারখানার বস্তিতে থাকিবার জায়গা আর প্রতি সপ্তাহে দুই টাকা হইতে তিন টাকা চারি আনা মাত্র।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একখানি জাপানী সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হয়।

> "দশটি বালিকার একটি ক্ষুদ্র দলকে পুলিস আটক করিল। শীত সত্ত্বেও তাহারা গ্রীষ্মের পোশাকে ইতস্তত ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে একটি বয়ন কারখানা হইতে তাহারা পালাইয়া আসিয়াছে। কারণ একাদিক্রমে পনের ঘণ্টা রোজের এই নির্ম্মম অত্যাচার এবং শোচনীয় অবস্থা তাহারা আর সহ্য করিতে পারে নাই। তাহাদিগকে কারখানায় ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দেওয়ায় বালিকারা উত্তর করিয়াছিল—তাহারা বরং মরিবে।"

উক্ত ঘটনার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। অনুরূপ সংবাদ জাপানী পত্রিকায় প্রায়ই মেলে।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। অন্যান্য পণ্যের মূল্য হইতে শ্রমশক্তির মূল্যের পার্থক্য কোথায়?

২। মজুরী পদ্ধতি কি করিয়া পুঁজিবাদী শোষণকে ঢাকিয়া রাখে?

৩। পুঁজিতন্ত্রের অধীনে ট্রেড ইউনিয়নের সংগ্রামের গুরুত্ব কি?

৪। কোন কোন অবস্থায় সময়ানুযায়ী কাজের ভিত্তিতে এবং ফুরন কাজের ভিত্তিতে মজুরী দেওয়া পুঁজিপতির পক্ষে সুবিধাজনক?

৫। বিভিন্ন দেশের মজুরীর হারের পার্থক্য কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

৬। শ্রমের মজুতবাহিনীর উৎপত্তির কারণ কি?

৭। পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের সাধারণ নিয়মের পরিণতি কি?

৮। পুঁজিতন্ত্রের অধীনে শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্যের কারণ কি?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুঁজিপতিদের মধ্যে উদ্বৃত্ত মূল্যের বণ্টন

আমাদের বিশেষ করিয়াই জানা আছে যে কেবলমাত্র শ্রমিকের শ্রমের দ্বারাই উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সব প্রতিষ্ঠানই সমান সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করে না। অধিকিন্তু যে-প্রতিষ্ঠান সর্ব্বাধিক পুঁজি নিয়োগ করে সেই প্রতিষ্ঠানেই সব সময় অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করা হয় না। দুইজন পুঁজিপতির কথা ধরা যাক। প্রত্যেকরই পুঁজির পরিমান সমান—৩০লক্ষ টাকা। আধুনিকতম সাজসরঞ্জামে একজন একটি বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছে। অপর ব্যক্তি খুলিয়াছে একটি প্রস্তর খনি। দৈহিক শ্রমই এক্ষেত্রে বেশী প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানায় মাত্র ৫০জন শ্রমিক নিয়োগ করা হইয়াছে, পক্ষান্তরে প্রস্তর খনিতে নিয়োগ করা হইয়াছে ৫০০জন। ইহাতে প্রশ্ন উঠে: বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানার মালিক অপেক্ষা প্রস্তর খনির মালিক কি দশগুণ বেশী মুনাফা লাভ করে?

মুনাফা-হারের সমতা সাধন

আমরা জানি যে, পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদনের লক্ষ্য হইতেছে **মুনাফা করা**। (সমান পুঁজি খাটাইয়া) প্রস্তর খনির কাজ যদি বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানার অপেক্ষা অধিক মুনাফাজনক হইত, তবে খনি-ব্যবসায়ে যোগ দিতে রাজী এমন বহু ভাগ্যান্বেষী মিলিত। পক্ষান্তরে অল্প লোকই বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানায় পুঁজি খাটাইতে চাহিত। কিন্তু ইহার ফল যাহা হইত তাহা আমরা জানি: খনির পাথরের

দাম কমিত আর বৈদ্যুতিক শক্তির দাম বাড়িত। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে দামের এই সব কমা-বাড়ার সীমা কতদূর?

মনে করা যাক যে দাম এইরূপ ভাবে অদলবদল করা হইয়াছে যাহাতে উভয় প্রতিষ্ঠানের সমান মুনাফা লাভ হয়। আরও কি দাম বদলাইবে? নিশ্চয়ই নয়। সুতরাং বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানার কোনো মালিক প্রস্তরখনির ব্যবসায়ে যাওয়া আর লাভজনক মনে করিবে না। উভয় প্রতিষ্ঠানেরই সমান সুবিধা।

পুঁজিবাদী শিল্প একটি বা দুইটি প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত নয়, বহু সংখ্যক ছোট বড় কারখানা ইত্যাদি লইয়া গঠিত। ইহাদের প্রত্যেকটিতে নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ অবশ্যই বিভিন্ন। **আঙ্গিক গঠনে** অর্থাৎ স্থির ও পরিবর্ত্তনশীল পুঁজির আনুপাতিক সম্পর্কে এই সব পুঁজির মধ্যেও পার্থক্য আছে। পরিবর্ত্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজি যত বেশী হইবে পুঁজির আঙ্গিক গঠনও হইবে ততই উন্নত। অপর পক্ষে, পুঁজির আঙ্গিক গঠন তখনই নিম্ন স্তরের বলা যায় যখন পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি স্থির পুঁজির অনুপাতে বেশী হয়।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানার বিশেষত্ব হইল পুঁজির উচ্চস্তরের আঙ্গিক গঠন। অপর পক্ষে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আমরা দেখিতে পাই পুঁজির নিম্নস্তরের আঙ্গিক গঠন। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিয়া থাকে? ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। যখনই বহুসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হয় অথচ ইমারত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যয় খুব বেশী নয়, তখনই আমরা পুঁজির নিম্ন স্তরের আঙ্গিক গঠন দেখিতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, রেলপথ প্রস্তুতের কাজে একজন ঠিকাদার বাঁধ প্রভৃতি তৈয়ার করিতেছে—তাহার স্থির পুঁজির পরিমাণ খুব বেশী নয়। কিছু মালটানার হাতগাড়ী,

শাবল, বেলচা প্রভৃতি সে খরিদ করে এবং ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু বহু শ্রমিক সে নিযুক্ত করে। শ্রমশক্তির ভাড়ার জন্য তাহার পুঁজির অধিকাংশ ব্যয়িত হয়।

উদ্বৃত্ত মূল্য কেবল মাত্র শ্রমিকের শ্রমের দ্বারাই সৃষ্টি হয়; তাই সেই সব প্রতিষ্ঠানকেই সর্ব্বাপেক্ষা মুনাফাজনক বলিয়া মনে হয় যে-সব প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিক গঠন নিম্ন স্তরের। কিন্তু পুঁজিপতিদের মধ্যে মুনাফার জন্য সংগ্রামের ফলে সম পরিমাণ পুঁজির উপর মুনাফা সমান হয়। নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণের সহিত পুঁজিপতির মোট মুনাফার অনুপাতকে বলে মুনাফার হার। যেমন, কোনো প্রতিষ্ঠানে ১০ লক্ষ টাকা খাটাইয়া পুঁজিপতির মুনাফা ১ লক্ষ টাকা হইলে তাহার মুনাফার হার হইল এক-দশমাংশ বা শতকরা ১০ ভাগ। পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে **সাধারণ বা গড়পড়তা মুনাফার হারের বিধির** উৎপত্তি হইয়াছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যান্য বিধির মত এই বিধিও সকলের বিরুদ্ধে সকলের সংগ্রামের অবিরাম হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে নিজেকে কার্য্যকরী করে।

পুঁজিবাদী সমাজে মুনাফার হার কিরূপে সমতা লাভ করে একটি উদাহরণের সাহায্যে তাহা দেখাইতেছি। সুবিধার জন্য আমরা ধরিয়া লইতেছি যে সমাজে মাত্র তিন দফা পুঁজি (বা পুঁজির তিনটি মণ্ডলী) আছে। প্রত্যেক পুঁজির পরিমাণ সমান, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আঙ্গিক গঠনে পার্থক্য আছে। মনে করা যাক, প্রত্যেকটি পুঁজিরই পরিমাণ ১০০ ভাগ। প্রথমটির স্থির পুঁজি ৭০ ভাগ আর পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি ৩০ ভাগ। দ্বিতীয়টির স্থির পুঁজি ৮০ ভাগ এবং পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি ২০ ভাগ। আর তৃতীয়টির স্থির পুঁজি ৯০ ভাগ এবং পরিবর্ত্তনশীল ১০ ভাগ। আরও ধরা যাক যে তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই বা

প্রতিষ্ঠান-মণ্ডলীরই উদ্বৃত্ত মূল্য একই এবং শতকরা ১০০ ভাগের সমান। ইহার তাৎপর্য্য হইল এই যে, প্রত্যেকটি শ্রমিক অর্দ্ধেক দিন কাজ করে নিজের মজুরী উপার্জ্জনের জন্য এবং অপর অর্দ্ধেক পুঁজিপতির জন্য। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান স্বীয় পরিবর্ত্তনশীল পুঁজির পরিমাণের সমান উদ্বৃত্ত মূল্য লাভ করিবে, অর্থাৎ প্রথমটিতে উদ্বৃত্ত মূল্য হইবে ৩০, দ্বিতীয়টিতে ২০ এবং তৃতীয়টিতে ১০। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপন্ন পণ্যসম্ভার যদি তাহাদের মূল্যেই বিক্রীত হয়, তাহা হইলে প্রথম প্রতিষ্ঠান পাইবে মুনাফার ৩০ ভাগ, দ্বিতীয়টি ২০ এবং তৃতীয়টি ১০। কিন্তু তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিতেই সমান পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করা হইয়াছে। প্রথম পুঁজিপতির নিকট সাদরে গ্রহণযোগ্য হইলেও এইরূপ পরিস্থিতি তৃতীয় পুঁজিপতির নিকট আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় মণ্ডলীর পুঁজিপতিদের প্রথম মণ্ডলীতে চলিয়া যাওয়াই বেশী লাভজনক। ইহারই ফলে প্রথম মণ্ডলীর পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, তাহাদিগকে দাম কমাইতে বাধ্য করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় মণ্ডলীর পুঁজিপতিদের দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা করিয়া দেয়। ফলে তিনটি মণ্ডলীটিতেই মুনাফা হইয়া পড়ে সমান।

মুনাফার হারের সমতা সাধনের এই কার্য্যপ্রণালী নিম্নলিখিত তালিকায় আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইতে পারা যায়।

পুঁজি	স্থির পুঁজি	পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি	উদ্বৃত্ত মূল্য	উৎপন্ন পণ্যের মূল্য	পণ্যের বিক্রয়-দাম	মুনাফার হার (শতকরা)
১ম	৭০	৩০	৩০	১৩০	১২০	২০
২য়	৮০	২০	২০	১২০	১২০	২০
৩য়	৯০	১০	১০	১১০	১২০	২০
মোট	[illegible]	৬০	৬০	৩৬০	৩৬০	২০

শ্রমিকদের শোষণ করিয়া যে-উদ্বৃত্ত মূল্য সংগ্রহ করা হয় তাহার পরিমাণ শুধু পুঁজির আঙ্গিক গঠনের পার্থক্যের উপরই নির্ভর করে না, **পুঁজির আবর্ত্তনের গতির** উপরও নির্ভর করে। দুইজন পুঁজিপতির পুঁজির পরিমাণ এবং সেই পুঁজির আঙ্গিক গঠন যদি সমান এবং একই হয়, তবে যাহার পুঁজির আবর্ত্তন অধিকতর দ্রুত গতিতে হয় সে অধিক উদ্বৃত্ত মূল্য নিংড়াইয়া বাহির করিতে সক্ষম হইবে। ধরা যাক, একজনের আবর্ত্তন বৎসরে একবার এবং অপরের তিনবার। ইহা প্রত্যক্ষ যে দ্বিতীয় পুঁজিপতি তিনগুণ 'জন' খাটাইয়া তিনগুণ উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করিতে সক্ষম হইবে। মোটের উপর কিন্তু সেই একই মুনাফার গড়পড়তা হারের নিয়মের দ্বারা এই পার্থক্যেরও সমতা সাধিত হয়। পুঁজিপতিদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়াই ইহা কার্য্যে পরিণত হয়।

ইহার অর্থ হইল যে পুঁজিবাদী সমাজে পণ্য তাহার মূল্যে বিক্রয় হয় না, পরন্তু বিক্রয় হয় মূল্য হইতে স্বতন্ত্র কম-বেশী দামে। পুঁজিবাদের আওতায় প্রকৃত প্রস্তাবে পণ্য বিক্রয় হয় সেই দামে যে-দাম উৎপাদনের দামের আশেপাশে উঠা-নামা করে। পণ্যের **উৎপাদনের দাম** হইতেছে উৎপাদনে ব্যয়িত পরিমাণ ও তৎসহ পুঁজির উপর গড়পড়তা মুনাফার যোগফল।

> "মুনাফা হইতেছে উদ্বৃত্ত মূল্য এবং একটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সমগ্র পুঁজির অনুপাত। উচ্চ স্তরের আঙ্গিক গঠন আছে, (অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজির সামাজিক গড়পড়তা অপেক্ষা বেশী আধিক্য) এমন পুঁজি গড়পড়তা হার অপেক্ষা কম মুনাফা দেয়; নিম্নস্তরের আঙ্গিক গঠন আছে এমন পুঁজি গড়পড়তার হার অপেক্ষা অধিক মুনাফা দেয়। পুঁজিপতিরা তাহাদের পুঁজি

উৎপাদনের শাখা হইতে শাখান্তরে নিয়োজিত করিতে পারে বলিয়া তাহাদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা মুনাফার হারকে উভয় ক্ষেত্রেই গড়পড়তায় নামাইয়া আনে। কোনো এক সমাজের সমগ্র পণ্যের মূল্যের মোট পরিমাণ সমগ্র পণ্যের দামের মোট পরিমাণের সমান; কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় প্রতিযোগিতার ফলে পণ্যসমূহ তাহাদের মূল্যানুযায়ী বিক্রয় হয় না, বিক্রয় হয় **উৎপাদনের দাম** (বা উৎপাদন-দাম) অনুযায়ী। এই উৎপাদন-দাম হইতেছে ব্যয়িত পুঁজি ও গড়পড়তা মুনাফার সমান।" *

পুঁজিবাদের আওতায় পণ্য তাহার মূল্য অনুযায়ী বিক্রী হয় না, বিক্রী হয় উৎপাদনের দাম অনুযায়ী। ইহার অর্থ কি তাহা হইলে এই হয় যে, পুঁজিবাদী উৎপাদনে মূল্যের নিয়ম শক্তিহীন? আদৌ নয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে উৎপাদনের দাম **মূল্যের ভিন্ন রূপ** মাত্র।

কোনো কোনো পুঁজিপতি তাহাদের পণ্য বিক্রয় করে মূল্যের অধিক দামে, আবার কেহ কেহ বা কমে বিক্রয় করে। কিন্তু সমগ্র ভাবে সকল পুঁজিপতিই সমস্ত পণ্যের পূর্ণ মূল্য পায়। তাহাতেই সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণীর মোট মুনাফা সমস্ত মজুরীহীন সামাজিক শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত উদ্‌বৃত্ত মূল্যের মোট পরিমাণের সমান হয়। সমগ্র সমাজের কাঠামোর মধ্যে উৎপাদন-দামের মোট পরিমাণ পণ্যের মূল্যের মোট পরিমাণের সমান এবং মুনাফার মোট পরিমাণ শ্রমিকদের মজুরীহীন শ্রমের মোট পরিমাণের সমান। পণ্যের মূল্য হ্রাসের ফলে

* লেনিন: 'মার্কস্‌-এঙ্গেলস্‌—মার্কস্‌বাদ", "কার্ল মার্কস্‌",—পৃঃ ২১-২।

তাহাদের উৎপাদনের দাম হ্রাস পায়, আবার তাহাদের মূল্য বৃদ্ধির ফলে তাহাদের উৎপাদনের দাম বৃদ্ধি পায়। মূল্যের নিয়ম এই রকম করিয়াই উৎপাদনের দামের সাহায্যে কার্য্যকরী হয়।

"এইরূপে দাম ও মূল্যের বিভেদ এবং মুনাফার সমীকরণের সুবিদিত ও অবিসংবাদিত তথ্য মার্ক্স্ মূল্যের নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কারণ সকল পণ্যের মূল্যের সমষ্টি সমস্ত দামের সমষ্টির সমান।" *

প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত মুনাফার লোভেই পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। মুনাফা হইল পুঁজিবাদী শিল্পের সঞ্চালক শক্তি। পুঁজিবাদের বিকাশ কিন্তু মুনাফার গড়পড়তা হারকে হ্রাসের দিকে লইয়া যায়।

মুনাফার নিম্নতর হারের দিকে ঝোঁক

প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সমগ্র পুঁজির দরুন যে-পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়া যায় তাহাই হইল মুনাফা। মুনাফার হার হইতেছে পুঁজিপতির পুঁজির সহিত তাহার লাভের অনুপাত। কিন্তু আমরা জানি যে **পরিবর্ত্তনশীল** পুঁজির পরিমাণের দ্বারা অর্থাৎ পুঁজির যে-অংশ শ্রমশক্তি ভাড়া করিবার জন্য ব্যয় হয় তাহার দ্বারা উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়।

যাহা হোক, পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির আঙ্গিক গঠন ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশ উচ্চতর হইতেছে। যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের পরিমাণ নিত্য বাড়ে, এবং পুঁজির যে-অংশ **নিঃশেষিত** শ্রমের জন্য ব্যয় হয় তাহা পরিবর্ত্তনশীল পুঁজির অর্থাৎ যাহা

* ঐ, পৃঃ ২২।

জীবিত শ্রমের জন্য ব্যয় হয় তাহার অপেক্ষা যথেষ্ট দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু পুঁজিবাদের আওতায় পুঁজির উচ্চতর আঙ্গিক গঠনের ফল হইতেছে নিম্নতর হারের দিকে মুনাফার একটা অবশ্যম্ভাবী ঝোঁক। প্রত্যেক পুঁজিপতি যন্ত্রের দ্বারা শ্রমিকের স্থান পূরণ করিয়া উৎপাদন সস্তা করে, তাহার পণ্যের বাজার বিস্তৃত করে এবং **নিজের জন্য** অধিকতর মুনাফা লাভের চেষ্টা করে। ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান, অন্যথা সে যন্ত্রপাতি বসাইত না। কিন্তু পুঁজির উচ্চতর আঙ্গিক গঠনে যান্ত্রিক উন্নতির যে-বিকাশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহার ফলে যে-পরিণতি ঘটে তাহার প্রতিকার করা ব্যক্তিগত ভাবে কোনো পুঁজিপতির **সাধ্যের অতীত**। এই পরিণতি হইল **মুনফার নিম্নতর সাধারণ (বা গড়পড়তা) হারের দিকে ঝোঁক**।

"শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির অর্থ হইল পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজির দ্রুততর বৃদ্ধি। উদ্বৃত্ত মূল্য কেবল পরিবর্তনশীল পুঁজির সম্পাদ্য কার্য্য (function) হওয়ায় সহজেই বুঝা যায় যে মুনাফার হারের (কেবল পরিবর্তনশীল পুঁজি নয়, সমগ্র পুঁজির সহিত উদ্বৃত্ত মূল্যের অনুপাতের) পড়তির দিকে ঝোঁক আছে। মার্ক্‌স্ এই ঝোঁক এবং ইহার অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থাসমূহের বিশদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন।"*

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে আসে শ্রমিকদের উপর **শোষণের হার বৃদ্ধি**। আরও মনে রাখিতে হইবে যে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির মূল্য **হ্রাস পায়**।

কোনো শ্রমিক যদি দুইখানি তাঁত চালাইয়া থাকে এবং বর্ত্তমানে ষোলখানি চালায়, তবে মনে রাখা দরকার—তাঁতের মূল্যও এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কম।

ষোলখানি তাঁতের মূল্য এখন পূর্ব্বেকার দুইখানি তাঁতের আটগুণ না হইয়া খুব বেশী হইলে তাহার চার বা পাচ গুণ মাত্র হয়। সুতরাং প্রত্যেক শ্রমিক প্রতি নিয়োজিত স্থির পুঁজির অংশ পূর্ব্বতনের আটগুণ নয়, বরঞ্চ তাহার চার বা পাচ গুণ মাত্র বেশী। মুনাফার হার হ্রাস পাওয়ার আরও কারণ আছে।

কিন্তু মুনাফার হার হ্রাস পাওয়ার অর্থ মুনাফার পরিমাণ অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর নিকট হইতে নিংড়াইয়া বাহির করা উদ্বৃত্ত মূল্যের সমগ্র পরিমাণ হ্রাস পাওয়া নয়। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী মুনাফার পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, কারণ পুঁজি বাড়িয়া চলে। শোষিত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়া চলে, শোষণের মাত্রাও বাড়ে।

যাই হোক, মুনাফার পড়তির দিকে ঝোঁক তবুও বজায় থাকে এবং পুঁজিবাদের সমগ্র বিকাশের উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। মুনাফার হারের হ্রাসের দিকে এই ঝোঁক **পুঁজিবাদের বিরোধকে অত্যন্ত তীব্র করিয়া তোলে।** পুঁজিপতি শ্রমিকদের উপর শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া মুনাফা-হারের হ্রাসের ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করে। ফলে সর্ব্বহারা ও বুর্জোয়ার মধ্যে নানা বিরোধ দেখা দেয়। মুনাফা-হারের অবনতি পুঁজিপতিদের নিজেদের মধ্যকার সংগ্রাম তীব্র করিয়া তোলে। আত্মসংগ্রামের এই প্রবৃত্তির হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য পুঁজিপতিরা অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে; উন্নত শিল্পে অগ্রসর দেশগুলি অপেক্ষা অনুন্নত দেশে শ্রমিক সস্তা, শোষণের হার উচ্চ এবং পুঁজির আঙ্গিক গঠন নিম্ন স্তরের। ইহা ব্যতীত

দাম চড়া রাখিবার জন্য, তাহাদের মুনাফার বৃদ্ধির জন্য, মুনাফার হার যাহাতে হ্রাস না পায় সেই জন্য পুঁজিপতিরা নানাপ্রকার সঙ্ঘ ও সমিতিতে মিলিত হয় (ট্রাস্ট, কার্টেল প্রভৃতি)।

সঙ্কটের সময় পুঁজিবাদের সকল বিরোধ তীব্রতম হইয়া উঠে। মুনাফা-হারের নিম্নাভিমুখী ঝোঁকের ফলে যে-সব বিরোধের উদ্ভব হয় সেই সব বিরোধ সুপ্রকট হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দ্রব্য-সম্ভার প্রত্যক্ষ ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত হয় না, হয় বিক্রয়ের জন্য।

ব্যবসাদারী পুঁজি ও তাহার আয়

সুতরাং পণ্যোৎপাদন হইয়া গেলেই ব্যবসায়ীর দুর্ভাবনা শেষ হয় না। এখনও পণ্যের বিক্রয় বাকী। তাহার পুঁজি পুনরায় মুদ্রায় পরিণত করার জন্য পুঁজি-পতিকে উৎপন্ন পণ্যসমূহ বিক্রয় করিতে হয়।

উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদক তাহার নিকট পণ্যের জন্য খরিদ্দারের আগমনের অপেক্ষা করে না। সাধারণত উৎপাদক স্বীয় পণ্যসম্ভার কোনো **মধ্যবর্ত্তী বণিকের** (ফড়িয়া বিক্রেতার) **নিকট** বিক্রয় করে। এই মধ্যবর্ত্তী ফড়িয়া বিক্রেতা আবার পণ্যসমূহ ব্যবহারকারীদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়, তাহাদের নিকট বিক্রয় করে।

প্রত্যেকেই জানে যে ব্যবসায়ের জন্য পুঁজি আবশ্যক। আর্থিক সঙ্গতি ব্যতীত ব্যবসায়ী ক্রেতার (ব্যবহারকারীর) নিকট পণ্য পৌঁছাইয়া দিবার কাজ সম্পন্ন করিতে পারে না। যদি স্বীয় পণ্যসম্ভার নিজেকেই বিক্রয় করিতে হইত, তাহা হইলে তাহার দোকান সাজানো, কেরানি নিয়োগ প্রভৃতি কাজে শিল্পপতিকে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি ব্যয় করিতে হইত। সেই জন্যই শিল্পপতি ব্যবসায়ীকে মুনাফার এক ভাগ দিয়া এই কাজ করিতে দেয়।

অতএব উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশ বিশেষই হইল ব্যবসাদারী (commercial) পুঁজির মুনাফা। শিল্পপতি উদ্বৃত্ত মূল্যের এই অংশ ব্যবসায়ীকে, বণিককে দিতে স্বীকৃত হয়। কিছু পুঁজি ব্যয় করিয়া বণিকেরও তাহার উপর প্রচলিত হারে মুনাফা পাওয়া চাই-ই। তাহার মুনাফার হার গড়পড়তা হইতে কম হইলে ব্যবসায় করা লাভজনক হইবে না, এবং তাহা হইলেই বণিক স্বীয় পুঁজি ব্যবসায়ের বদলে শিল্পে নিয়োজিত ও স্থানান্তরিত করিবে।

পুঁজিবাদী শিল্পে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ে ফড়িয়ার কাজই বণিক কেবল করে না, সে কৃষক, কারিগর ও হস্ত-শিল্পীদের নিকট হইতে পণ্য ক্রয়ও করে।

ধরা যাক যে তালাচাবি তৈয়ারের ব্যবসায় কোনো গ্রামে বহু বৎসর যাবত সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। হস্ত-শিল্পীদের নিজেদের পক্ষে উৎপাদিত পণ্যসম্ভারের কোনো বাজার খুঁজিয়া বাহির করা মুশকিল। নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে তালার সরবরাহ আগে হইতেই যথেষ্ট রহিয়াছে। একজন খরিদ্দার আসিয়া বহু তালা ক্রয় করে। দেশের অন্য অঞ্চলে লইয়া গিয়া এই তালাই সে সুবিধাজনক ভাবে বিক্রয় করে। তালা বিক্রয় করিয়া ইহাদের মূল্য সে পায়। পক্ষান্তরে হস্ত-শিল্পীদের নিকট হইতে এইগুলি ক্রয় করিবার সময় সে কিন্তু অত্যন্ত কম দাম দিয়াছিল। বিক্রয়-দাম এবং ক্রয়-দামের মধ্যেকার পার্থক্যের এক অংশ যায় প্যাক করা, রাহা খরচ ইত্যাদি ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য। অবশিষ্টাংশ হইতেছে তাহার মুনাফা, ব্যবসায় হইতে প্রাপ্ত লাভ। ব্যবসাদারী পুঁজি এই রকম করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র পণ্য-উৎপাদকদের শোষণ করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের নিজের শ্রমিকে রূপান্তরিত করে। এই শ্রমিকেরা নিজেদের বাড়ীতেই কাজ করে। এই উপায়ে সহজ পণ্য-উৎপাদন হইতে বণিক স্বীয় মুনাফা আদায় করিয়া দেয়।

ব্যবসায়ের রূপ, ফাট্‌কা

আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় কেবল মাত্র ভোগ্য দ্রব্যের (articles of consumption) ব্যবসায় চলে না। পক্ষান্তরে ভবিষ্যত উৎপাদন ও যানবাহনের জন্য আবশ্যক পণ্যের বাণিজ্যিক লেনদেনও হয় যথেষ্ট।

একটি কাপড়ের কল তুলা, কয়লা, যন্ত্রপাতি, তাঁত, রং প্রভৃতি ক্রয় করে। একট যন্ত্রপ্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে কয়লা, লোহা ও যন্ত্রপাতি। একটি রেলপথ ক্রয় করে বহু সংখ্যক রেল, টানা, রেলগাড়ী এবং রেল ইঞ্জিন।

পাইকারী এবং খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক। উৎপাদক সাধারণত তাহার পণ্যসম্ভার পাইকারের নিকট বিক্রয় করে। পাইকার আবার তাহা বিক্রয় করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিকট তাহারা আবার খুচরা বিক্রয় করে ব্যবহারকারীদের নিকট।

পুঁজিবাদী দেশসমূহে ব্যবসায়ের ব্যবস্থার কাঠামো অত্যন্ত জটিল। বড় বড় লেনদেন উৎপাদনের বিনিময়-কেন্দ্রেই (Produce Exchange) সম্পন্ন হয়। কোনো কোনো পণ্য আবার বহু হাত ঘুরিয়া তবে সর্ব্বশেষ ব্যবহার-কারীর নিকট পৌছায়। এই সব লেনদেন ও পুনর্বিক্রয়ে যোগদান-কারীরা অনেক সময় পণ্যটিকে দেখেই না। সাধারণত কেবল মালগুদামের হাতচিঠা বা রসিদ বিক্রয় হয়। ইহা কেবল মালের অস্তিত্ব প্রমাণ করে এবং তাহা পাইবার অধিকার প্রদান করে। এ-কথা খুবই স্পষ্ট যে সমস্ত মালের কারবারই এই উপায়ে করা যায় না। কারণ এই প্রকার কারবারের জন্য সকল দ্রব্য ঠিক একই রূপ হওয়া দরকার এবং তাহাদের উৎকর্ষ এইরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে তাহা সহজে সাব্যস্ত করা যায় ও মালগুদামের দলিলে এবং কাগজপত্রে উল্লেখ করা যায়।

বণিকেরা যে কেবল ব্যবহারকারীদের নিকট বিক্রয় করার উদ্দেশ্যেই উৎপাদনের বিনিময়-কেন্দ্রে সচরাচর পণ্যসম্ভার ক্রয় করে এমন নয়। পরন্তু বাজার-দাম বাড়িলে বিক্রয় করিয়া মুনাফা আদায় করার সম্ভাবনার আশাতেও তাহারা পণ্যসম্ভার ক্রয় করে। বাস্তবিক পক্ষে দাম কয়েকটি কারণের উপর নির্ভর করিয়া উঠা-নাম করে। এই সব কারণ পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করা কঠিন বা একান্তই অসম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক যে, শরৎকালে অনুমান করা গিয়াছিল যে আবাদ বা ফসল ভালো হইবে, ফলে শস্যের দাম হ্রাস পায়; পরে যদি হঠাৎ দেখা যায় যে আশানুরূপ না হইয়া খারাপ হইয়াছে, তাহা হইলে শস্যের দাম দ্রুত চড়িয়া যাইবে।

ইহাই ফাট্‌কার সুযোগ সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী বাণিজ্যের সমগ্র প্রকৃতির সহিত ফাট্‌কা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত রহিয়াছে। ফাট্‌কা-বাজদের অংশে যে-লাভ হয় তাহা হইতেছে ফাট্‌কার বিষয়ীভূত পণ্য-সম্ভারের উৎপাদনে এবং বাণিজ্যে নিয়োজিত শত সহস্র মানুষের লোকসান।

যে-সব পুঁজিপতির শিল্প-সংক্রান্ত বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে পুঁজিবাদী সমাজে কেবল যে তাহারাই অনুপার্জিত আয় পায় তাহা নয়। পুঁজিবাদের আওতায় পরগাছার সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়িয়া চলে।

ঋণ-পুঁজি ও জমা বা ক্রেডিট

ইহারা কোনো রকম কাজ না করিয়াই অপরিমিত আয় লাভ করে। ইহার একমাত্র কারণ, তাহাদের অধিকারে আছে বিপুল পুঁজি আর প্রভূত পরিমাণে মুদ্রা।

এই সব পুঁজিপতির মুদ্রা কি ভাবে বৃদ্ধি পায়?

মুদ্রা-পুঁজির (money capital) মালিকেরা সাধারণত তাহাদের মুদ্রা এক ব্যাঙ্কে রাখে। ব্যাঙ্ক এই জমার উপর নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দেয়।

কিন্তু এই সুদ প্রদানের আর্থিক সঙ্গতি ব্যাঙ্ক কোথা হইতে পায়? ব্যাঙ্কের সিন্দুকের মধ্যে যে-মুদ্রা স্বর্ণ বা হুণ্ডি রূপে পড়িয়া থাকে তাহা আপনা হইতে বৃদ্ধি পায় না।

পুঁজি বৃদ্ধির জন্য কেবল একটি মাত্র উৎসই পুঁজিবাদ জানে। এই উৎস রহিয়াছে উৎপাদনে—কল-কারখানায়, খনিতে, কৃষি-প্রতিষ্ঠানে।

সুতরাং আধুনিক ব্যাঙ্কে যে-সমস্ত টাকা পয়সা জমা দেওয়া হয় ব্যাঙ্ক তাহা লুকাইয়া বা আবদ্ধ করিয়া রাখে না। আমানত-কারীদের চাহিদা পূরণের উপযুক্ত টাকা পয়সাই মাত্র সিন্দুকে রাখে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে সাধারণ সময়ে আমানতকারীদের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র প্রতিদিন তাহাদের জমার টাকা উঠাইয়া লইতে চায়। যে-পরিমাণ টাকা তাহারা উঠাইয়া নেয় সাধারণত নূতন আমানতের দ্বারাই তাহার পূরণ হয়। কিন্তু সঙ্কট, যুদ্ধ প্রভৃতি অসাধারণ অবস্থায় ব্যাপারটি দাঁড়ায় সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সেই সময় সকল আমানতকারী হঠাৎ এক সঙ্গে তাহাদের জমার টাকা ফিরিয়া পাইবার দাবী করে। ব্যাঙ্ক যদি অপরাপর ব্যাঙ্ক, গভর্নমেণ্ট প্রভৃতির নিকট হইতে ঋণ লইয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণ টাকা পয়সা আপনার সিন্দুকে রাখিয়া এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনানুরূপ বন্দোবস্ত করিতে না পারে, যদি নিজের উপরে এই 'জোর তলব' (run) উপশম করিতে না পারে, তবে 'দেউলিয়া' হয়। ইহার অর্থ হইল যে ব্যাঙ্ক স্বীয় আমানতকারীদের পাওনা পরিশোধ করিতে নিজেকে অসমর্থ বলিয়া ঘোষণা করিল। একটি ব্যাঙ্কের দেউলিয়া হওয়ার অর্থ হইল বহু পুঁজিপতির সর্ব্বনাশ, খুদে বুর্জোয়া (নিম্ন মধ্যবিত্ত) প্রভৃতির সঞ্চয়ের তিরোধান। একটি ব্যাঙ্কের দেউলিয়া হওয়ার ফলে সঙ্কট কেবল আরও গুরুতর হইয়া উঠে।

সাধারণ অবস্থায় কিন্তু ব্যাঙ্ক সিন্দুকে সামান্য টাকা পয়সা রাখিয়াও যে-সব আমানতকারী তাহাদের জমার টাকা উঠাইয়া লইতে ইচ্ছুক তাহাদের সকলেরই চাহিদা পূরণ করিতে সক্ষম হয়। যে-সব পুঁজিপতির অর্থের প্রয়োজন, ব্যাঙ্ক অবশিষ্ট টাকা পয়সা তাহাদেরই ঋণ দেয়।

কিসের জন্য পুঁজিপতির টাকা পয়সার দরকার তাহা আমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছি। উৎপাদনের **পুঁজি** হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তাহার ইহা আবশ্যক। বরাবরের জন্য না পাইয়া কেবল এক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই টাকা পয়সা পায় বলিয়া তাহার ইহাতে কোনো পার্থক্যই হয় না। পণ্য উৎপাদনে এবং বিক্রয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ টাকা পয়সা সে পায়। এইরূপে পাওয়া টাকায় পুঁজিপতি ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে উন্নত পুঁজিবাদের আওতায় ব্যাঙ্ক যে কেবল কম বা বেশী সময়ের মেয়াদে পুঁজিপতিদের ঋণ দেয় তাহাই নয়, পরন্তু ব্যাঙ্কগুলি সুদীর্ঘ সময়ের মেয়াদে প্রচুর পরিমাণ টাকা শিল্পেও খাটায়।

শিল্পপতি পুঁজিদার ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থ পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করে। ঋণ না পাইলে সে যাহা উৎপাদন করিতে পারিত এই পুঁজির সাহায্যে তদপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ও ব্যাপক উৎপাদন করিতে পারে। ঋণ-পুঁজির (loan capital) বিশেষত্ব এই যে ইহা মালিকের দ্বারা উৎপাদনে ব্যবহৃত না হইয়া ব্যবহৃত হয় অপরের দ্বারা। যে শিল্পপতি পুঁজিদার ঋণ গ্রহণ করে সে ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত ঋণ খাটাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠানে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভাড়াটিয়া শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারে, ফলে অধিক উদ্বৃত্ত মূল্য সে পায়।

ব্যাঙ্ক পুঁজি দিয়াছে বলিয়া **এই উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশ** শিল্পপতি পুঁজিদারকে ব্যাঙ্কের হাতে দিতে হয়। তিন হাজার টাকা ঋণ লইলে

বৎসরের শেষে তাহাকে পরিশোধ করিতে হয় ৩২১০৲ টাকা, কারণ বলা হয় যে ঋণের উপর শতকরা ৭৲ টাকা হারে ব্যাঙ্ক সুদ দাবী করে।

এই ক্ষেত্রে আমানতী টাকার উপর ব্যাঙ্ক তাহার আমানতকারীদের কিছু কম সুদ দিবে—মনে করা যাক শতকরা ৫৲ টাকা হারে সুদ দিবে। ইহার অর্থ হইল যে শিল্পপতির নিকট হইতে ব্যাঙ্ক যে ২১০৲ টাকা সুদ পাইয়াছে তাহা হইতে ১৫০৲ টাকা ব্যাঙ্কের ৩০০০৲ টাকার আমানতকারীদের দিতে হইবে। তাহা হইলে এই কারবারের উপর ব্যাঙ্কের মুনাফা হইল ৬০৲ টাকা।

যে কেহই বুঝিতে পারিবেন যে এই লেনদেন অপরাপর যে-কোনো সাধারণ বাণিজ্যিক লেনদেনরই অনুরূপ। যদি কোনো বণিক ১৫০টাকায় একটি ঘোড়া কিনিয়া ২১০টাকা দামে বিক্রয় করিত তবে সে মুনাফা পাইত ৬০ টাকা। ব্যাঙ্কও ১৫০টাকা দিয়া পাইল ২১০ টাকা, কাজেই তাহার মুনাফা হইয়াছে ৬০টাকা। কেবল পার্থক্য এই, যে-পণ্য লইয়া ব্যাঙ্ক কারবার করিয়াছে তাহা ঘোড়া নয় অথবা সাধারণ পণ্যও নয়, পরন্তু বিশেষ প্রকৃতির একটি পণ্য। এই পণ্যটি যে কী তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ৩০০০ টাকা পুঁজিতে রূপান্তরিত হইয়া এক বৎসরের জন্য পুঁজি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ব্যাঙ্ক করে পুঁজির ব্যবসা। ব্যাঙ্ক হইল **পুঁজির কারবারী বণিক।**

এইরূপে পুঁজি পণ্যে পরিণত হওয়ার নানা ভাবে তাহারই সাহায্যে লেনদেন চলে। এই সমস্ত লেনদেনের ভিতর দিয়া **পুঁজির দাম** নির্দ্ধারিত হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে তিন হাজার টাকা মূল্যের পুঁজি এক বৎসরের জন্য ব্যবহারের দরুন শিল্পপতিকে যে-দাম দিতে হইয়াছিল তাহার পরিমাণ হইল

সুদের হার

২১০ টাকা। ব্যবসায়ী এই দাম দিয়াছিল পুঁজি-ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ককে; ব্যাঙ্ক আবার এক বৎসরের জন্য এই পুঁজি ব্যবহারের অধিকার লাভের জন্য পুঁজিপতিদের দিয়াছিল ১৫০ টাকা।

এখন প্রশ্ন উঠে—দাম কিসের উপর নির্ভর করে, পুঁজির জন্য দেয় **সুদের হার** কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়?

এই হার প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হয়। পুঁজিপতিরা প্রায়ই বলে: টাকা এখন সস্তা বা মাগগী। প্রথম ক্ষেত্রে ইহার তাৎপর্য্য হইল যে কম সুদে ঋণ পাওয়া যাইবে; পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উচ্চ হারে সুদ দিতে হইবে। প্রত্যেক বাণিজ্যিক লেনদেনের মত এই ব্যাপারেও দাম শেষ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা। কোনো মাসে যদি বহু পুঁজিপতির অতিরিক্ত টাকা প্রয়োজন হওয়ায় যে-কোনো মূল্যে তাহারা টাকা সংগ্রহের সঙ্কল্প করে, তবে ঋণের জন্য টাকার চাহিদা বাড়িয়া যায়। দেখা যাক এই মূল্য বা ব্যয় (cost) কত দূর বৃদ্ধি পাইতে পারে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে শিল্পপতি পুঁজিদার তিন হাজার টাকার পুঁজি এক বৎসর ব্যবহার করার জন্য ব্যাঙ্ককে ২১০টাকা দিয়াছে। এই-রূপ লেনদেন তাহার পক্ষে লাভজনক কেন? কারণ সে খুব সম্ভবত স্বীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত পুঁজির উপর শতকরা ১৫-১৬ ভাগ মুনাফা করিয়াছে। ইহার অর্থ শিল্প-ব্যবসায়ী নিয়োজিত পুঁজির প্রতি ৩০০০টাকায় ৪৫০-৪৮০ টাকা মুনাফা আদায় করে। ব্যাঙ্ককে ২১০৲ টাকা দেওয়ার পরও তাহার নিকট ২৪০-২৭০ টাকা থাকিয়া যায়। শিল্পে প্রাপ্ত মুনাফার হারের এবং ব্যাঙ্কে প্রদত্ত সুদের হারের মধ্যে ইহাই পার্থক্যের পরিমাণ।

ঋণের চাহিদার দরুন সুদের হার বৃদ্ধি পাইলেও তাহার একটা সীমা আছে। ব্যাঙ্ক ২১০ টাকার বদলে ২৪০-২৭০ টাকা চাহিতে পারে।

এই অবস্থাতেও পুঁজিপতির পক্ষে ঋণ গ্রহণ লাভজনক। কিন্তু ব্যাঙ্ক যদি ৪৫০-৪৮০ টাকা দাবী করে তবে সে ঋণ লইবে না। এই প্রকার শর্তাধীনে মুনাফা না পাইয়া সে পাইবে কেবল মাত্র অশেষ ঝঞ্ঝাট।

উঠ্‌তির ব্যাপারে এইরূপে শিল্পব্যবসায়ীর মুনাফার গড়পড়তা হারের দ্বারা সুদের হারের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধারণত সুদের হার গড়পড়তা মুনাফা-হারের অনেক কম থাকে। খুব কম ক্ষেত্রেই (সঙ্কটের সময়ে) সুদের হার এই সীমায় পৌঁছে। পক্ষান্তরে, চাহিদার তুলনায় টাকার সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত সুদের হার হ্রাস পাইবে।

কতকগুলি অবস্থায় এই ক্ষেত্রে সুদের হার অত্যন্ত হ্রাস পাইতে পারে ; অবশ্য কেহই বিনা সুদে ঋণ দিবে না।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। শিল্পের বিভিন্ন শাখায় পুঁজির আঙ্গিক গঠনের পার্থক্য কিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়?

২। মুনাফা-হারের সমতা-সাধন কিরূপে হয়?

৩। উৎপাদনের দাম কিসে নির্দ্ধারিত হয়?

৪। উৎপাদন-দামে পণ্য বিক্রয় কি মূল্য সম্পর্কে মার্ক্সীয় তত্ত্বের বিরোধী?

৫। মুনাফা-হারের পড়তির কারণ কী?

৬। ব্যবসাদারী পুঁজিপতিদের মুনাফা আসে কোথা হইতে?

৭। পুঁজির ব্যবসা ব্যাঙ্ক কিরূপে করে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কৃষিশিল্পে পুঁজিতন্ত্র

শহর ও গ্রামের মধ্যে বিরোধ

পুঁজিতন্ত্র ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ না করা পর্য্যন্ত আধুনিক শিল্প বলিয়া কিছুই ছিল না। হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োগ করিবার মত ধাতু নিষ্কাষণের বিপুলকায় প্রতিষ্ঠান ছিল না, তৈল-উত্তোলনের কোনো যন্ত্র ছিল না, শত সহস্র মাকু সমন্বিত কাপড়ের কল ছিল না। পুঁজিতন্ত্রের পূর্ব্বে কোনো রেলপথ বা বাষ্পীয় জাহাজও ছিল না। পুঁজিতন্ত্র বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছে ঃ বৃহদাকার শিল্প পত্তনের আগের যুগে ইহার স্থানে ছিল কেবল কারিগর আর হস্তশিল্পী।

কৃষিশিল্প সম্বন্ধে ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকমের। পুঁজিতন্ত্রের বহু পূর্ব্বে মানুষ জমি-কর্ষণ, পশুপালন, প্রয়োজনীয় সকল প্রকারের জন্তু ও উদ্ভিদাদির চাষ প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকিত। পুঁজিতন্ত্রের উদ্ভবের কালে কৃষি ছিল সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায়। পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ কৃষির প্রধান অবলম্বনগুলিকে দ্রুত ধ্বংস করিতে আরম্ভ করে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু বহু দেশে এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ অত্যন্ত অপরিহার্য্য প্রমাণিত হইয়া এমন কি পুঁজিবাদের সাফল্যের পরেও টিকিয়া আছে ; ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইল জমিদারদের, সাধারণ ভাবে, ব্যক্তিগত মালিকদের হাতে জমির স্বত্বস্বামিত্ব।

পুঁজিবাদ **কৃষি হইতে শিল্পকে পৃথক** করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী

প্রাক্-পুঁজিবাদী সম্পর্কের আওতায় কৃষক পরিবারে বা কৃষক কারিগরের দ্বারাই জামা কাপড়, জুতা এবং নিত্যব্যবহার্য্য অপরাপর দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হইত। পুঁজিবাদ বয়ন ও জুতা শিল্পের জন্ম দিয়াছে। উৎপাদনের উৎকর্ষ এবং ব্যয়ের অল্পতার দরুন বয়ন ও জুতা-শিল্প কৃষক-উৎপাদনের (peasant production) স্থান অধিকার করে।

পুঁজিবাদ কিন্তু কেবল শিল্পের নূতন শাখাগুলিকেই কৃষি হইতে পৃথক করে নাই। পুঁজিবাদ **শহর ও গ্রামের মধ্যে এক সুবিস্তীর্ণ ব্যবধান সৃষ্টি করে,** শিল্প ও কৃষির মধ্যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করিয়া ক্রমাগত তাহাকে গভীরতর করিয়া তোলে। শিল্পে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত যান্ত্রিক উন্নতি বিধানও হইয়া থাকে। প্রত্যেক দশকে, কোনো কোনো সময়ে আবার প্রতি বৎসরেও নূতন পদ্ধতি, নূতন উন্নতি, নূতন যন্ত্রপাতি দেখা দেয়। এমন কি, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও শিল্পের এই প্রচণ্ড গতির সহিত তাল রাখিতে কৃষি পারিয়া উঠে না। পূর্ব্বের স্বাভাবিক আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে পুঁজিবাদ কৃষিকে টানিয়া বাহির করিয়া ভূমিদাসত্বের বন্ধনজাল হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের জনসাধারণকে অজ্ঞতা, অনুন্নত অবস্থা ও দারিদ্র্যে নিমজ্জিত করিয়া তাহাদের উপর ক্রমবর্দ্ধমান শোষণের ভার চাপাইয়া দেয়। পল্লীর কোটি কোটি জনসাধারণ কৃষকরা এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত দেশসমূহেও শহরের সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অজ্ঞতা এবং অনুন্নত পরিবেশে বসবাস করে।

এক দিকে শিল্পে দ্রুততর বৃদ্ধি ও উন্নতি, অপর দিকে কৃষির নিতান্ত অনুন্নত অবস্থা—ইহাই হইল পুঁজিবাদের এক **গভীরতম অসঙ্গতি**। ইহা হইতে সকল প্রকার অশান্তি ও সঙ্কটের উৎপত্তি। ইহাই **পুঁজিবাদের**

অবশ্যম্ভাবী পতনের আভাস দেয় এবং তাহার পথ প্রস্তুত করে।

> "বিকাশের ক্ষেত্রে কৃষি শিল্পের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। **সকল** পুঁজিবাদী দেশেরই ইহা অন্তর্নিহিত ব্যাপার। জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন শাখার মধ্যে সামঞ্জস্যের ব্যত্যয়, সঙ্কট এবং চড়া দামের সর্ব্বাপেক্ষা বদ্ধমূল কারণসমূহের ইহাই হইল অন্যতম।
>
> "পুঁজি কৃষিকে সামন্ততন্ত্র হইতে মুক্ত করিয়া বাণিজ্যিক বিনিময়ের আবর্ত্তে এবং সেই সঙ্গে দুনিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে; ইহাকে জড়তা, মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতা ও গোষ্ঠীপতির আধিপত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। তথাপি পুঁজিবাদ কেবল যে জনসাধারণের উপর পীড়ন শোষণ এবং তাহাদের দারিদ্র্য দূর করিতে অপারগ তাহাই নয়, পরন্তু নূতন আকারে এই সমস্ত দুর্দ্দশা সৃষ্টি করিয়া সেই পুরাতন কাঠামোকেই আধুনিক ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। পুঁজিবাদের দ্বারা শিল্প ও কৃষিব অন্তর্ব্বিরোধ যে কেবল বিদূরিতই হয় না তাহা নয়, বরঞ্চ ক্রমেই এই বিরোধ ব্যাপক ও গভীরতর হইয়া উঠে। প্রধানত বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হইয়া পুঁজির চাপ ক্রমশ অধিকতর মাত্রায় কৃষির উপর চাপিতে থাকে।" *

কৃষিতে উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক আবশ্যকীয় বস্তু হইল জমি। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই জমি হইল জমিদার বিশেষের **ব্যক্তিগত**

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ১৭ শ খণ্ড, 'কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশের রীতি সম্পর্কে নূতন তথ্য', পৃঃ ৬৩৯, রুশ সংস্করণ।

সম্পত্তি। এই সব দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বিস্তীর্ণ জমি জমিদারদের অধিকারে আছে জমিদারেরা বিরাট বিরাট ভূম্যধিকারী, নিজেরা চাষ না করিয়া নির্দ্দিষ্ট খাজনায় জমি বিলি করিয়া দেয়।

জমির খাজনা

ভূমি-দাসত্বের যুগ হইতে জমিদারেরা নিজেদের বিরাট জমিদারী বজায় রাখিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তাহারা জমিতে অপরের শ্রমে উৎপন্ন জিনিসের সারাংশ আত্মসাৎ করিয়া বাঁচিয়া আছে। কৃষকদের শোষণের, তাহাদের নিঃশেষিত করিয়া নিজেদের আয় বৃদ্ধির উপায়ের খোলসটাই কেবল তাহাদের পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেই জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ জমিদার ও অন্যান্য ব্যক্তিগত মালিকদের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লওয়াতে জমির মালিকানা আসিয়াছে সর্ব্বহারাদের রাষ্ট্রের হাতে। সর্ব্বহারাদের রাষ্ট্র কোনো খাজনা না লইয়াই জমির এক অংশ সকল শ্রমজীবী কৃষককে দেয় এবং আর এক অংশ বৃহদাকার রাষ্ট্রীয় কৃষি-প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য ব্যবহার করে। এই বৃহদাকার রাষ্ট্রীয় কৃষি-প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রমিকদের প্রয়োজন সরবরাহ করিবার জন্য এবং যে-সব রাষ্ট্রীয় শিল্প এই সব শ্রমিকদের প্রয়োজন পূরণ করে সেই সব শিল্পেরও প্রয়োজন পূরণ করিবার জন্য জিনিস উৎপাদন করে।

পুঁজিবাদের আওতায় জমির মালিক খাজনা নেয়। আবশ্যকীয় পুঁজি আছে এইরূপ যে-কোনো লোক কৃষিশিল্পে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইলে সর্ব্বপ্রথম তাহাকে জমিদারের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নির্দ্দিষ্ট খাজনায় এক খণ্ড জমি ইজারা লইতে হয়। জমি যাহাদের প্রয়োজন তাহাদের নিকট হইতে জমির মালিক তাহার মালিকানা স্বত্ব খাটাইয়া কর আদায় করে। জমির মালিক কর্ত্তৃক গৃহীত এই করকে বলে জমির খাজনা।

বিশেষক খাজনা (differential rent) ও **নির্ব্বিশেষ** খাজনার (absolute rent) মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। প্রথমে বিশেষক খাজনা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। আমরা জানি যে, শিল্পে পণ্যের মূল্য ও উৎপাদনের খরচ উৎপাদনের গড়পড়তা অবস্থার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। কৃষিতে কিন্তু এইরূপ নয়। জমির আয়তন সীমাবদ্ধ হওয়াতে প্রয়োজন অনুযায়ী জমি বাড়ানো যায় না। সকল জমির উর্ব্বরতাও সমান নয়। বড় বড় শহর, নদী ও সমুদ্র বা রেলপথ হইতে জমির দূরত্বও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সমান পরিমাণ পুঁজির ব্যয়ে উৎকৃষ্ট জমি হইতে উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া যায়। যোগাযোগের উপায় হইতে বিচ্ছিন্ন প্রদেশে যে-জমি অবস্থিত সেইরূপ জমি হইতে ফসল চালান দিতে যে-খরচ পড়ে, সুবিধাজনক স্থানে জমি থাকিলে কৃষিজীবীর সেই খরচ বাঁচিয়া যায়। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের খরচ নিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদনের শর্ত্তের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। অন্যথা পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী নিকৃষ্ট জমিতে কাজ না করিয়া তাহার পুঁজি স্থানান্তরিত করিবে শিল্পে। কিন্তু ব্যাপারটি এইরূপ হইলে যাহারা উৎকৃষ্ট জমিতে কাজ করে তাহাদের অতিরিক্ত আয় হয়। এই আয় কে পায়? ইহা স্পষ্ট যে এই আয় জমিদারের করতলগত হয়।

কিন্তু এই বিশেষক খাজনা ব্যতীত জমিদার নির্ব্বিশেষ খাজনাও পায়। জমি মালিকদের ব্যক্তিগত একচেটিয়া সম্পত্তি। এই একচেটিয়া মালিকানা স্বত্ব থাকার দরুন পুঁজি শিল্প হইতে কৃষিতে অবাধ গতিতে স্থানান্তরিত হইতে বাধা পায়। জমিতে কাজ করার জন্য জমিদারের অনুমতি লওয়ার আবশ্যক। যন্ত্রবিজ্ঞানের দিক হইতেও শিল্পের তুলনায় কৃষি নিম্ন স্তরে আছে। সুতরাং কৃষিতে পুঁজির আঙ্গিক গঠন

শিল্পে নিয়োজিত পুঁজির আঙ্গিক গঠনের তুলনায় নিম্ন স্তরের। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, সম পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করিলে শিল্প অপেক্ষা কৃষিতে অধিক উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদিত হয়। কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে পুঁজির অবাধ চলাচল থাকিলে প্রতিযোগিতার সহায়তায় মুনাফার হার সমতা লাভ করে। কিন্তু জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকার দরুন এইরূপ স্বাধীনতা বর্ত্তমান নাই। সুতরাং কৃষিজাত দ্রব্যসম্ভার উৎপাদনের দাম অপেক্ষা বেশী দামে বিক্রয় হয়। এই রূপে যাহা অতিরিক্ত পাওয়া যায় তাহা জমিদারের কুক্ষিগত হয় এবং ইহাকে বলা হয় জমির নির্ব্বিশেষ (absolute) খাজনা। মার্ক্‌স্ বলিয়াছেন, জমির নির্ব্বিশেষ খাজনা হইতেছে জমিদারকে প্রদত্ত কর।

যে-অবস্থা বিশেষক এবং নির্ব্বিশেষ খাজনার সৃষ্টি করিয়াছে লেনিন তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

"...প্রথমত, আমরা দেখি জমি ব্যবহারের (পুঁজিবাদী) একচেটিয়া অধিকার। এই একচেটিয়া অধিকারের উৎপত্তি হয় জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতার দরুন। সুতরাং প্রত্যেক পুঁজিবাদী সমাজেই এই একচেটিয়া অধিকার অবশ্যম্ভাবী। এই একচেটিয়া অধিকারের ফলে সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ জমিতে উৎপাদনের শর্ত্তাদির দ্বারা শস্যের দাম নির্দ্ধারিত হয়; সর্ব্বাপেক্ষা ভালো জমিতে পুঁজি খাটাইবার ফলে বা অধিকতর উৎপাদনক্ষম উপায়ের দ্বারা যে-অতিরিক্ত মুনাফা হয় তাহা হইতে বিশেষক খাজনার উৎপত্তি। জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকুক বা না থাকুক, এই খাজনার উৎপত্তি তাহাতে ব্যাহত হয় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকার ফলে কৃষকদের নিকট হইতে এই খাজনা সংগ্রহ করা জমিদারের পক্ষে সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, আমরা দেখি জমিতে

ব্যক্তিগত সম্পত্তির একচেটিয়া অধিকার। যুক্তি বা ইতিহাস, কোনো দিক হইতেই এই একচেটিয়া অধিকার পূর্ব্বোক্ত একচেটিয়া অধিকারের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত নয়। ...

"এই প্রকার একচেটিয়া অধিকার পুঁজিবাদী সমাজ এবং কৃষির পুঁজিবাদী সংগঠনের পক্ষে **একান্ত প্রয়োজন** নয়। এক দিকে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়াও আমরা পুঁজিবাদী কৃষি সহজেই কল্পনা করিতে পারি এবং বহু বিচক্ষণ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার দাবী করেন। অপর দিকে, এমন কি জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব ছাড়াও পুঁজিবাদী কৃষি-সংগঠন আমরা কার্য্যত দেখিতে পাই—যেমন রাষ্ট্রীয় বা সাম্প্রদায়িক জমিতে। ফলে এই দুই প্রকার একচেটিয়া অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করা একান্ত প্রয়োজন এবং ফল স্বরূপ ইহাও স্বীকার করা প্রয়োজন যে, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের দ্বারা **সৃষ্ট** নির্বিশেষ খাজনা বিশেষক খাজনার সহিত পাশাপাশি বর্ত্তমান থাকে।" *

উপরে বর্ণিত খাজনা সম্পর্কিত মার্ক্সীয় তত্ত্ব নিম্নলিখিত পূর্ব্বসিদ্ধান্ত হইতে উদ্ভূত। জমিদার দেয় জমি ইজারা। ইজারাদার একজন পুঁজিপতি। সে জমি চাষ করে মজুরী-শ্রমের সাহায্যে। এইরূপ ক্ষেত্রে জমিদারের কবলিত জমির খাজনার উৎস যে কি তাহা অনুধাবন করা কঠিন নয়।

জমির খাজনার উৎস

মজুররা মজুরীহীন শ্রমের দ্বারা উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন করে। এইরূপে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্য প্রথমে পুঁজিবাদী ইজারাদারের হাতে যায়। সে ইহাকে দুই ভাগে ভাগ করে। এক ভাগ সে নিজে রাখে। ইহা

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃষ্ঠা ১৯৯-২০০।

হইল ব্যবসায়ীর মুনাফা, তাহার নিয়োজিত পুঁজির উপর মুনাফা। আর অন্য ভাগ এই মুনাফার অতিরিক্ত অংশ। ইজারাদার এই অংশ জমিদারকে দিতে বাধ্য হয়। উদ্বৃত্ত মূল্যের এই অংশ হইল খাজনা। ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে পুঁজিবাদের আওতায় বিনাশ্রমে উপভোগ্য অন্যান্য আয়ের মত নির্ব্বিশেষ ও বিশেষক খাজনারও একটি মাত্র উৎসই সম্ভব—তাহা হইল শ্রমিক-শ্রেণীর মজুরীবিহীন শ্রমে উৎপাদিত **উদ্বৃত্ত মূল্য**। মার্ক্‌স্‌ বলেন :

"সমস্ত জমির খাজনাই উদ্বৃত্ত মূল্য, উদ্বৃত্ত শ্রমের ফল।" *

আবার লেনিন বলেন :

"খাজনাতত্ত্ব (Theory of rent) স্বীকার করিয়া নেয় যে সমগ্র কৃষিজীবী জনসাধারণ জমিদার, পুঁজিপতি এবং মজুরী-শ্রমিক শ্রেণীতে সম্পূর্ণ রূপে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পুঁজিবাদের ইহা আদর্শ হইলেও কোনোক্রমেই বাস্তব সত্য নয়।" †

বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টি আরও জটিল। তথাপি অপেক্ষাকৃত জটিলতর অবস্থাতেও খাজনাতত্ত্বের কার্য্যকারিতা বর্ত্তমান থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে অনেক সময়ে জমিদার জমি ইজারা না দিয়া বরং নিজে মজুর ভাড়া করিয়া চাষ করায়। সেই ক্ষেত্রে সে একাধারে জমিদার ও পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী। জমিদার হিসাবে সে পায় খাজনা, আবার পুঁজিপতি হিসাবে সে পায় নিয়োজিত পুঁজির উপর মুনাফা। এই ক্ষেত্রে খাজনা এবং মুনাফা একই পকেটে যায়।

* 'ক্যাপিটাল', ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৪৩।

† লেনিনের গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, "আদায়ের জটিলতার উপরে আর এক দফা", পৃঃ ৪১৫, রুশ সংস্করণ।

প্রায়ই জমিদারের জমি পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীর বদলে কৃষকদের ইজারা দেওয়া হয়। মজুর নিয়োগ না করিয়া কৃষকরা নিজেরাই চাষের কাজ করে। জমির অভাবের চাপে পড়িয়া কৃষকরা অতি জঘন্য শর্ত্তাধীনে জমিদারের নিকট হইতে জমি ইজারা লইতে বাধ্য হয়। এই ক্ষেত্রেও ইহা সুস্পষ্ট যে খাজনা হিসাবে জমিদার টাকা, শ্রম (নিজের জন্য কাজ করাইয়া লওয়া), ফসল আদায় করে। এই ভাবে সে কৃষককে গোলামে পরিণত করে। এই ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদক মজুরী-শ্রমিক নাই, তবে খাজনা আসে কোথা হইতে?

ইহা সুস্পষ্ট যে এই ক্ষেত্রে জমির খাজনার উৎস হইতেছে **কৃষকের শ্রমের শোষণ**। স্বীয় শ্রমে উৎপন্ন জিনিসের অংশ বিশেষ কৃষক জমিদারকে দেয় খাজনা হিসাবে। জমিদার কর্ত্তৃক গৃহীত এই অংশ সচরাচর পরিমাণে এত বেশী হয় যে, অত্যন্ত কঠিন ও হাড়ভাঙ্গা কাজ করিতে করিতে কৃষক অর্দ্ধাশনে জীবন কাটাইতে বাধ্য হয়। এই কারণেই পুঁজিবাদের আওতায় কৃষক সম্পর্কে মার্ক্স্ বলেন:

"শিল্পে নিযুক্ত সর্ব্বহারাদের শোষণের সহিত তাহাদের শোষণের পার্থক্য কেবল প্রকারে, ধরনে।" *

তবুও পুঁজিবাদী দেশে কৃষক সচরাচর নিজের জমিতেই কাজ করে। এখানে খাজনার বিষয় কি ভাবে সমাধান হয়? পুঁজিবাদের আওতায় জমি হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কাজেই ইহার **ক্রয়-বিক্রয়** চলে। পুঁজিবাদী অবস্থায় কৃষককে কোনো জমির মালিক হইতে হইলে তাহা ক্রয় করিতে হয়। দেখা যাক, জমির দাম কি প্রকারে নির্দ্ধারিত হয়।

জমির ক্রয় ও বিক্রয়

* মার্ক্স্: 'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম', পৃঃ ১২০।

ইজারা দেওয়ার মত একখণ্ড জমি জমিদারের আছে। ইজারাদার তাহাকে বাৎসরিক খাজনা দেয় ১৫০০০ টাকা। সে ধনী হইয়া জমিদারকে তাহার নিকট জমি বিক্রয় করিতে অনুরোধ করিল। জমিদার কত দাম চাহিবে? সে এই রকমের হিসাব করিবে: বিক্রয় না করিলে প্রত্যেক বৎসরই জমি হইতে খাজনা পাইব ১৫০০০ টাকা। বিক্রয় করিয়া যেন আমার কোনো লোকসান না হয়। কাজেই জমির দাম বাবদ আমাকে এমন পরিমাণ টাকা পাইতেই হইবে যাহা ব্যাঙ্কে জমা দিলে বাৎসরিক সুদ হিসাবে পাওয়া যাইবে ১৫০০০ টাকা। অনুমান করা যাক যে, ব্যাঙ্ক শতকরা চারি টাকা হারে আমানতী টাকার উপর সুদ দেয়। তাহা হইলে এই জমিদার সহজেই হিসাব করিয়া বাহির করিবে যে তাহাকে পাইতে হইবে ৩,৭৫,০০০ টাকা। কারণ ৩,৭৫,০০০ টাকা ব্যাঙ্কে আমানত দিলে বৎসরিক সুদ পাওয়া যায় ১৫,০০০ টাকা। কাজেই এই ক্ষেত্রে জমির দাম হইবে ৩,৭৫,০০০ টাকা।

কোনো কোনো সময় জমির মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইহা ভুল। মনুষ্যশ্রমের দ্বারা যে-সমস্ত উন্নতি সাধিত হইয়াছে (যেমন, ইমারত, জলের কল, জল সেচন ইত্যাদি), আমরা যদি তাহা গণনা না করি, তবে কিন্তু কেবল জমি হিসাবে জমির কোনো মূল্য নাই এবং থাকিতে পারে না। জমি মনুষ্যশ্রমের সৃষ্টি নয়। জমির কোনো মূল্য না থাকিলেও কিন্তু দাম থাকিতে পারে (এবং প্রকৃত প্রস্তাবে পুঁজিবাদের আওতায় সর্ব্বদাই থাকেও)। জমিদারেরা অন্যায় ভাবে জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছে, তাহারই ফলে এই দামের উৎপত্তি।

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে জমির দাম নির্দ্ধারিত হয় ইহার

বাৎসরিক আয়ের পরিমাণের দ্বারা। টাকার পরিমাণ (দাম) এমন ভাবে ঠিক করা হয় যে, তাহা ব্যাঙ্কে আমানত করিলে চলতি সুদের হারে পূর্ব্বতন আয় পাওয়া যাইবে। এইরূপ হিসাবকে বলে **পুঁজিকরণ** (capitalisation)। এই কারণেই মার্ক্স্ বলিয়াছেন :

> "জমির দাম তাহার পুঁজীকৃত (capitalised) মূল্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।" *

অতএব একখণ্ড জমি ক্রয় করাতেই বহু বৎসরের জন্য অগ্রিম খাজনা কৃষক দিয়া দেয়।

জমির খাজনা এবং কৃষির অনুন্নত অবস্থা

জমির খাজনা এক দুঃসহ বোঝা। পুঁজিবাদের আওতায় কৃষির উন্নতি বিধানে ইহাই বাধা দেয়। কৃষিতে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মূল্যের এক বিশিষ্ট অংশ যায় বড় বড় জমিদারদের হাতে। ইহারা জমির উন্নতির জন্য এই অংশ পুনর্নিয়োগ না করিয়া নাগরিক বিলাসিতায় ব্যয় করে। জমি ক্রয় করিয়া লইলেও অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। কৃষি-উৎপাদকের পুঁজির বেশীর ভাগ যায় জমি কিনিতে। কাজেই যন্ত্রপাতি আর সাজসরঞ্জাম কিনিবার জন্য সামান্যই থাকে অবশিষ্ট। জমির খাজনা এক রকমের দমকল। এই খাজনার মধ্য দিয়াই কৃষি হইতে প্রভূত সম্পদ পরস্বোপজীবী জমিদারদের কুক্ষিগত হয়। এই করিয়াই জমির খাজনা কৃষির চিরপুরাতন অনুন্নত এবং বর্ব্বরযুগীয় অবস্থাকে আরও গুরুতর করিয়া ও বাড়াইয়া তোলে। পুঁজিবাদের অধীনে জমির মালিকানা স্বত্বের ফল স্বরূপ জমির খাজনা এইরূপে শহর ও গ্রামের মধ্যে **বিরোধ বাড়াইতে** সাহায্য করে।

* মার্ক্স্ : 'ক্যাপিটাল', ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৩৯।

পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে **জমির খাজনার পরিমাণ** অতি দ্রুত বেগে বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়টি সহজেই বুঝা যায়। চাষ-করা জমির আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্বিশেষ খাজনা বৃদ্ধি পায়। **বিশেষক** খাজনা কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত তালে বাড়িয়া চলে; কারণ, প্রত্যেক নূতন জমি চাষে আনার সঙ্গে সঙ্গে জমির উর্ব্বরতা ও অবস্থানের পার্থক্য এবং তৎসহ একই জমিতে পুঁজির বিভিন্ন বিনিয়োগের উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্য বাড়িয়া চলে। বহুকাল জমি চাষে থাকায় প্রভূত পরিমাণ শ্রম নিয়োগের দ্বারা নানা প্রকার উন্নতি (জল সেচন, সার দেওয়া, রাস্তা তৈরী, আবর্জ্জনা পরিষ্কার ইত্যাদি) সাধনের ফলে জমির উৎকর্ষ বর্দ্ধিত হইয়াছে, এইজন্যও জমির দাম বাড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত এই সমস্ত শ্রমের ফল জমিদারের হাতে যায়।

জমির খাজনার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে জমির দামও নিয়তই বাড়িতে থাকে। বড় বড় শহর ও শহরতলীতে প্রতি গজ জমির দাম অসঙ্গত রূপে বৃদ্ধি পায়। ইহাদের কথা বাদ দিলে, এমন কি গ্রামাঞ্চলেও জমির দাম বৃদ্ধি পায়। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রে সকল কৃষি-সম্পত্তির মূল্য দশ বৎসরে (১৯০০—১৯১০) ৬০,০০০ কোটি টাকা হইতেও বেশী বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে মাত্র ১৫,০০০ কোটি টাকা সরঞ্জাম ও ইমারতের মূল্য বৃদ্ধির দরুন, অবশিষ্ট ৪৫,০০০ কোটি টাকা জমির দাম বৃদ্ধির দরুন।

জমির খাজনার পরিমাণ বাড়িবার অর্থ হইতেছে এই যে, সমাজ পরস্বোপজীবী জমিদারদের যে-কর দেয় তাহারই বৃদ্ধি পাইয়াছে; এই বৃদ্ধি পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে চলে। জমির খাজনার বৃদ্ধি কৃষির বিকাশকে আরও দুরূহ করিয়া তোলে। তাহার অনুন্নত অবস্থা আরও স্থায়ী করিয়া শিল্প ও কৃষির মধ্যে ব্যবধান আরও বিস্তৃত করে।

পুঁজিবাদের অধীনে কেবল মাত্র জমির খাজনার দ্বারাই কৃষির উন্নতি রুদ্ধ হয় না। মুনাফার জন্য উৎপাদন এবং পুঁজিবাদী উৎপাদনে পরিকল্পনাহীনতা এবং বিশৃঙ্খলার ফলে জমির উর্ব্বরা শক্তি শোচনীয় রূপে নিঃশেষিত হয়। পুঁজিতান্ত্রিক সঙ্কট সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থায় আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া সচরাচর কৃষির ক্ষেত্রে ভয়ানক ধ্বংসাত্মক পরিণতি ঘটায়। পুঁজিবাদী অসঙ্গতির (অর্থাৎ বিরোধের) বৃদ্ধি শিল্পের ন্যায় কৃষিতেও জুড়িয়া বসে।

পুঁজিবাদ কায়েম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই **ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনকে** পর্য্যুদস্ত করিয়া **বৃহদাকার উৎপাদন জয়** লাভ করে। বৃহদাকার উৎপাদনে বহুবিধ সুবিধা আছে। বৃহদাকার উৎপাদন ব্যাপক ভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন অপেক্ষা বৃহদাকার উৎপাদন শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা অধিক বাড়াইতে পারে। পুঁজিবাদী শিল্প এই রূপেই কারিগর এবং হস্তশিল্পীদের অনবরত দূরে সরাইয়া দেয়।

কৃষিতে ক্ষুদ্রাকার ও বৃহদাকার উৎপাদন

পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিরন্তর এক সংগ্রাম লাগিয়াই আছে ; সেই সংগ্রামে প্রত্যেক ক্ষেত্রে মাত্র অল্প কয়েকটি করিয়া প্রতিষ্ঠানই জয়ী হয়।

শিল্পক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের উপর বৃহদাকার উৎপাদনের বিজয়লাভ অবিসংবাদিত। ক্ষুদ্র উৎপাদকের উপর বৃহৎ পুঁজির বিজয়, পুঁজির একত্রীকরণ (**concentration**) ও কেন্দ্রীকরণের (centralisation) ব্যবস্থায় সার্থক উন্নতির ফলে **শ্রেণী-সংগ্রাম প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি** পায়। ক্রমশ মধ্যবিত্ত শ্রেণী লোপ পাইয়া যায়। বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সর্ব্বহারা শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী জনসমষ্টি (যেমন, ক্ষুদ্র উৎপাদক, কারিগর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি) নিশ্চিহ্ন হইয়া পড়ে। ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণী দলিত হইয়া যায়।

কালেভদ্রে ইহাদের এক আধজন পুঁজিপতি শ্রেণীতে উন্নীত হইলেও হাজারে হাজারে নামিয়া আসে শ্রমিক শ্রেণীর পর্য্যায়ে। স্বল্পসংখ্যক বুর্জোয়া শ্রেণী এবং অসংখ্য সর্ব্বহারা শ্রেণী—এই দুইটি বিরোধী শ্রেণী ভয়াবহ ভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। বৃহদাকার পুঁজিবাদী উৎপাদনের সফল অগ্রগতির ইহাই হইল পরিণতি।

ক্ষুদ্র শিল্প বেদখল ও ধ্বংস হয়, ইহা অস্বীকার করিতে অপারগ হইয়া পুঁজিবাদের সমর্থকরা দৃঢ় ভাবে বলে যে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন কৃষিতে দৃঢ় ভিত্তি লাভ করিয়াছে। তাহাদের মতে শিল্পে বৃহদাকার উৎপাদনের যে-সুবিধা আছে কৃষিতে তাহা নাই।

পুঁজিবাদের সমর্থকরা তাহাদের এই উক্তি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু কৃষিতে বৃহদাকার উৎপাদন ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক। সোভিয়েট ইউনিয়নে বড় বড় রাষ্ট্রীয় আবাদ (সোভখোজেস) এবং যৌথ আবাদের (কোলখোজেস) বৃদ্ধিই যে-কোনো বাকবিতণ্ডা অপেক্ষা ইহা উত্তম রূপে প্রমাণ করিয়াছে। বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবাদ অপেক্ষা ইহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা অপরিমেয় রূপে অধিক। এমন কি পুঁজিবাদী জগতেও কৃষিতে **বৃহদাকার উৎপাদনের সুবিধা** অনস্বীকার্য্য।

ইহা স্বতোসিদ্ধ যে পুঁজিবাদী অবস্থায় এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রচলিত অবস্থায় বৃহদাকার উৎপাদনের যে-সুবিধা তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। সোভিয়েট অবস্থায় যৌথ ও রাষ্ট্রীয় আবাদসমূহে বৃহদাকার উৎপাদনের সুবিধা হইতেছে এই যে, আবাদসমূহ সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হইয়া শ্রমরত বিশাল জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে এবং তাহাদের জন্য প্রস্তুত করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছাইবার প্রকাশ্য প্রশস্ত পথ। কিন্তু পুঁজিবাদী অবস্থায় বৃহদাকার উৎপাদন ক্ষুদ্র

উৎপাদকের প্রতিকূলে পুঁজিপতিকে সুবিধা দেয়, শ্রমরত জনসাধারণকে দাসে পরিণত করিতে করে সাহায্য।

কেবল বৃহদাকার উৎপাদনই ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতি (কলের লাঙ্গল, কম্বাইন প্রভৃতি) ব্যবহার করিতে সক্ষম। ইহাতে শ্রমের উৎপাদন-শক্তি বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। পুঁজিবাদী ব্যাঙ্ক হইতে কেবল বৃহদাকার উৎপাদনই অনায়াসে ক্ষুদ্র কৃষক অপেক্ষা অতীব সুবিধাজনক শর্তে ধার পাইতে পারে। উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান অধিকতর সুবিধাজনক ভাবে সংগঠন করিতে পারে। কেবল বৃহদাকারে পরিচালিত কৃষিতেই বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব। কৃষিতে বৃহদাকার উৎপাদনের বিপুল সুযোগ-সুবিধা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়।

শিল্পের সহিত তুলনায় কৃষির অনুন্নত অবস্থা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যন্ত্রপাতি ও কৃত্রিম সার ব্যবহার দ্রুত গতিতে সাফল্য লাভ করিতেছে। কেবল বৃহৎ আবাদসমূহেই জটিল যন্ত্রপাতির সুবিধাজনক প্রয়োগ সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রে কলের লাঙ্গলের সংখ্যা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ছিল ৮০ হাজার, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ১০ লক্ষ; কম্বাইনের সংখ্যা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ছিল ৩ হাজার ৫ শত, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে ৫০ হাজার। জার্মানিতে ১৯১৩ এবং ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের ব্যবহার বাড়িয়াছে আড়াই গুণ, ক্ষার (potash) জাতীয় সারের ব্যবহার বাড়িয়াছে দেড়গুণ। ফ্রান্সে নাইট্রোজন ঘটিত সারের ব্যবহার হইয়াছে দ্বিগুণ, ক্ষার জাতীয় সারের ব্যবহার হইয়াছে পাঁচগুণ, সুপার-ফস্‌ফেট্‌স্‌ হইয়াছে দ্বিগুণ। জার্মানির বৃহত্তর আবাদসমূহের এক বড় অংশ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। অবশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবাদের পক্ষে যন্ত্রপাতি রাখা সাধ্যে কুলায় না।

নিজেদের কলের লাঙল, মালটানা মোটর গাড়ী বা বৈদ্যুতিক মোটর প্রভৃতি রাখিতে তাহারা সমর্থ নয়। বৃহত্তর আবাদসমূহের অধিকাংশেরই এই সমস্ত আছে। এইরূপে জার্মানিতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যে-সব আবাদের আয়তন ১৭৫০ বিঘার উপর তাহাদের শতকরা ৭০টিতে বৈদ্যুতিক মোটর, ১৪·৫টিতে কলের লাঙল, ৬০টিতে বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ৮টিতে মালটানা মোটর ব্যবহৃত হইত। আধুনিক যান্ত্রিক উন্নতিসমূহ প্রকৃত বিচক্ষণতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে, আবাদের এমন আয়তন বৃদ্ধিতে বাধা কিন্তু দেয় পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানা। এমন কি, পুঁজিবাদী দেশের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আবাদগুলিও আধুনিক শক্তিশালী কলের লাঙল ও কম্বাইন সম্পূর্ণ রূপে কাজে লাগাইবার পক্ষে আয়তনের দিক দিয়া কদাচিৎ উপযোগী। আবার বৃহত্তর আবাদগুলিতেও এই সব যন্ত্রপাতির পূর্ণ ক্ষমতা কাজে লাগানো হয় না। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সকল বাধা চূর্ণ করিয়া কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির উন্নত প্রণালী সম্পূর্ণ রূপে কাজে লাগাইবার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

পুঁজিবাদের ফলে শিল্পের মত **কৃষিতেও বৃহদাকার উৎপাদন প্রাধান্য লাভ** করে এবং বৃহদাকার উৎপাদন কর্তৃক ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের হয় উচ্ছেদ। কৃষির অনুন্নত অবস্থার দরুন কিন্তু পুঁজিবাদী ক্রমবিকাশের এই সাধারণ নিয়ম কৃষির ক্ষেত্রে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে। কৃষির **অনুন্নত অবস্থার** ফলে যন্ত্রপাতির প্রচলন হয় অপেক্ষাকৃত মন্থর। এই কারণেই এমন কি অধিক অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশসমূহেও বহু **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি-আবাদের** অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই সমস্ত আবাদে শ্রমশক্তির বর্ব্বরোচিত অপপ্রয়োগ এবং প্রকৃতির উপর দস্যুতা করা হয়। পুঁজিবাদের আওতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক তাহার জমিখণ্ড, তাহার

বাহ্য স্বাধীনতার ঠাট বজায় রাখিবার জন্য সকল প্রকারের দুর্দশা ভোগ করে। ক্ষুদে আবাদসমূহ টিকিয়া থাকে কেবল কৃষক আর তাহার সমগ্র পরিবারের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের উপর। সেই সঙ্গে ক্ষুদে আবাদ জমির উর্ব্বরতা হ্রাস করে; জমি সার পায় কম, চাষও হয় না ভালো; গবাদি পশুর উৎকর্ষও পায় হ্রাস। প্রায় অমানুষিক শ্রম করিয়াও ক্ষুদ্র কৃষক ও তাহার পরিবার জীবন কাটায় অর্দ্ধাশনে। প্রাত্যহিক ভবিষ্যতের নিয়ত উৎকণ্ঠায় শেষ হয় তাহার দিন। প্রত্যেক করবৃদ্ধি, উৎপন্ন পণ্যের দামের প্রত্যেক পড়্‌তি, শিল্পদ্রব্যের দামের প্রত্যেকটি বাড়্‌তি তাহার স্বাধীনতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অমানুষিক চেষ্টা করিয়াও প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র কৃষক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অনেক সময় বড় বড় জমিদার চতুঃপার্শ্বস্থ কৃষকদের ক্ষুদে আবাদ-গুলি বাঁচাইয়া রাখা সুবিধাজনক মনে করে। ক্ষুদ্র একখণ্ড জমি লইয়া কৃষক তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। প্রতিবেশী বড় জমিদারের নিকট সে তাহার শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। অতিক্ষুদ্র জমিখণ্ডের মায়ায় কৃষক যদি বাঁধা না থাকিত, তবে হয়তো সে কাজের খোঁজে শহরে যাইত—ফলে জমিদার এমন সস্তা শ্রমশক্তি পাইত না। লেনিনের ভাষায় বলা যায়, এই কৃষকেরা 'ক্ষুদ্র জমিওয়ালা মজুরী-শ্রমিকে' পরিণত হয়।

"এইরূপে আমরা দেখি যে, পুঁজিবাদের প্রধান এবং মূল প্রবৃত্তি হইতেছে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই বৃহদাকার উৎপাদন কর্ত্তৃক ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের বহিষ্করণ। এই বহিষ্করণকে কেবল সদ্য বেদখল হিসাবে বুঝিলে চলিবে না; ছোট জোতদারের অবস্থার অবনতি ও ধ্বংসও ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই ধ্বংস এবং শোচনীয়

অবস্থা কয়েক বৎসর, কয়েক দশক ধরিয়া চলিতে পারে। অত্যধিক শ্রম, ছোট চাষীর প্রয়োজনীয় যথেষ্ট খাদ্যের অভাব, তাহার ঋণ-ভার, তাহার পালিত গবাদি পশুর খাদ্যের নিকৃষ্টতা ও রক্ষণাবেক্ষণের অপকৃষ্টতা, চাষ ও উর্ব্বরতা প্রভৃতি ব্যাপারে তাহার জমির অবস্থার অবনতি, যন্ত্রসংক্রান্ত উন্নতির অচলাবস্থা—ইত্যাদিতে এই শোচনীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।" *

বৃহদাকার কৃষির তুলনায় ক্ষুদ্রাকার কৃষির সুবিধা প্রচার করার সময়ে পুঁজিবাদের সমর্থকরা এই সমস্ত অবস্থা ইচ্ছা করিয়াই আড়াল করিয়া রাখে। ক্ষুদ্র কৃষকের ধৈর্য্য এবং সহনশক্তির প্রশংসায় ইহারা পঞ্চমুখ। কিন্তু যে-দুর্দ্দশা ক্ষুদ্র কৃষক ভোগ করিতেছে ইহারা ইচ্ছা করিয়াই তাহার উল্লেখ করে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বেশির ভাগ জমি রহিয়াছে বড় বড় জমিদার ও পুঁজিপতিদের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কবলে।

পুঁজিবাদী দেশসমূহে জমির বণ্টন ও কৃষকের অবস্থা

পুঁজিবাদী দেশসমূহে বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র কৃষকদের যে-জমি আছে তাহা একত্র করিলেও মুষ্টিমেয় বড় বড় জমিদারের অধিকৃত জমির অপেক্ষা কম হয়। অধিকাংশ জমি বড় বড় জমিদারের হাতে কেন্দ্রীভূত।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারী অনুসারে জার্মানিতে প্রত্যেক ১৭৷৷০ বিঘা পর্য্যন্ত পরিমাণের খামারের শতকরা ৬০ ভাগ জমির পরিমাণ মোট জমির ৬·৫ শতাংশ, পক্ষান্তরে প্রত্যেক ৮৭৷৷০ বিঘা অবধি

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ১৭শ খণ্ড, 'কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে নূতন তথ্য', পৃঃ ৬১৯, রুশ সংস্করণ।

পরিমাণের খামারের শতকরা মাত্র ১১·৫ ভাগ জমির পরিমাণ মোট জমির শতকরা ৬৭ ভাগ। ইহার অর্থ হইল এই যে মুষ্টিমেয় বড় জমিদারী (সকল কৃষিক্ষেত্রের প্রায় এক-দশমাংশ) সমগ্র জমির দুই-তৃতীয়াংশ দখল করিয়া রহিয়াছে, আর ক্ষুদ্র কৃষকের বিপুল সংখ্যাধিক অংশের হাতে রহিয়াছে মোট জমির মাত্র এক-ষোড়শাংশ। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে ৮৸০ (পৌনে নয় বিঘা) বিঘার কম পরিমাণের আবাদের সংখ্যা ছিল মোট আবাদের শতকরা ৩৮ ভাগ। তাহাদের জমির পরিমাণ ছিল মোট জমির শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র। এইরূপে কৃষকদের শতকরা ৪০ জন অধিকার করিল মোট জমির শতকরা আড়াই ভাগ মাত্র। কিন্তু ৮৭॥০ বিঘার আবাদগুলি (সমস্ত আবাদের শতকরা ১৬ ভাগ মাত্র) মোট জমির শতকরা ৭৪·৫ ভাগই গ্রাস করিয়াছে অর্থাৎ মোট জমির প্রায় তিন চতুর্থাংশ ইহাদের কবলে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পোল্যাণ্ডে মোট আবাদের শতকরা ৩৪ ভাগ গড়িয়া উঠিয়াছিল ১৭॥০ বিঘারও কম পরিমাণ আয়তনের আবাদের দ্বারা। ইহারা শতকরা মাত্র ৩·৫ ভাগ জমির মালিক ছিল। কিন্তু ৮৫০ বিঘা পরিমাণ আয়তনের সম্পত্তিসমূহের সংখ্যা ছিল সমগ্র আবাদের শতকরা মাত্র ০·৫ ভাগ, অথচ ইহারাই দখল করিয়াছিল মোট জমির প্রায় অর্দ্ধেক (শতকরা ৪৪ ভাগ)। হাঙ্গেরিতে (ক্ষুদ্র ও মধ্য আয়তনের) মোট আবাদের শতকরা ৯৯ ভাগ অর্দ্ধেক জমির মালিক, পক্ষান্তরে অপর অর্দ্ধেক শতকরা ১ ভাগের বড় জমিদারের সম্পত্তি। অন্য কথায় বলা যায়, ১০ হাজার জমিদারের প্রায় ১০ লক্ষ কৃষকের সমান জমি আছে।

বিপ্লবের পূর্ব্বে রুশিয়াতেও জমির বৃহত্তর অংশ ছিল জমিদার, রাজ-পরিবার, গীর্জা এবং কুলাকদের (ধনী এবং শোষণকারী কৃষক) কবলে। বিপ্লবের আগের রুশিয়ার ৩০ হাজার বড় বড় জমিদারের হাতেই

ছিল ৭০ কোটি বিঘা জমি। এক কোটি দরিদ্রতম কৃষকের আবাদেও ছিল ৭০ কোটি বিঘা জমি। এইরূপে প্রায় ৩৩৩টি দরিদ্র কৃষকের আবাদ জমিদারের এক-একটি বড় সম্পত্তির সমান ছিল। গড়পড়তা এক একজন বড় জমিদারের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২৩,৩১০ বিঘা, আর কৃষকের জমির পরিমাণ ছিল ৭০ বিঘা। টুক্‌রা মাত্র জমি অথবা একেবারে কিছুই নয়—ইহাই ছিল গ্রাম্য দরিদ্রের ভাগ্য। একমাত্র অক্টোবর-বিপ্লবই পরস্বোপজীবীদের জমি হইতে বিতাড়িত করিয়া শ্রমজীবী কৃষকদের হাতে সেই জমি তুলিয়া দিয়াছে।

জমির মালিকানার এই রকম ভাগাভাগির ফলে কৃষকরা **দাসত্ব** এবং **দারিদ্র্যের** কবলে গিয়া পড়ে। শ্রমজীবী কৃষক জমিদারের নিকট হইতে নিতান্ত দাসোচিত শর্তে জমি ইজারা লইতে বাধ্য হয়। অনুন্নত যান্ত্রিক ব্যবস্থার দরুন ক্ষুদ্রাকার কৃষির যে-অসুবিধা হয় তাহা ছাড়াও অপর কতকগুলি অবস্থা ক্ষুদ্র কৃষকের উপর চাপিয়া বসে। স্বীয় উৎপাদনের সব চেয়ে বড় অংশ তাহাকে দিতে হয় জমিদারের হাতে জমির খাজনা হিসাবে। সরকারও কর আদায় করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আমেরিকায় কৃষকের আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ কর দিতে নিঃশেষিত হয়। অজন্মা বা পারিবারিক বিপর্য্যয়ের দরুন যদি কখনও সে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তবে সুদের দায় হইতে নিজেকে আর কখনও সে মুক্ত করিতে পারে না। ফড়িয়া ব্যপারীরাও ক্ষুদ্র কৃষককে প্রতারিত করিয়া নানা রকমের দাসোচিত শর্তে তাহাকে জড়াইয়া ফেলে।

যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৩০-এর আদমশুমারীর তথ্যাদি মার্কিনী কৃষকদের দারিদ্র্য বিশদ রূপে চিত্রিত করিয়াছে। ১৯২০ হইতে ১৯৩০, এই দশ বৎসরে আবাদী জমির মোট দাম ১৬,৫০০ কোটি টাকা হইতে ১০,৫০০

কোটি টাকায় নামিয়াছে। প্রত্যেক আবাদের জমি ও ইমারতের গড়পড়তা দাম ৩০,০০০ টাকা হইতে ২২,৫০০ টাকায় নামিয়াছে। আবাদসমূহের সংখ্যা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৬৪ লক্ষ হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ৬৩ লক্ষ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ইজারা লওয়া কৃষকের সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৫৫ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৬ লক্ষ ৬৪ হাজার হইয়াছে। খাস আবাদসমূহের চাষের জমির পরিমাণ ২২২ কোটি ৯৫ লক্ষ বিঘা হইতে হ্রাস পাইয়া ২১৬ কোটি ৩০ লক্ষ বিঘা হইয়াছে। এই একই সময়ে ইজারা লওয়া আবাদসমূহের চাষের জমির পরিমাণ ৭৮ কোটি ৭৫ লক্ষ বিঘা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০৭ কোটি ১০ লক্ষ হইয়াছে। আমেরিকান কৃষকদের প্রধান অংশের দারিদ্র্য, কৃষকদের নিজেদের মালিকানা স্বত্বের জমির পরিমাণের হ্রাস, ইজারা জমির বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রাকার কৃষিগত আর্থিক ব্যবস্থার অবনতি—এই সব সম্বন্ধে উক্ত সংখ্যা পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয়।

কৃষিমন্ত্রীর সরকারী বিবরণ অনুযায়ী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জাপানে ৫৫ লক্ষ ৭৬ হাজার কৃষক পরিবারের মধ্যে ১৪ লক্ষ ৭৮ হাজারের কোনো রকমের জমি নাই। ইহারা বড় বড় জমিদারদের নিকট হইতে জমি ইজারা নেয়। ২৫ লক্ষের প্রত্যেকের নিজের জমির পরিমাণ ৪।০ বিঘারও কম। ১২ লক্ষ ৪০ হাজারের প্রত্যেকের নিজের জমির পরিমাণ হইল ৪।০ হইতে ৮৸০ বিঘার মত। এই উভয় শ্রেণীর 'মালিকদের' ২৩ লক্ষ ৬০ হাজার জন নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য অতিরিক্ত জমি ইজারা লইতে বাধ্য হয়। সাধারণত জমিদাররা নিজেদের জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া ইজারা দেয়; কারণ সস্তা শ্রমশক্তির তীব্রতম শোষণেও খাজনা হইতে কম আয় হয়। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির খণ্ড কৃষক পরিবারদের নিকট ইজারা দেওয়ার দরুন (কৃষিক্ষেত্র-

সমূহের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগের ক্ষেত্র প্রতি ৮৫০ বিঘার কম জমি চাষ হয়) মোট উৎপন্ন ধানের শতকরা ৫০ ভাগ বা তাহারও বেশী খাজনা হিসাবে জমিদার আদায় করিয়া নেয়।

পুঁজিবাদের আওতায় কৃষককে বঁচিবার জন্য নিদারুণ কঠোর সংগ্রাম করিতেই হয়। তাহার 'ব্যক্তিগত' আবাদ বাঁচাইয়া রাখার জন্য তাহাকে প্রাণান্ত শ্রম করিতে হয়। মাটির উর্ব্বরতা নিঃশেষিত হয়, গবাদি পশুর অবস্থা হয় উত্তরোত্তর হীনতর। কৃষক এবং তাহার পরিবারের জীবনযাত্রার অবস্থা দিন দিন দীনতর হইয়া পড়ে। কর তাহাকে গ্রাস করে, আবার জমির জন্যও তাহাকে দিতে হয় খাজনা। সহজেই সে মহাজনের নিকট বাঁধা পড়ে। এই মহাজন তাহার শেষ শক্তিবিন্দু নিঃশেষে শোষণ করিয়া ছাড়ে। দূরবর্ত্তী বাজারে লইয়া যাইতে পারে না বলিয়া কৃষক সাধারণত তাহার উৎপন্ন শস্যাদি এবং গবাদি পশু ফড়িয়া ব্যাপারীর নিকট বিক্রয় করে। মহাজন আর ব্যাপারীরা কৃষকদের তাহাদের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরে। গ্রামের উপর পুঁজির নিষ্পেষণের চাপ ক্রমশই জোরদার হইয়া উঠে।

পুঁজিবাদের অধীনে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্যের উৎপত্তি

পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে অতি অল্প সংখ্যক কৃষক সম্পদশালী হয়। তাহাদের কেহ কেহ জমি খরিদ করে, অত্যন্ত চড়া সুদে টাকা ধার দেয়; আবার কেহ বা ব্যবসা করিয়া ধনী হয়। আর একই সময়ে বিপুল জনসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যে ডুবিতে থাকে। অনেকে প্রথমত তাহাদের গরু, পরে এমন কি ঘোড়াও বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ঘোড়া হারাইয়া কৃষক অচিরেই ধনীর বলিতে পরিণত হয়। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য হয় তাহাকে ভাড়াটিয়া শ্রমিকে পরিণত হইতে হয়, নতুবা শহরে যাইতে হয়।

এইরূপে কৃষক সম্প্রদায়ের এক অংশ বুর্জোয়া শ্রেণীতে (কুলাক) এবং অপর অংশ মজুরী-শ্রমিকে পরিণত হয়। ইহারই ফলে পুঁজিবাদের আওতায় **গ্রাম্য বৈষম্যের উৎপত্তি** হয়।

এই দুই চরম স্তরের মধ্যে রহিয়াছে এক বিস্তৃত অংশ—**মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায়**।

"তাহাদের বিশেষ লক্ষণ হইতেছে এই যে, পণ্য-উৎপাদক কৃষি তাহাদের মধ্যে **অতি সামান্য** বিকাশ লাভ করে। কেবল সুবৎসরে এবং বিশেষ অনুকূল অবস্থায় এই রকমের কৃষকের স্বতন্ত্র কৃষিবৃত্তি তাহার ভরণপোষণ জোগাইতে সক্ষম হয়, এবং সেই কারণেই তাহার অবস্থাও অত্যন্ত অনিশ্চিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত কৃষক ঋণ গ্রহণ বা উপরি উপার্জ্জন ব্যতীত সংসার চালাইতে পারে না। এই ঋণ শোধ করিতে হয় শ্রম ইত্যাদির দ্বারা, এবং উপরি উপার্জ্জন আসে অংশত শ্রমশক্তি বিক্রয় প্রভৃতি হইতে। প্রত্যেক অজন্মাতেই বহু সংখ্যক মধ্যবিত্ত কৃষক সর্ব্বহারার পর্য্যায়ে অধঃপতিত হয়।" *

অনেক দেশে মধ্যবিত্ত কৃষকের অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান।

পুঁজিবাদ অধিকাংশ মধ্যবিত্ত কৃষকের জন্য কেবল একটি মাত্র পথই খোলা রাখিয়াছে : গ্রাম্য দরিদ্রের পর্য্যায়ে নামিয়া যাওয়া এবং পরে কৃষি-মজুরে পরিণত হওয়া। অল্প কয়েকজন উচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়া শোষকে পরিণত হয়। মধ্যবিত্ত কৃষকদের ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হওয়ার সাক্ষ্য হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৩০ খৃস্টাব্দের আদমশুমারীর তথ্য। আদমশুমারীর বিবরণে দেখা যায়, ক্ষুদ্র আবাদসমূহের (৭০ বিঘা হইতে কম) এবং বৃহৎ

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, "রুশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ," পৃঃ ২৩৭, মস্কো ১৯৩৪।

আবাদসমূহের (১৭৫০ বিঘার উপর) সংখ্যার বৃদ্ধি। মধ্যমাকার আবাদ-সমূহের (৭০ হইতে ১৭৫০ বিঘা) সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে যথেষ্ট।

গ্রামের শ্রমরত বিপুল জনসাধারণকে পুঁজিবাদ নিদারুণ দুর্দ্দশায় ফেলে, শিল্প ও কৃষির মধ্যে পুঁজিবাদ সৃষ্টি করে একটি ব্যবধানের ফাটল। যুগান্তব্যাপী অনগ্রসর অবস্থায় থাকিতে হয় গ্রামকে আর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয় ক্ষুদ্রাকার কৃষি-খামারকে। অতিরিক্ত কর, অপ্রচুর জমি ও

পুঁজিবাদী দেশে কৃষকের দারিদ্র্য

কৃষিজাত দ্রব্যের শোচনীয় দামের চাপে কৃষক আর্ত্তনাদ করে। বড় বড় জমিদারের ক্ষুদ্র মণ্ডলীর কবলে জমির একত্রীকরণের ফলে কৃষক সাধারণ যতদিন পর্য্যন্ত পুঁজিবাদের অস্তিত্ব থাকে ততকাল নিরন্তর দাসত্ব এবং পরাধীনতার জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। অধিকতর লাভজনক বৃহদাকার উৎপাদনের প্রতি-যোগিতার ফলে দরিদ্র কৃষক তাহার ক্ষুদ্র খামার রক্ষার জন্য অমানুষিক শ্রম করিতে বাধ্য হয়। কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য বহু সংখ্যক দরিদ্র কৃষককে কৃষি-মজুরের পর্য্যায়ে নামাইয়া আনে। ইহাদিগকে সহ্য করিতে হয় নিদারুণ শোষণের শোচনীয় যন্ত্রণা।

সঙ্কট পুঁজিবাদের সকল অসঙ্গতি এবং বিরোধকে চরমতম রূপে তীব্র করিয়া তোলে। এ পর্য্যন্ত যত সঙ্কট পুঁজিবাদী জগতকে আলোড়িত করিয়াছে বর্ত্তমান সঙ্কট তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র ও নিদারুণ; ইহা কৃষক সম্প্রদায়ের বিপুল জনসাধারণের অভাব ও দারিদ্র্যকে চরমে তুলিয়াছে। এই সঙ্কট নগর এবং পল্লীর অন্তর্ব্বিরোধ আরও গভীর করিয়াছে: পল্লীর অনুন্নত অবস্থাকেও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যের দাম অবিশ্বাস্য রকমে অল্প হওয়ার ফলে মধ্যবিত্ত কৃষক জনসাধারণ ধ্বংস হয়। একই সময়ে ব্যবহারকারী শ্রমিক জীবন ধারণের জন্য চিরাচরিত ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা চড়া দাম দেয়।

সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে পুঁজিবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে সর্ব্বহারা পল্লীতেও মিত্র এবং সহযোগী বন্ধু পায়। গ্রাম্য মজুরী-শ্রমিকও সর্ব্বহারা; কেবল পার্থক্য এই যে একজন উৎপাদকের জন্য যন্ত্র চালায়, এবং অপর জন জমিদার বা ধনী কৃষকের জন্য চালায় লাঙল।

বিপ্লবে কৃষক সম্প্রদায় সর্ব্বহারার মিত্র ও সাথী

ধ্বংসপ্রাপ্ত **গ্রাম্য দরিদ্র** শ্রমিক শ্রেণীর এক বিশ্বস্ত সমর্থক এবং একনিষ্ঠ মিত্র। পুঁজিবাদের অস্তিত্বে লাভ করিবার কিছুই নাই বলিয়া তাহার ধ্বংসে ইহার হারাইবারও নাই কিছুই। অবশেষে, **মধ্যবিত্ত কৃষক** (অনেক সময় ইহাদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ) সর্ব্বহারার কর্ম্মপদ্ধতি নির্ভুল হইলে তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। শক্তি অধিকারের সংগ্রামের সময়ে মধ্যবিত্ত কৃষককে নিরপেক্ষ করা অর্থাৎ সর্ব্বহারার শত্রুপক্ষে তাহার যোগ-দান বন্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক। বিজয় লাভের পর সর্ব্বহারা **মধ্যবিত্ত কৃষকের সহিত এক স্থায়ী মৈত্রী** প্রতিষ্ঠা করে। নবজীবনের সংগঠনে শ্রমিক শ্রেণী অবিচলিত ভাবে মধ্যবিত্ত কৃষককে সঙ্গে লইয়া চলে।

কুলাকদের (গ্রাম্য বুর্জোয়া শ্রেণী) বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ এবং নির্ম্মম সংগ্রামের ভিত্তিতেই একমাত্র সর্ব্বহারা ও মধ্যবিত্ত কৃষকগোষ্ঠীর মূল জন-সাধারণের মধ্যে স্থায়ী মৈত্রী স্থাপিত হইতে পারে। পুঁজিবাদের আওতায় শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের পথ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেয় কেবল মাত্র সর্ব্বহারা-বিপ্লবই। পুঁজিবাদের অধীনে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিবিশেষ কৃষক কদাচিৎ উন্নতির সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে এবং শোষণকারী ধনী কৃষকে পরিণত হইতে পারে। তাহাদের অধিকাংশের কিন্তু কেবল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অমানুষিক মেহনত করিতে হয়। ধ্বংস, দুর্দ্দশা, তাহাদের ক্ষণভঙ্গুর স্বাধীনতার হানি ও পরিণামে দরিদ্র হইয়া সর্ব্বহারার পর্য্যায়ে নামিয়া আসিতে বাধ্য হওয়ার

আশঙ্কা পুঁজিবাদের আওতায় মধ্যবিত্ত কৃষকের সম্মুখে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। একমাত্র সর্ব্বহারা-বিপ্লবই মধ্যবিত্ত কৃষকের সম্মুখে এক নূতন দৃশ্যপট উন্মোচন করিয়া দেয়, তাহাকে শোচনীয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণের পথ দেখায়।

সর্ব্বহারা-বিপ্লব নগরে ও গ্রামে পুঁজিবাদী শোষণের মূল উচ্ছেদ করে। ব্যাঙ্ক-মালিক, জমিদার ও কারখানা-মালিকদের পরস্বোপজীবী সুলভ মালিকানার অবসান ঘটাইয়া সর্ব্বহারা-বিপ্লব একই সময়ে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের বহু কালের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি দেয়ঃ প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থার দাসত্ব ও মহাজন প্রভৃতির নিকট তাহাদের ঋণ বাতিল করা হয়। অধিকন্তু সর্ব্বহারা-বিপ্লব দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের সম্মুখে বৃহদাকার সমাজতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এইরূপে পুঁজিবাদের অধীনে যে-ধ্বংস ও দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী ছিল তাহার সম্ভাবনাও বিদূরিত হয়।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। পুঁজিবাদের অধীনে নগর ও পল্লীর অসঙ্গতি বা বিরোধ কোথায়?

২। নির্ব্বিশেষ খাজনা ও বিশেষক খাজনার উৎস কী?

৩। জমির দাম কিরূপে নির্দ্ধারিত হয়?

৪। কৃষিতে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন অপেক্ষা বৃহদাকার উৎপাদনের সুবিধা কী?

৫। পুঁজিবাদী দেশসমূহে ভূসম্পত্তি কিরূপে বণ্টন হয়?

৬। পুঁজিবাদের অধীনে কিরূপে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্যের উদ্ভব হয়?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পুঁজিবাদের আওতায় পুনরুৎপাদন ও সঙ্কট

যে-কোনো দেশের দিকে তাকাইলেই আমরা দেখিতে পাই যে, বৎসরের পর বৎসর নানা প্রকারের দ্রব্য এক বিশেষ পরিমাণে উৎপাদিত হয়: যেমন রুটি, ছিটের কাপড়, রেল-ইঞ্জিন, লাঙল, বাসগৃহ, কয়লা, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, চিনি, রবার প্রভৃতি। মানুষের শ্রমে উৎপাদিত এই সমস্ত দ্রব্যের শেষ লক্ষ্য অবশ্য বিভিন্ন। রুটি, চিনি ও মাংস মানুষে খায়। কাপড় ব্যবহৃত হয় মানুষের অঙ্গাবরণ রূপে, ঘরবাড়ি বাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। মনুষ্যশ্রমে উৎপন্ন আরও অন্যান্য বহু জিনিসের পরিণতি সম্পূর্ণ পৃথক। লাঙল ব্যবহার করে চাষীরা জমি চাষের জন্য, যন্ত্রপাতি ও কারখানা ইমারতাদি ব্যবহৃত হয় আরও পণ্য উৎপাদনের জন্য; রেল-ইঞ্জিন ও রেলগাড়ি মাল ও মানুষ স্থানান্তরের কাজে লাগে।

উৎপাদনের উপকরণ ও ভোগের উপকরণ

মনুষ্যশ্রমে উৎপন্ন যে-সব জিনিস মানুষের আশু অভাব মোচনের কাজে যেমন (খাওয়া, পরা, আমোদ-প্রমোদ ও বসবাস প্রভৃতি ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য) ব্যবহৃত হয়, তাহাদের বলে **ভোগের উপকরণ**; আর মনুষ্যশ্রমে উৎপন্ন যে-সমস্ত দ্রব্য আরও দ্রব্য উৎপাদনের কাজে লাগে তাহাদের বলে **উৎপাদনের উপকরণ**। এই কথাটি মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, মনুষ্যশ্রমে উৎপন্ন

সমস্ত দ্রব্যই শেষ পর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা সামাজিক মণ্ডলীর কোনো-না-কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য কাজে লাগে; একমাত্র পার্থক্য হইল এই যে, কোনো কোনো জিনিস প্রত্যক্ষ ভাবে এই উদ্দেশ্য পূরণ করে—এইগুলি হইল ব্যক্তিগত ব্যবহারের বস্তু; আবার অন্যান্য জিনিসগুলি এই প্রত্যক্ষ ব্যবহারের বস্তুসমূহ **উৎপাদনের** জন্য কেবল ব্যবহৃত হয়—উৎপাদনের উপকরণ এই পর্য্যায়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষ ভোগের বস্তু ও উৎপাদনের উপকরণ—এই উভয় রূপেই কাজে লাগে এমন জিনিসও আছে অনেক। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উদাহরণ হইল কয়লা। উৎপাদনের উপকরণ রূপে কারখানায় এবং বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্রে বাষ্পীয় বয়লারে, আবার ভোগের উপকরণ রূপে গৃহস্থের উনানেও ব্যবহৃত হয় কয়লা। এই রকম উভয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন আরও অনেক বস্তুর কথা প্রত্যেকেরই জানা আছে।

পুঁজিবাদের আওতায় উৎপাদন পরিচালনের ব্যবস্থা থাকে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী বা তাহাদের মণ্ডলীর হাতে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, উৎপাদক একটি মাত্র উদ্দেশ্য লইয়া তাহার উৎপাদন পরিচালনা করে—তাহা হইল মুনাফা, ব্যক্তিগত লাভ। সুতরাং রেলগাড়ি না দেশলাই, সাধারণ ছিট না উত্তম সুগন্ধি, কী কী সে উৎপাদন করিবে সে-কথা তাহার কাছে একান্ত অবান্তর। আরও মুনাফাই হইল তাহার একটি মাত্র লক্ষ্য। একথা স্পষ্ট যে, ভোগের উপকরণ এবং উৎপাদনের উপকরণ প্রস্তুতের মধ্যে পুঁজিপতি কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করে না। উৎপাদক রবার না রবারের পেটি উৎপাদন করিবে তাহা নির্ভর করে একটি মাত্র

বিষয়ের উপর—অর্থাৎ কোনটিতে তাহার বেশী মুনাফা হইবে তাহার উপর।

যে-কোনো দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টি গতিশীল। ভোগের বস্তু উৎপাদকের নিকট হইতে যায় ব্যবহারকারীর নিকট। সেখানেই সেগুলি নিঃশেষিত হয়। কোনো কোনোটি বা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কাল ধরিয়া মানুষের অভাব পূরণ করে (যেমন, কাপড়, বই), আবার অন্যগুলি বেশ অল্প সময়েই নিঃশেষিত হয় (যেমন খাদ্য)। কল-কারখানায় প্রস্তুত বা ভূগর্ভে প্রাপ্ত উৎপাদনের উপকরণ কাজে লাগানো হয়। এই-গুলির কোনো কোনোটি স্বল্পকালস্থায়ী (যেমন কয়লা বা তৈল), পক্ষান্তরে অন্যগুলি খুব ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হয় এবং দীর্ঘ কাল পরেই কেবল সেগুলির জায়গায় নূতন আমদানি করার দরকার হয় (যেমন যন্ত্রপাতি)।

পুনরুৎপাদন কী?

একটি বিষয় সুস্পষ্ট। সমাজকে বাঁচাইতে হইলে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রক্ষা করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য শুধু একবার নয়, ক্রমাগত **বার বার** উৎপাদন করা প্রয়োজন। ইহা যে সত্য কথা তাহা সকলেই জানে।

পোশাক জীর্ণ হয়, কিন্তু কারখানায় নূতন পোশাক প্রস্তুত হইতেছে। খাদ্য নিঃশেষ হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মাঠে নূতন শস্য পাকিয়া উঠে। কয়লা জ্বালানো হয়, আবার খনি হইতে সর্ব্বদাই নূতন কয়লা আসিতেছে। রেল-ইঞ্জিন ক্ষয় পায়, যন্ত্রপাতি পুরানো হইয়া পড়ে; আবার মনুষ্য-শ্রমও অবিরতই নূতন নূতন দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করিতে ব্যস্ত।

এই সব ক্ষেত্রে এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এমন একটি বিষয় লক্ষ্যে পড়ে যাহা সকলের মধ্যেই

সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান। বিভিন্ন প্রকারের পণ্যসম্ভার উৎপাদন করা হয়, ব্যবহৃত হয়, আবার উৎপাদন করা হয়। দ্রব্যসম্ভার অবিরত পুনরুৎপাদিত হইতেছে।

> "সমাজে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার রূপ যাহাই হোক না কেন, সে-প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হইবেই। কিছু সময় পর পর একই পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া সে-প্রক্রিয়া চলিতে থাকিবেই। কোনো সমাজ যেমন ভোগ করা বন্ধ করিতে পারে না, তেমনই সে উৎপাদনও বন্ধ করিতে পারে না। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন সমগ্র রূপে, অবিরাম নব নব উৎপাদনের প্রবাহ রূপে দেখিলে দেখা যায়, প্রত্যেক সামাজিক উৎপাদন-প্রক্রিয়া যুগপৎ পুনরুৎপাদনেরও প্রক্রিয়া।" *

সহজ পুনরুৎপাদন (simple reproduction) ও বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের (extended reproduction) মধ্যে পার্থক্য করিতেই হইবে। যখন কোনো সমাজে একই দ্রব্য বৎসরের পর বৎসর একই পরিমাণে উৎপাদিত হয়, তখন আমরা দেখি **সহজ পুনরুৎপাদন**। এ-ক্ষেত্রে এক বৎসরে যাহা কিছু উৎপাদিত হয় সমস্তই ব্যবহৃত হইয়া নিঃশেষ হয়। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের অর্থ উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি। প্রতি বৎসরই প্রত্যেকটি দ্রব্যই পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এই ক্ষেত্রে আমরা পাই **বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদন**। পুনরুৎপাদন সম্পন্ন হয় বর্দ্ধিত আকারে। সমাজের জরাজীর্ণ নিশ্চল অবস্থা দূর করিয়া পুঁজিবাদ তাহার বিকাশে প্রচণ্ড গতি সঞ্চার করে। অতএব বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদন পুঁজিতন্ত্রের এক বৈশিষ্ট্য।

সহজ ও বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদন

* মার্ক্স, 'ক্যাপিটাল,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭৭-৭৮।

সমাজ-ব্যবস্থা যাহাই হোক না কেন, প্রত্যেক সমাজেই পুনরুৎপাদন চলে। কিন্তু পৃথক পৃথক সামাজিক ব্যবস্থায় পুনরুৎপাদনের পদ্ধতিও পৃথক হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, সমাজতন্ত্রের আওতায় পুনরুৎপাদন পুঁজিতন্ত্রের আওতায় পুনরুৎপাদন হইতে **সম্পূর্ণ** পৃথক পদ্ধতিতে ঘটিয়া থাকে। মার্ক্‌স্‌ বলেন : "উৎপাদন যদি পুঁজিবাদী ধরনের হয়, তবে পুনরুৎপাদনও তাহাই হইবে।"*

পুঁজিবাদের আওতায় পুনরুৎপাদন

পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় কেবল যে মনুষ্যশ্রমে উৎপন্ন বিবিধ বস্তুই পুনরুৎপাদিত হয় তাহা নয়; সামাজিক উৎপাদন-সম্বন্ধ, জনসাধারণের মধ্যে উৎপাদন-সম্বন্ধও পুনরুৎপাদিত অর্থাৎ পুনর্গঠিত হয়। বস্তুত পুঁজিবাদের আওতায় পুনরুৎপাদন বলিতে কেবল ব্যয়িত দ্রব্যসম্ভারের স্থান পূর্ণ করিতে ব্যবহারের জন্য নূতন শস্য, কয়লা এবং যন্ত্রপাতি বাজারে উপস্থিত করাই বুঝায় না; মানুষে-মানুষে যে-সম্পর্ক আছে সে-সম্পর্কের পুঁজিবাদী রূপ নিয়ত পুনর্গঠিত ও সংরক্ষিত হইতেছে, ইহাও বুঝায়। বৎসরের পর বৎসর শ্রমিকরা পুঁজিবাদী কল-কারখানায় শ্রম করিয়া চলে আর বৎসরের পর বৎসর এই সব প্রতিষ্ঠানের মালিকরা শ্রমিক শ্রেণীর শ্রমে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। ইহাতেই দেখা যায় যে, পাঁউরুটি, মাংস, ধাতু, কয়লা প্রভৃতি পণ্যই কেবল পুনরুৎপাদিত হয় না, পরন্তু **উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়** জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান নির্দিষ্ট **সম্বন্ধও** পুনরুৎপাদিত হয়। শ্রমিক শ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধও পুনরুৎপন্ন হয়। পুঁজিপতিদের বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে সম্বন্ধ প্রভৃতি অন্যান্য উৎপাদন-সম্বন্ধও পুনরুৎপাদিত হয়।

* ঐ, পৃঃ ৫৭৮।

আবার **পুঁজিবাদী সম্পর্কের পুনরুৎপাদন** বলিতে পুঁজিবাদী পদ্ধতির অন্তর্নিহিত গভীর **বিরোধের** পুনরুৎপাদনও বুঝায়। পুঁজিবাদের আওতায় **বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের** অর্থ কেবল বৎসরের পর বৎসর বিবিধ উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধিই নয়; পুঁজিবাদী কল-কারখানার সংখ্যা ও আকারের বৃদ্ধি এবং এই সব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের বর্দ্ধিত হারে শোষণ—পুঁজিবাদের আওতায় **বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদন** বলিতে ইহাও বুঝায়। পুঁজিবাদের আওতায় বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের অর্থ মজুরী-শ্রমিকের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিস্তার, দেশ হইতে দেশান্তরে পুঁজিবাদের বিস্তৃতি, উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় একটির পর একটিতে পুঁজিবাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা। অতএব পুঁজিবাদের সহিত বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের অর্থ হইল পুঁজিবাদী বিধানের নিদারুণ অসঙ্গতির নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি; এই বৃদ্ধি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে এক নূতন সমাজতান্ত্রিক বিধানের আগমন-পথ মুক্ত করিয়া দেয়। **পুঁজিবাদের বৃদ্ধি** এইরূপে সঙ্গে সঙ্গে নিজেই নিজের **ধ্বংস** লইয়া আসে।

আরও বেশী কয়লা বা লোহা উৎপাদনের জন্য নূতন খনি বা খাদ খনন করিতে হয়। অধিকতর পরিমাণে কাপড় উৎপাদনের জন্য নূতন নূতন তাঁত কাজে লাগাইতে হয়। সাধারণত, উৎপাদন সম্প্রসারিত করিবার জন্য প্রয়োজন হয় বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রসারণ অথবা নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ইহা কি ভাবে সম্পন্ন হয়?

পুঁজিবাদী সঞ্চয়

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উৎপাদনের উপকরণসমূহ মুষ্টিমেয় একদল লোকের সম্পত্তি। কল-কারখানা, কয়লা এবং ধাতুর খনি সমস্তই পুঁজিপতি শ্রেণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আদিম সঞ্চয় সম্বন্ধে আলোচনা

কালে আমরা দেখিয়াছি যে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি হইয়াছে লুণ্ঠন, জুলুম ও উচ্ছৃঙ্খল অনাচারের মধ্য হইতে। কিন্তু ইহার উৎপত্তি লাভের পর হইতেই বৎসরের পর বৎসর উৎপাদনের উপকরণে পুঁজিবাদীর মালিকানা স্বত্ব বজায় রাখা ও বিস্তৃত করা হইতেছে।

পুঁজিপতিকে উদ্বৃত্ত মূল্য জোগায় পুঁজি। উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। কোন আকারে এবং কি উপায়ে শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই উদ্বৃত্ত মূল্য বণ্টন করা হয়—তাহাও আমরা দেখিয়াছি।

প্রথমত ইহা মনে হইতে পারে যে, ব্যবসায়ী বুঝি তাহার মুনাফা লইয়া যাহা খুশি করিতে পারে। বস্তুত, পুঁজিতন্ত্রে এই বিষয়ে কোনো বিধিনিষেধ নাই। কোনো বস্ত্র-উৎপাদক বৎসরে তিন লক্ষ টাকা মুনাফা করিলে সেই অর্থ দিয়া সে যাহা খুশি করিতে পারে। ভোজনবিলাসী হইলে এই অর্থ সে আহার্য্যের জন্য ব্যয় করিতে, মদ্যপায়ী হইলে মদের জন্য ব্যয় করিতে পারে। পুঁজিপতি শ্রেণীতে এমন অনেক আছে যাহারা বস্তুতই এই সব জিনিসের পিছনেই তাহাদের মুনাফা খরচ করে; তবুও ইহা কিন্তু আসল ব্যাপার নয়।

এইরূপ কোনো লিখিত বিধি না থাকা সত্ত্বেও কিন্তু পুঁজিপতি তাহার মুনাফার একাংশ নিজের প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের জন্য ব্যয় করে। কদাচিৎ এই রীতির ব্যতিক্রম ঘটে। এইরূপে মূল পুঁজির সহিত উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশ-সংযোগকে আমরা বলি **পুঁজিবাদী সঞ্চয়**।

পূর্ব্বোক্ত বস্ত্র-উৎপাদক তাহার এক বৎসরের মুনাফা তিন লক্ষ টাকার মধ্য হইতে ১ লক্ষ ৮০ হাজার বা ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা

পুনরায় তাহার কারবারে নিয়োগ করিয়া তাহার কারখানা সম্প্রসারিত করে, নূতন এবং উন্নত যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। লাভের লালসা এবং প্রতিযোগিতার ভয়, এই দুই শক্তি এইরূপ কাজ করিতে তাহাকে বাধ্য করে। লাভের লালসার কোনো শেষ নাই। এই লক্ষণই হইতেছে পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। ব্যবসায়ীর পুঁজি যতই বিরাট এবং তাহার মুনাফা যতই বিপুল হোক না কেন, পুঁজিপতি সর্ব্বদাই নিজের সম্পদ ও মুনাফা বাড়াইতে সচেষ্ট। এই চেষ্টা সফল করিবার পক্ষে একটি মাত্র উপায়ই আছে—তাহা হইতেছে পুঁজির সহিত মুনাফার অংশের যোগ করিয়া পুঁজির সঞ্চয়। প্রতিযোগীদের দেখিয়া এই উৎপাদক নিশ্চিন্ত মনে তাহার সমগ্র মুনাফা শুধু নিজের ব্যক্তিগত এবং সকল প্রকার নিষ্ফল বিলাসে খরচ করিতে পারে না। সে দেখে, তাহার প্রতিযোগীরা আরও অধিক সুলভে উৎকৃষ্ট পণ্য উৎপাদন করিয়া প্রতিযোগিতা নির্ম্মূল করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের কারবারের উন্নতি, সম্প্রসারণ ও উৎপাদন-প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধনের জন্য সকল উপায়ে চেষ্টা করে। উপরোক্ত উৎপাদক যদি প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হইতে না চায়, তবে তাহাকে নিজের মুনাফার এক বিরাট অংশ তাহার কারবারে নিয়োগ করিতেই হইবে।

সঞ্চয় করিতেই হইবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এমন কোনো বিধি না থাকিলেও মৌলিক শক্তিসমূহই এই বাধ্যবাধকতা কার্য্যকরী করিয়া অধিকাংশ পুঁজিপতিকে তাহাদের মুনাফার এক অংশ সঞ্চয় করিতে বাধ্য করে। সর্ব্বহারা কর্ত্তৃক উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্যের সঞ্চয় হইতেছে বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের এক আবশ্যক শর্ত্ত।

প্রতি বৎসর মুনাফার এক অংশ সঞ্চয় করিয়া উৎপাদক ক্রমেই অধিকতর পুঁজির অধিকারী হয়। পূর্ব্বে যদি প্রতিষ্ঠানের মূল্য হইত

পুঁজির একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ

৩০ লক্ষ টাকা, ইহার সহিত (ধরা যাক) প্রতি বৎসর যদি ১৫০২১০ হাজার টাকা মুনাফা ক্রমশ সঞ্চয় হইতে থাকে, তবে উপরোক্ত উৎপাদকের এই প্রতিষ্ঠানের মূল্য দশ বৎসর পরে হইবে ৪৫-৫১ লক্ষ টাকার মত অর্থাৎ তাহার পুঁজি বাড়িবে দেড়গুণ বা তাহার চেয়েও বেশী। উদ্বৃত্ত মূল্যের সঞ্চয়ের সাহায্যে পুঁজির সম্প্রসারণকে বলে **পুঁজির একত্রীকরণ** (concentration)।

স্বতন্ত্র ভাবে পুঁজিপতিদের পুঁজিবৃদ্ধির আরও একটি পদ্ধতি আছে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান কি প্রকারে দুর্ব্বল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে, বড় পুঁজিপতি তাহার ক্ষুদে ও দুর্ব্বল প্রতিযোগীদের গ্রাস করে। ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদের সম্পত্তি মূল্য হইতে অনেক কম দামে ক্রয় করিয়া বা অন্য কোনো উপায়ে (যেমন ঋণ পরিশোধ করিয়া) তাহার প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত করিয়া বড় বড় পুঁজিপতি স্বীয় পুঁজি বৃদ্ধি করে। সংগ্রামের ফলেই কেবল নানা পুঁজি এই-ভাবে এক সঙ্গে সংযুক্ত হয়; এই সংগ্রামে অনেকে হয় ধ্বংস এবং অনেকে হয় আবার জয়ী। অনেক সময়ে আবার স্টক কোম্পানি, ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ (করপোরেশন) প্রভৃতি সংগঠন করিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে এই কাজ চলে। এই বিষয়ে পরে আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইবে। বহু প্রতিষ্ঠান মিশিয়া একটিতে পরিণত হওয়ার দরুন অনেক পুঁজি একই কেন্দ্রে আসিয়া সংহত হয়। এই ধরনের সমস্ত ঘটনার নাম দেওয়া হইয়াছে **পুঁজির কেন্দ্রীকরণ** (centralisation)।

পুঁজির একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের ফলে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ধনী লোকের হাতে পুঁজি ক্রমশ জড়ো হয়। বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি মুষ্টিমেয় কোটিপতি অপরিমেয় সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে। লক্ষ কোটি

মানুষের ভাগ্য তাহাদেরই মুষ্টির মধ্যে। এইরূপে পুঁজির একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের ফলে শ্রেণীবিরোধ তীব্র হইয়া পুঁজিবাদী সমাজকে দুই বিরোধী শ্রেণীতে আরও স্পষ্ট রূপে ভাগ করিয়া ফেলে; এক দিকে মুষ্টিমেয় বড় বড় পুঁজিপতি, অন্য দিকে অগণিত শোষিত সর্ব্বহারার দল।

পুঁজির একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ অল্প কয়েক ব্যক্তির হাতে প্রচুর সম্পদ একত্রিত করিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিক লাভজনক। সুতরাং পুঁজিতন্ত্রের পক্ষে ক্রমেই বড় বড় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা করা আদৌ আশ্চর্য্য নয়। এই সব প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য শ্রমিক নিয়ন্ত্রিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তনে ত্রিশ বৎসরে যে-পরিবর্ত্তন হইয়াছে তুলনামূলক সংখ্যা দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এখানে সংখ্যাগুলি তুলিয়া দেওয়া হইল।

(প্রতিষ্ঠান প্রতি গড়পড়তা)

	১৮৮৯	১৮৯৯	১৯০৯	১৯১৯
শ্রমিক ...	৮·১	১৩·৮	২৪·১	৩৮·০
পুঁজি (টাকায়, হাজারের অঙ্কে)	২০·১	৫৭·০	২০৬·১	৪৬২·৩
উৎপাদন (ঐ)	৪০·২	৮৪·৩	২৩১·৬	৬৫০·৭

বিপ্লবের আগে রুশিয়ার ক্ষেত্রে বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্রুত বৃদ্ধি আরও অধিক উল্লেখযোগ্য, সেখানে আয়তন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতি শ্রমিকের সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ ছিল :

প্রতিষ্ঠান *	১৮৯৫ (শতকরা অংশ)	১৯১৫ (শতকরা অংশ)
বৃহৎ (৫ শতের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত)	৪৫·২	৬১·১
মধ্যমাকৃতি (৫০—৫০০ শ্রমিক নিযুক্ত)	৩৮·৯	৩০·৬
ক্ষুদ্র (১০—৫০ শ্রমিক নিযুক্ত):	১৫·৯	৮·২

* দশজনের কম শ্রমিক নিযুক্ত আছে এইরূপ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে হিসাবে ধরা হয় নাই।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এক একটি প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকের গড়পড়তা সংখ্যা ছিল ৯৮·৫। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল শতকরা ১৭৩·৪।

১৯০১ হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে রুশিয়ার শিল্পের একত্রীকরণের প্রক্রিয়ার এক বিস্তৃত নির্ঘণ্ট এখানে দেওয়া গেল:

প্রতিষ্ঠানমণ্ডলী	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		শ্রমিকের সংখ্যা (হাজারের অঙ্কে)	
	১৯০১	১৯১০	১৯০১	১৯১০
৫০ জন পর্য্যন্ত শ্রমিক নিযুক্ত	১২,৭৪০	৯,৯০৯	২৪৪	২২০
৫১—১০০ জন পর্য্যন্ত শ্রমিক নিযুক্ত	২,৪২৮	২,২০১	১৭১	১৫৯
১০১—৫০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত	২,২৮৮	২,২১৩	৪৯২	৫০৮
৫০১—১০০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত	৪০৩	৪৩৩	২৬৯	৩০৩
১০০০-এর অধিক শ্রমিক নিযুক্ত	২৪৩	৩২৪	৫২৬	৭১৩
মোট ...	১৮,১০২	১৫,০৮০	১,৭০২	১,৯০৩

প্রাক্‌বিপ্লবী সংবাদপত্র **প্রাভ্‌দা**-তে লেনিন এক প্রবন্ধে এই নির্ঘণ্ট উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন:

"সকল পুঁজিবাদী দেশের পক্ষেই এই চিত্রটি সাধারণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা **হ্রাস পায়**: ক্ষুদে বুর্জোয়া, ক্ষুদে উৎপাদক ধ্বংস হয়, লোপ পায়। ইহারা কেরানি এবং কোনো কোনো সময়ে সর্ব্বহারায় পরিণত হয়। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সমগ্র শিল্পের সহিত ইহাদের অনুপাত আরও দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি

পাইতে থাকে। ১০০০-এর বেশী শ্রমিক নিয়োগকারী বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯০১ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রায় দেড়গুণ হইয়াছে: সংখ্যা বাড়িয়া ২৪৩ হইতে ৩২৪ হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচ লক্ষ (৫,২৬,০০০) অর্থাৎ সমগ্র শ্রমিকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের কম শ্রমিক নিয়োগ করিত। আর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইহারাই ৭ লক্ষের **বেশী** (৭,১৩,০০০), সমগ্র শ্রমিকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছিল। ছোট ছোট কারখানাগুলিকে ধ্বংস করিয়া বড় বড় কারখানাগুলি উৎপাদন নিয়তই অধিক পরিমাণে ঘনীভূত করে। ক্রমেই অধিকসংখ্যক শ্রমিক অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে জড়ো হয় আর এই লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের সম্মিলিত শ্রমের ফলে উৎপন্ন সমগ্র মুনাফা মুষ্টিমেয় কোটিপতির উদরসাৎ হয়।"

পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক ঝোঁক

পুঁজিবাদ আপনার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া শ্রমিককে ক্রমশই অধিকতর সামাজিক করিয়া তোলে। পৃথক পৃথক শিল্প-প্রতিষ্ঠান, অঞ্চল এবং দেশগুলির মধ্যে অভূতপূর্ব্ব পরিমাণে নানা সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। আগেকার আমলের কম-বেশী আত্মনির্ভরশীল স্বতন্ত্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট ও পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল বহু সংখ্যক শাখায় বিভক্ত হয়। পুঁজিবাদ বিভিন্ন জনসাধারণকে অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের কাজ সম্মিলিত করে। কিন্তু পুঁজিবাদের আওতায় উৎপাদনের সামাজিকতা-বিধান (socialisation) সমগ্র সমাজে বা শ্রমিক সাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সংসাধিত হয় না, **লাভের অঙ্ক বাড়াইতে সচেষ্ট** পুঁজিবাদের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থেই তাহা হয়। শ্রমের সামাজিকতা বিধানের বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রমের পুনর্বিভাগ এবং

পুঁজিপতিদের মধ্যে সংগ্রাম এবং প্রতিযোগিতাও বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ করিয়া সমগ্র সমাজের হাতে সেই মালিকানার হস্তান্তর বুঝিয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ সাধন এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সংগঠনই কেবল এই অসঙ্গতি ও বিরোধ দূর করিতে পারে।

পুঁজির একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন বৃদ্ধি হয়; ইহার ফলে উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকতা বিধানের সমাজতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের অনুকূল অবস্থা **তৈরী** হয়। হাজার হাজার শ্রমিক নিযুক্ত আছে, এই রকম বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান কারিগরের কারখানা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জিনিস। অসংখ্য ছোট ছোট কারখানা হাতে নেওয়া সমাজের পক্ষে কঠিন, কিন্তু উৎপাদন যখন কয়েকটি বিরাট বিরাট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে সংহত হয়, তখন উৎপাদনের সামাজিকতা বিধান সম্পূর্ণ সম্ভব।

পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ঐতিহাসিক ঝোঁক মার্ক্স্ নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন:

> "বিক্ষিপ্ত স্বাধীন শ্রমরত ব্যক্তি বিশেষের সহিত তাহার শ্রমের অবস্থার সংযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত যে-স্বোপার্জ্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে অপরের নামমাত্র স্বাধীন শ্রম অর্থাৎ মজুরী-শ্রমের শোষণের উপর নির্ভরশীল পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি।
>
> 'যে-মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনের এই ধারায় পুরাতন সমাজের সর্ব্বাঙ্গে রীতিমত পচন ধরিতে শুরু করে, যে-মুহূর্ত্তে শ্রমিকরা সর্ব্বহারায় পরিণত হয় এবং তাহাদের শ্রমের উপকরণ পরিণত হয় পুঁজিতে,

যে-মুহূর্ত্তে উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি স্বাবলম্বী হয়,—তখনই শ্রমের অধিকতর সামাজিকতা বিধান, জমি ও উৎপাদনের অপরাপর উপকরণসমূহের সর্ব্বজনগ্রাহ্য (এবং সেই হেতু) উৎপাদনের সামাজিক উপকরণে অধিক পরিমাণে রূপান্তর, এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারীদের অধিক পরিমাণে উচ্ছেদ সাধন এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। এখন যাহাকে উচ্ছেদ করিতে হইবে সে আর নিজের জন্য শ্রমরত শ্রমিক নয়, সে হইল বহু শ্রমিকের শোষক পুঁজিপতি। এই উচ্ছেদ সাধন সম্পন্ন হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মের দ্বারা, পুঁজির কেন্দ্রীকরণের দ্বারা। এক একজন পুঁজিপতি অনেকের বিনাশ সাধন করে। এই কেন্দ্রীকরণ, বা স্বল্প কয়েক জনের দ্বারা বহু পুঁজিপতির উচ্ছেদ সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমবর্দ্ধমান আকারে শ্রমপদ্ধতির সমবায়-রূপ, বিজ্ঞানের সচেতন যান্ত্রিক প্রয়োগ, বিধিসঙ্গত ভাবে ভূমিকর্ষণ, শ্রম-যন্ত্রের কেবল মাত্র সাধারণ ভাবে ব্যবহারযোগ্য শ্রমের যন্ত্রে রূপান্তর, উৎপাদনের সকল উপকরণকে যৌথ সামাজিক শ্রমের উৎপাদন উপকরণ রূপে ব্যবহার করিয়া তাহাদের মিতব্যয়িতা সাধন, পৃথিবী ব্যাপী বাজারের জালে সকল জনসাধারণের বিজড়িত হওয়া এবং সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী প্রভুত্বের আন্তর্জাতিক রূপ বিকাশ লাভ করে। পরিবর্ত্তনের এই পদ্ধতির সকল সুবিধার একচেটিয়া অধিকারী বড় বড় পুঁজিপতিদের সংখ্যা নিরন্তর ক্ষয় পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় প্রভূত দুরবস্থা, উৎপীড়ন, দাসত্ব, অবনতি, শোষণ; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহ। এই শ্রমিক শ্রেণী জনসংখ্যায় নিয়ত বর্দ্ধমান এবং খোদ পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার ব্যবস্থার দ্বারাই সুশৃঙ্খল, ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত।

যে-একচেটিয়া পুঁজিবাদ উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহারই ছায়ায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাই আজ উৎপাদন-পদ্ধতির অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। উৎপাদনের উপকরণসমূহের কেন্দ্রীকরণ এবং শ্রমের সামাজিকতা বিধান অবশেষে এমন এক স্থানে উপনীত হয় যেখানে তাহারা তাহাদের পুঁজিবাদী কাঠামোর বিরোধী হইয়া উঠে। এই কাঠামো খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্ত্যেষ্টির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ সাধন হয়।" *

আমরা দেখিয়াছি যে উৎপাদন আরম্ভ করিবার কালে প্রত্যেক পুঁজিপতি উৎপাদনের উপকরণ সমূহ (কাঁচামাল, জ্বালানী) বাজারে ক্রয় করে আর শ্রমিক ভাড়া করে (অর্থাৎ শ্রমশক্তি ক্রয় করে)। এখন কিন্তু পুঁজিপতি তাহার বাৎসরিক উৎপাদন সমাধা করিয়াছে। কাঁচামাল আর জ্বালানী ফুরাইয়াছে, শ্রমিকরা তাহাদের বৎসরের শ্রম ব্যয় করিয়াছে। প্রভূত পরিমাণ উৎপাদিত পণ্য, ধরা যাক, জুতা, উৎপাদকের গুদামে মজুত রহিয়াছে। উৎপাদন **পুনরারম্ভের** জন্য কী কী প্রয়োজন? জুতা উৎপাদন **চালু** রাখার জন্য কী কী দরকার?

পুনরুৎপাদন ও পণ্য বিক্রয়

স্পষ্টতই দেখা যায় যে, উৎপাদকের প্রয়োজন **নূতন** এক দফা কাঁচামাল ও জ্বালানী ক্রয় করা, শ্রমিকদের **পুনরায়** পরবর্তী বৎসরের জন্য ভাড়া করা। ইহার জন্য তাহার কিন্তু প্রয়োজন অর্থের। এই অর্থ উৎপাদক কোথা হইতে পাইবে? সে অবশ্য টাকা ধার করিতে পারে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে পরিশেষে তাহাকে এই ধার শোধ করিতেই হইবে। কাজেই উৎপাদককে তৈয়ারী পণ্য **বিক্রয়**

* মার্ক্স্ঃ 'ক্যাপিটাল,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮৮—৯

করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে (কোনো কোনো সময় বলা হয়, তাহাকে পণ্যের **নগদ মূল্য আদায় করিতে** হইবে)। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উৎপাদক পুনরায় শ্রমশক্তি ও উৎপাদনের উপকরণ ক্রয় করে। তাহার পরবর্ত্তী উৎপাদন-চক্র আবার চালু হয়। এইরূপে উৎপন্ন পণ্যের **নগদ মূল্য আদায়** হইতেছে উৎপাদন পুনরারম্ভের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত্ত, পুনরুৎপাদনের এক আবশ্যক শর্ত্ত। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে ব্যক্তিগত পুঁজিপতির জন্য পুনরুৎপাদনের পদ্ধতির তিনটি স্তর আছে—(১) উৎপাদনের উপকরণ ও শ্রমশক্তি ক্রয়, (২) খাস উৎপাদন-প্রক্রিয়া, (৩) উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার বিক্রয়। সহজেই বুঝা যায় যে দ্বিতীয় স্তরটি হইল **প্রত্যক্ষ উৎপাদন-প্রক্রিয়া**। এই সময় শ্রমিকরা পুঁজিপতিদের জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে। প্রথম ও শেষ স্তর **সঞ্চালনের প্রক্রিয়া** নির্দেশ করে: প্রথম স্তরে পুঁজিপতি তাহার টাকাকে রূপান্তরিত করে পণ্যে। শেষ স্তরটিতে কিন্তু ব্যাপারটি একেবারে বিপরীত। এখানে পুঁজিপতি তাহার পণ্য বিক্রয় করিয়া তাহার বিনিময়ে টাকা করে। প্রধানত উৎপাদন চালাইয়া যাওয়ার জন্য, ধারাবাহিক ভাবে উৎপাদনের জন্য, পুনরুৎপাদনের জন্য এই টাকা তাহার দরকার। পুঁজি এইরূপে তাহার আবর্ত্তন-চক্র পরিক্রমণ করে।

ইহা সুবিদিত যে পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি কেবল একজন মাত্র নয়, পরন্তু অনেক। ইহারা পরস্পরে সংগ্রাম অর্থাৎ প্রতিযোগিতা করিতেছে। নিজের পক্ষে সর্ব্বোত্তম উপায়ে প্রত্যেক পুঁজিপতি তাহার পুঁজি ব্যবহার করে। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন পুঁজিপতির কাজে এবং ফলে ভিন্ন ভিন্ন পুঁজির গতিতে পরস্পরে সংঘাত ও সংমিশ্রণ ঘটে। বিভিন্ন পুঁজির সম্পূর্ণ পরিমাণ একত্র মিলিত হইয়া সমগ্র ভাবে সামাজিক

পুঁজি সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদের আওতায় পুনরুৎপাদন এই বিভিন্ন পুঁজির গতির সংমিশ্রণের মধ্যে সম্পন্ন হয়; আবার এই বিভিন্ন স্বতন্ত্র পুঁজি যুগপৎ সমগ্র সামাজিক পুঁজিরও অংশ বিশেষ। পুনরুৎপাদন সম্পন্ন করিতে হইলে কেবলমাত্র কোনো কোনো ব্যক্তিগত পুঁজিপতির নয়, **পরন্তু সমস্ত পুঁজিপতির** পক্ষেই তাহাদের প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য-সমূহের নগদ মূল্য আদায় করিতে পারা প্রয়োজন।

> সমগ্র সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালনের প্রক্রিয়া ব্যাখা করিতে পারার মধ্যেই "মার্ক্সের তত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত কার্য্যকারিতা নিহিত রহিয়াছে।" *

সমগ্র ভাবে সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করিয়া মার্ক্সীয়-লেনিনীয় তত্ত্ব পুঁজিবাদী **পুনরুৎপাদনে** যে গভীরতম **অসঙ্গতি** দেখা দেয় তাহাও প্রকাশ করিয়া দেয়। পুঁজিবাদের আওতায় উৎপাদিত সমস্ত পণ্যসম্ভারের নগদ মূল্য আদায় করিতে হইলে যে জটিল **শর্তের** প্রয়োজন, পুনরুৎপাদনের তত্ত্ব তাহা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করে। কি ভাবে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রক্রিয়াই নিয়ত এই শর্তের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়া সমগ্র পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা লইয়া আসে এবং তাহার ফলে সংঘর্ষ ও সঙ্কট দেখা দেয়, পুনরুৎপাদনের তত্ত্ব তাহাও প্রকাশ করে।

পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের আওতায় কি অবস্থার মধ্যে পণ্যের নগদ মূল্য আদায় সম্পন্ন হয় তাহা আরও বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। কোনো পুঁজিবাদী দেশের সমগ্র উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভারের মূল্য, পণ্য

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, "মূল্য আদায়ের সমস্যা সম্পর্কে আর এক দফা" পৃঃ ৪১৪, রুশ সংস্করণ।

বিশেষের মূল্যের মতই, (১) স্থির পুঁজি (২) পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি (৩) উদ্বৃত্ত মূল্য, এই তিনটি অংশের দ্বারা গঠিত। আমরা ইহাও জানি যে বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সমবেত সংখ্যাকে দুইটি বড় মণ্ডলীতে বিভক্ত করা যায়—(ক) যে-সব প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জ্বালানি ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদন করে (খ) ভোগ্যবস্তু উৎপাদন—যে-সব প্রতিষ্ঠান ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করে।

সহজ ও বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের আওতায় নগদ মূল্য আদায়ের শর্ত্ত

> "নগদ মূল্য আদায়ের সমস্যা হইল—পুঁজিবাদী উৎপন্ন দ্রব্যের প্রত্যেকটি অংশের জন্য বাজারে ইহার মূল্যের দিক হইতে (স্থির পুঁজি, পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি ও উদ্বৃত্ত মূল্য) এবং বাস্তব গঠনের অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণ, ভোগ্য বস্তু, বিশেষত প্রয়োজনের সামগ্রী ও বিলাস-বস্তুর দিক হইতে ইহার তুল্যমূল্য অপর একটি অংশ খুঁজিয়া পাওয়া।" *

জটিলতা এড়াইবার জন্য ধরা যাক যে দেশের সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু দুনিয়ার কোনো অংশের পক্ষেই এই অবস্থা পুরাপুরি সত্য নয়। এমন কি, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও পুঁজিবাদী প্রকৃতির নয় এমন কারিগরী ও কৃষি-উৎপাদন কিছু পরিমানে বর্ত্তমান থাকে। যাই হোক, এক অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত ধরিলে সহজ পুনরুৎপাদনের আওতায় আমরা নিম্নলিখিত রূপ পরিস্থিতি দেখিতে পাইব। প্রথম মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্য-সম্ভারের পরিমাণ উভয় মণ্ডলীতে বৎসর ব্যাপী ব্যবহৃত দ্রব্যসম্ভারের

* ঐ ৩য় খণ্ড, নারদনিক অর্থনীতি-বিদদের তত্ত্ববিষয়ক ভ্রান্তি, পৃঃ ২২, রুশ সংস্করণ।

সমান হওয়া প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ যদি ধরা যায় যে, বৎসরে দুই কোটি মণ কয়লা ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে খনিগুলির বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণও অবশ্যই দুই কোটি মণের সমান হইবে। যদি বৎসরে এক লক্ষ তাঁত ক্ষয় হয়, তাহা হইলে নূতন তাঁতের উৎপাদনও এই সংখ্যার সমান হইবে। দ্বিতীয় মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানসমূহের বেলাতে তাহাদের উৎপাদিত সমস্ত পণ্যসম্ভারের (ভোগ্য বস্তুর) মূল্য উভয় মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল শ্রমিক ও পুঁজিপতির মিলিত আয়ের সমান হইবে। আমাদের অলোচ্য সমাজে অপর কোনো শ্রেণী না থাকায় শ্রমিক ও পুঁজিপতিদিগকেই উৎপাদিত সকল ভোগ্যবস্তুসম্ভার বস্তুত ব্যবহার করিতে হইবে, কিন্তু শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মিলিত আয় যতটা কুলায় তাহারা কেবল ততটাই ক্রয় কবিতে পারে, অর্থাৎ শ্রমিকরা তাহাদের মজুরীর সমান ও পুঁজিপতিরা উদ্বৃত্ত মূল্যের সমান পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে।

বাৎসরিক উৎপাদনের বিভিন্ন অংশের মূল্য আদায় হয় কিরূপে? উৎপাদনের উপকরণ রূপে বিদ্যমান থাকায় প্রথম মণ্ডলীর স্থির পুঁজি এই মণ্ডলীতেই আদায় হইবে। আবার ভোগ্যবস্তু রূপে বিদ্যমান থাকায় দ্বিতীয় মণ্ডলীর পরিবর্তনশীল পুঁজি ও উদ্বৃত্ত মূল্যের মূল্যও এই একই মণ্ডলীতেই আদায় হইতে পারে। দুইটি মণ্ডলীর মধ্যে কোন কোন অংশের বিনিময় হইবে? ইহার উত্তর দেওয়াও খুব কঠিন নয়। প্রথম মণ্ডলীর পরিবর্তনশীল পুঁজি ও উদ্বৃত্ত মূল্যের বিনিময় হইবে ভোগ্যবস্তুর সহিত, এবং দ্বিতীয় মণ্ডলীর স্থির পুঁজির বিনিময় হইবে উৎপাদনের উপকরণের সহিত। অনায়াসে বিনিময় সম্পাদনের জন্য এই অংশগুলিকে স্পষ্টতই পরস্পরের সমান হইতে হইবে। অতএব নিম্নলিখিত রূপ সমীকরণ (equation) সহজ পুন-

রুৎপাদনের এক শর্ত্ত। প্রথম মণ্ডলীর পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি ও উদ্বৃত্ত মূল্য অবশ্যই দ্বিতীয় মণ্ডলীর স্থির পুঁজির সমান হইবে।

স্থির পুঁজিকে 'স্থি' দ্বারা, পরিবর্ত্তনশীল পুঁজিকে 'প' দ্বারা এবং উদ্বৃত্ত মূল্যকে 'উ' দ্বারা মার্ক্‌স চিহ্নিত করেন। মণ্ডলীসমূহকে চিহ্নিত করা হইয়াছে সংখ্যার দ্বারা। তাহা হইলে মৌলিক পুনরুৎপাদনের সূত্র এইরূপ দাঁড়ায়—

১ (প+উ) =২ (স্থি)

এখন দেখা যাক বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের অধীনে মূল্য আদায়ের শর্ত্ত। আমরা পুর্ব্বেই অবগত হইয়াছি যে, সহজ পুনরুৎপাদন কেবল একটি কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ প্রকৃতপক্ষে বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের পথেই অগ্রসর হয়। বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের অধীনে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মূল্য আদায়ের শর্ত্তে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় ? বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের মূলে আছে সঞ্চয়। একটি প্রতিষ্ঠানকে প্রসারিত করিতে হইলে হয় তাহাকেই বাড়াইতে হইবে নতুবা নূতন একটি গড়িতে হইবে। যাই হোক না কেন, কতিপয় নূতন উৎপাদন উপকরণ যোগ করিতেই হইবে। কিন্তু আপনা হইতে আসে না বলিয়া উৎপাদনের এই সব উপকরণই প্রথমে উৎপাদন করা প্রয়োজন। ইহার অর্থ এই যে, উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদনকারী প্রথম মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত উৎপাদন-উপকরণ অবশ্যই থাকিতে হইবে। আবার ইহার তাৎপর্য্য হইল এই যে, প্রথম মণ্ডলীর পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি ও উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ দ্বিতীয় মণ্ডলীর স্থির পুঁজি অপেক্ষা অবশ্যই **অধিক** হইবে। কেবল এই ক্ষেত্রেই বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত উৎপাদন-উপকরণ থাকিবে। অর্থাৎ ১ (প+উ) অবশ্যই ২ (স্থি) অপেক্ষা বেশী হইবে।

আমরা জানি যে, পুঁজিবাদের অধীনে স্থির পুঁজি পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি অপেক্ষা দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পায়। পুঁজির আঙ্গিক গঠন বাড়ে, নিয়োজিত শ্রমিক প্রতি যন্ত্রপাতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আমরা আরও দেখি যে, বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের অধীনে প্রথম মণ্ডলীর পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি (উদ্বৃত্ত মূল্য সহ) দ্বিতীয় মণ্ডলীর স্থির পুঁজি অপেক্ষা দ্রুততর বেগে অবশ্যই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে প্রথম মণ্ডলীর স্থির পুঁজির বৃদ্ধি দ্বিতীয় মণ্ডলীর স্থির পুঁজির বৃদ্ধি অপেক্ষা অবশ্যই অনেক বেশী হইবে। ইহার অর্থ এই যে, বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের আওতায় সামাজিক উৎপাদনের যে অংশ উৎপাদনের উপকরণ তৈয়ারীতে নিযুক্ত আছে তাহা ভোগ্যবস্তু উৎপাদনে নিযুক্ত অংশ অপেক্ষা অবশ্যই দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইবে।

দেখা যাক বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের অধীনে মূল্য আদায়ের জন্য জটিলতার শর্ত্ত কী? সহজ পুনরুৎপাদনে সমগ্র উদ্বৃত্ত মূল্যই ভোগ করে পুঁজিপতি। বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনে প্রত্যেক মণ্ডলীর উদ্বৃত্ত মূল্য দুই অংশে বিভক্ত:—(১) ব্যবহারে নিঃশেষিত অংশ এবং (২) সঞ্চিত অংশ। সঞ্চিত অংশ পুঁজির সহিত সংযুক্ত হয়। প্রত্যেক মণ্ডলীর পুঁজি স্থির ও পরিবর্ত্তনশীল অংশ লইয়া গঠিত হওয়ায় সঞ্চিত উদ্বৃত্ত মূল্যও স্থির ও পরিবর্ত্তনশীল দুই অংশে বিভক্ত হইবে। আমরা সমগ্র উদ্বৃত্ত মূল্যকে 'উ' অক্ষর দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছি। পুঁজিপতি যে-অংশ ব্যবহার করিয়া নিঃশেষ করে (অর্থাৎ ভোগ করে) তাহাকে 'ক' অক্ষর দ্বারা এবং সঞ্চিত অংশকে 'থ' অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা যাক। স্থির পুঁজির সহিত সংযুক্ত সঞ্চিত উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশকে 'থ স্থি' অক্ষর দ্বারা এবং পরিবর্ত্তনশীল পুঁজির সংযুক্ত অংশকে 'থ প' অক্ষর দ্বারা আমরা চিহ্নিত করিব। এক্ষণে বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের

অধীনে মূল্য আদায়ের পদ্ধতি নিম্নলিখিত রূপ হইবে। সহজ পুনরুৎপাদনের ন্যায়ই, দ্বিতীয় মণ্ডলীকে প্রথম মণ্ডলীর সহিত ইহার স্থির পুঁজি—'স্থি'—বিনিময় করিতে হয়। বৎসরের শেষে, ইহা ভোগ্য বস্তু রূপে থাকে, কিন্তু উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপকরণ রূপে অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি রূপে ইহাকে পাওয়া প্রয়োজন। প্রথম মণ্ডলী আবার দ্বিতীয়ের সঙ্গে নিজের পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি বিনিময় করিতে বাধ্য। ওই পরিবর্ত্তনশীল পুঁজি শ্রমিকদের ভোগ্য হইলেও কিন্তু উহা উৎপাদনের উপকরণরূপে বর্ত্তমান। দ্বিতীয় মণ্ডলীর উদ্বৃত্ত মূল্যের ভোগ্য অংশ ভোগ্যবস্তু রূপে থাকে; তাই প্রথম মণ্ডলীর সহিত ইহার বিনিময় করার প্রয়োজন হয় না। প্রথম মণ্ডলীর উদ্বৃত্ত মূল্যের ভোগ্য অংশকে 'ক' দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই অংশ থাকে উৎপাদনের উপকরণ রূপে। সুতরাং দ্বিতীয় মণ্ডলীর দ্বারা উৎপাদিত ভোগ্যবস্তুর সহিত ইহার বিনিময় করিতে হয়। প্রথম মণ্ডলীর উদ্বৃত্ত মূল্যের সঞ্চিত অংশ 'খ স্থি'—উৎপাদন উপকরণ—এবং 'খ প' শ্রমিকদের জন্য ভোগ্যবস্তু রূপে বিভক্ত হয়। সমস্ত ভোগ্যবস্তু রহিয়াছে দ্বিতীয় মণ্ডলীর হাতে; সুতরাং দ্বিতীয় মণ্ডলীর সঙ্গেই 'খপ' বিনিময় করিতে হইবে। দ্বিতীয় মণ্ডলী 'খ স্থি' অংশ তাহার স্থির পুঁজির সহিত যোগ করে; তাই প্রথম মণ্ডলীর সহিত ইহাকে বিনিময় করিতে হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মণ্ডলীর 'খপ' অংশকে বিনিময় করিতে হয় না, কারণ এই অংশে থাকা দরকার শ্রমিকদের ভোগ্য দ্রব্যসম্ভার আর থাকেও তাহাই। বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় মণ্ডলীর মধ্যে কিরূপ বিনিময় সম্পাদিত হয় তাহা এখন দেখা যাক। প্রথম মণ্ডলীকে 'ক', 'প' এবং 'খ প' বিনিময় করিতে হয়: দ্বিতীয় মণ্ডলীকে বিনিময় করিতে হয় 'স্থি' এবং 'খ স্থি'। ইহা প্রত্যক্ষ যে উল্লিখিত

সমষ্টি দুইটি পরস্পর সমান হইলে অর্থাৎ ১(প+ক+খপ) =২(স্থি+খ স্থি) হইলেই কেবল বিনিময় সম্ভব। বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের আওতায় মূল্য আদায়ের ইহাই হইল শর্ত্ত।

সহজ ও বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের আওতায় পণ্যের মূল্য আদায়ের আবশ্যক শর্ত্ত সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিলেও কিন্তু মার্ক্সীয় তত্ত্ব আদৌ বলে না যে এই শর্ত্ত বিদ্যমান। পক্ষান্তরে নিয়ত **পরিবর্ত্তন** ও **বিচ্যুতির** মধ্য দিয়া শিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে-পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা উচিত ক্রমাগত তাহাকে **ব্যাহত** করিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমগ্র গতি চলিতে থাকে।

পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের অসঙ্গতি

পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত সমস্ত অসঙ্গতি বা বিরোধকে প্রকাশ করিয়া দেয়। পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় **পুঁজিবাদের মৌলিক অসঙ্গতি** (উৎপাদনের সামাজিক প্রকৃতি এবং আত্মসাৎকরণের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী প্রকৃতির মধ্যে অসঙ্গতি) স্পষ্ট হইয়া উঠে। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ বহু সহস্র শ্রমিককে সম্মিলিত করে। সমগ্র সমাজের পক্ষে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কাজ অপরিহার্য্য ভাবে প্রয়োজন। সামাজিক বিকাশের সমস্ত শক্তি, যন্ত্রবিজ্ঞানের সমস্ত শক্তি, শত সহস্র লোকের সম্মিলিত সামাজিক শ্রমের শক্তি এই প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজে নিযোগ করে। কিন্তু এইগুলি মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির অধিকারভুক্ত; এইগুলিকে তাহারা পরিচালিত করে নিজেদের স্বার্থসাধনের, সর্ব্বাধিক মুনাফা অর্জ্জনের জন্য।

পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে **বুর্জোয়া শ্রেণী ও সর্ব্বহারা শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি পায়।** আমরা দেখিয়াছি, পুঁজির পুনরুৎপাদন ও সঞ্চয়ের ফলে একদিকে হয় পুঁজিপতির ক্ষুদ্র একটি

মণ্ডলীর হাতে বিপুল সম্পদের ক্রমবর্দ্ধমান সঞ্চয় এবং অপর দিকে বৃদ্ধি পায় সর্ব্বহারা সম্প্রদায়ের বিশাল জনসাধারণের শোষণ, উৎপীড়ন দুর্দ্দশা এবং সেই সঙ্গে তাহাদের বিক্ষোভ ও সংগ্রামের ইচ্ছা।

পুঁজিবাদের মূল অসঙ্গতি (উৎপাদনের সামাজিক প্রকৃতি এবং ভোগ-দখলাধিকারের ব্যক্তিগত প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ) উৎপাদনের বিশৃঙ্খলায় (অর্থাৎ পরিকল্পনাহীনতার প্রভাবে) আত্মপ্রকাশ করে। সামাজিক উৎপাদনের এই বিশৃঙ্খলা পুঁজিতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে এঙ্গেল্‌স্‌ নিম্নলিখিতরূপে অভিহিত করিয়াছেন :

> "পণ্য-উৎপাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক সমাজের বিশেষত্ব হইল এই যে, এইরূপ সমাজে উৎপাদকরা নিজেদের সামাজিক সম্পর্কের কর্ত্তৃত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। নিজের হাতে উৎপাদনের যে-উপকরণ রহিয়াছে তাহারই সাহায্যে প্রত্যেকেই উৎপাদন করে নিজের জন্য এবং বিনিময় মারফত নিজের নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য। কেহই জানে না তাহার উৎপাদিত দ্রব্য কি পরিমাণ বাজারে আমদানী হয় বা বাজারে তাহার কি পরিমাণ চাহিদা আছে। কেহই জানে না তাহার ব্যক্তিগত উৎপন্ন দ্রব্য প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করিবে কি না, তাহার খরচ উঠিবে কি না, কিম্বা সে আদৌ বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবে কি না। সামাজিক উৎপাদনে বিশৃঙ্খলার প্রভাব বাড়িয়া উঠে। কিন্তু অন্যান্য সকল উৎপাদন-ব্যবস্থার মতই পণ্য-উৎপাদনেরও অন্তর্নিহিত এবং অবিচ্ছেদ্য নিজস্ব নিয়ম আছে; এবং এই সমস্ত নিয়ম বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও তাহার অভ্যন্তরে এবং তাহার মধ্য দিয়াই আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। বিনিময়ে প্রচলিত একমাত্র সামাজিক সম্পর্ক রূপেই কেবল এই নিয়মসমূহ আত্মপ্রকাশ করে

এবং প্রতিযোগিতার বাধ্যতামূলক নিয়ম হিসাবে স্বতন্ত্র উৎপাদকদের উপর নিজেদের শক্তিশালী করে। সুতরাং সূচনাতে এমন কি এই সব উৎপাদকের নিকটও এই নিয়মসমূহ ছিল অজ্ঞাত, ফলে কেবল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই তাহা ক্রমশ আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। সুতরাং তাহারা তাহাদের উৎপাদনের ধরনের স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে উৎপাদকদের ছাড়াই এবং তাহাদের বিরুদ্ধে বিচারবিহীন ভাবে কাজ করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদকের উপর প্রভুত্ব করে।" *

পুঁজিবাদী মূল্য আদায়ের শর্তসমূহ কি জটিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু এই সব শর্ত যথাযথ প্রতিপালিত হয় কি না তাহা দেখে কে? পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মত একটি পরিকল্পনাহীন বিশৃঙ্খল ব্যবস্থায় মূল্য আদায়ের শর্তসমূহ যে কেবল **বাজারের অর্থশক্তির** দ্বারা কার্য্যকরী হয় তাহা বিশেষ ভাবে সতত প্রতীয়মান হয়। পুঁজিবাদের অধীনে পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য শিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে-পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজন তাহা অসংখ্য পরিবর্তন ও বিচ্যুতি এবং বিরামবিহীন ব্যতিক্রম-প্রবাহের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলে।

শিল্পের সীমাহীন প্রসারপ্রবণতা পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত **লক্ষণ**। মুনাফার প্রতিযোগিতায় যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে পণ্যসম্ভার বাজারে রফ্তানী করিবার চেষ্টা প্রত্যেক পুঁজিপতিই করে। আপনার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য সে তাহার শিল্প-প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের চেষ্টা করে। উৎপাদিত পণ্য কিন্তু কাহারও নিকট অবশ্যই বিক্রয় করিতে হইবে। পক্ষান্তরে বিপুল জনসাধারণের **ভোগের পরিমাণ হ্রাস**

* এঙ্গেল্‌স্‌ : 'হের ইউজেন-এর বিজ্ঞানে বিপ্লব', পৃঃ ৩০৫

করিয়া চূড়ান্ত শোচনীয় পর্য্যায়ে নামাইয়া আনা-ই হইল পুঁজিবাদের প্রকৃতি। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসারণে প্রযুক্ত উৎপাদনের উপকরণসমূহের চাহিদা বৃদ্ধি হইল পুঁজিবাদের বাজার প্রসারের জন্য কিছু পরিমাণ দায়ী। শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদনের এই সব উপকরণ-নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান পরিমাণে ভোগ্য পণ্য উৎপাদন করে। কিন্তু সর্ব্বহারা সাধারণের দারিদ্র্যের জন্য এই সব পণ্যের বাজার সীমাবদ্ধ। এইরূপে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত **উৎপাদন** ও **ভোগের** আভ্যন্তরীণ **অসঙ্গতি** পুনরুৎপাদনের পদ্ধতির মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করে। এই অসঙ্গতি হইল পুঁজিবাদের মূল অসঙ্গতির (উৎপাদনের সামাজিক প্রকৃতি ও ভোগ-দখলাধিকারের ব্যক্তিগত প্রকৃতির মধ্যে অসঙ্গতির) অভিব্যক্তির অন্যতম রূপ মাত্র।

কিন্তু পুঁজিবাদের এই অসঙ্গতি বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা সম্পূর্ণ ভুল হইবে যে, সাধারণ ভাবে পুঁজিবাদ টিঁকিতে পারে না। বর্ত্তমানে পুঁজিবাদ আপনার পতন ও ধ্বংসের মধ্য দিয়া চলিতেছে। তথাপি এক বিশেষ যুগে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এক উন্নততর, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক সামাজিক উৎপাদন-শক্তির বিকাশ সাধন করিয়াছিল। অসঙ্গতিসমূহের সংঘাতের মধ্য দিয়া ছাড়া পুঁজিবাদের ক্রমোন্নতি বিকাশ লাভ করিতে পারে না। এই অসঙ্গতি-সমূহ লক্ষ্য করিলে পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক অস্থায়ী প্রকৃতি সহজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে, উন্নত রূপে বিবর্ত্তনের দিকে গতির কারণ ও শর্ত্তসমূহ প্রাঞ্জল হইয়া উঠে।

পুনরুৎপাদনের মার্ক্সীয়-লেনিনীয় তত্ত্ব পুঁজিবাদের সমর্থকদের সকল প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন সর্ব্বপ্রকার বাধা সংঘর্ষ বা সঙ্কট এড়াইয়া অব্যাহত রূপে

ও স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে—পুঁজিবাদের ভাড়াটিয়া স্তাবকদের এই মর্ম্মের নিছক অসার গবেষণার মুখোশও খুলিয়া দেয় এই তত্ত্ব। পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন অন্তর্নিহিত বিরোধ ও অসঙ্গতির জন্য যে আদৌ চলিতে পারে না, এই মতবাদের অসারতাও মার্ক্সীয়-লেনিনীয় তত্ত্ব সুনিশ্চিত রূপে দেখাইয়া দেয়। পুঁজিতন্ত্রের সূচনাতে এই মতবাদের অনুগামীরা পুঁজিতন্ত্রকে 'অসম্ভব' কিছু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। আধুনিক অবস্থায় এই ভ্রমাত্মক তত্ত্বের অনুগামীরা এইরূপ প্রবঞ্চনামূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, পুঁজিবাদ তাহার অন্তর্নিহিত ধ্বংসকর অসঙ্গতির জন্যই সর্ব্বহারার বিপ্লবী সংগ্রাম ব্যতীতই স্বতঃই অবশ্যম্ভাবী রূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের নিয়ম উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন মার্ক্স্। তিনিই দেখাইয়াছেন, পুঁজিবাদের অধীনে পুনরুৎপাদন কি প্রকারে সংঘটিত হয়। মার্ক্সের কোনো কোনো সমালোচক (রোজা লুক্সেমবুর্গ তাঁহাদের অন্যতম) দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, পুঁজিবাদের অধীনে পুনরুৎপাদন ততদিনই সম্ভব যতদিন পুঁজিবাদ পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষুদ্রাকার পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থার সমস্ত শেষ চিহ্ন বিলোপ না করে। রোজা লুক্সেমবুর্গের এই ভ্রমাত্মক তত্ত্বের অনুগামীরা সচরাচর ইহা হইতে অত্যন্ত অনিষ্টকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাহারা কতকটা এইরূপ যুক্তি দেখায়: সহজ পণ্য-উৎপাদনের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইবার পর পুঁজিবাদ আর পুনরুৎপাদন চালাইতে অক্ষম হইয়া নিশ্চিত বিনষ্ট হইবেই। কাজে কাজেই পুঁজিবাদী ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধনের জন্য আমাদের সংগ্রামে লিপ্ত হইবার কোনো আবশ্যকতা নাই। কখন পুঁজিবাদের সৌধচূড়া আপনা হইতে ধ্বসিয়া পড়িবে, সেই সুলভ মুহূর্ত্তটির প্রতীক্ষায় তাহারা নিশ্চেষ্ট শান্ত ভাবে দিন কাটায়। ইহা খুবই প্রত্যক্ষ যে, এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী বিপ্লবী মার্ক্স্‌বাদ-লেনিনবাদের ঘোরতর

বিরোধী। পুঁজিবাদের বিনাশ আপনা হইতে স্বতপ্রবৃত্ত হইয়াই আসিবে না। একমাত্র সর্ব্বহারার অপরিসীম আত্মত্যাগে পরিচালিত বিপ্লবী সংগ্রামই পুঁজিবাদ, দাসত্ব আর উৎপীড়ন-অত্যাচারের সমাধি রচনা করিবে।

এ, রোচেস্টার কর্ত্তৃক লিখিত 'শ্রমিক ও কয়লা' শীর্যক একখানা বইয়ে আমেরিকার খনি-মজুরদের জীবন বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই বই হইতে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হইতেছে :

"একজন খনি-মজুরের ছেলে তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল—'আগুন জ্বালছো না কেন মা? বড় যে ঠাণ্ডা।' 'আমাদের যে কয়লা নেই বাবা; তোর বাবা যে বেকার, তাই আমাদের কয়লা কেনবার টাকা নেই।' 'কিন্তু বাবার চাকরী নেই কেন মা?' 'অনেক কয়লা মজুত রয়েছে, তাই'।"*

প্রত্যেক পুঁজিবাদী সঙ্কটে যে-বিরোধ প্রকট হইয়া উঠে উপরোক্ত কথোপকথনের মধ্যে তাহার নিখুঁত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভূগর্ভের তমসাচ্ছন্ন যক্ষপুরী লুণ্ঠন করিয়া 'অত্যন্ত বেশী পরিমাণে' কয়লা উত্তোলন করা হইয়াছে বলিয়াই তো কয়লা না পাইয়া খনি-মজুরের পরিবারকে শীতে জমিতে হয়! লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ নিরুপায় বুভুক্ষায় কালাতিপাত করে, কারণ 'অত্যন্ত বেশী পরিমাণে' রুটি উৎপাদিত হইয়াছে এবং সেইজন্য রেল-ইঞ্জিনের জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হইতেছে গম! 'অত্যন্ত বেশী সংখ্যায়' বাড়ি তৈয়ারী হওয়ায় খালি পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়াই না বেকার জনসাধারণ এবং তাহাদের পরিবারদের মাথা গুঁজিবার মত কোনো রকম আশ্রয়ও জোটে না!

* পৃঃ ১১, ইণ্টার ন্যাশনাল পাব্লিশার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩১।

কিন্তু সত্যই কি 'অত্যন্ত বেশী' রুটি, কাপড়, কয়লা, বাড়ী ঘর ইত্যাদি তৈরী হইয়াছে ? এ-কথা সর্ব্বজনবিদিত যে, সঙ্কটের সময় বিপুল জনসাধারণ জীবন ধারণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারেরও নিদারুণ অভাব অনুভব করে। কিন্তু এই সব পণ্য **ক্রয় করিবার** মত টাকা-পয়সা তাহাদের নাই। কোনো পণ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে—পুঁজিবাদের আওতায় এই কথার অর্থ হয়, যদি সেই পণ্য কিনিবার মত **নগদ টাকা হাতে** থাকে। সঙ্কটের সময়ে রুটি, কয়লা প্রভৃতির চাহিদা থাকে প্রচণ্ড, কিন্তু জনসাধারণের দুস্থতার দরুন, বেকারদের নিদারুণ দারিদ্র্যের দরুন **কার্য্যকরী চাহিদার** পরিমাণ খুব কম। সঙ্কটের সময়ে এই জাজ্বল্যমান বিরোধই ভয়ানক ভাবে বৃদ্ধি পায়।

পুঁজিবাদী সঙ্কট অতিরিক্ত উৎপাদনের সঙ্কট। সুতরাং এত অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদিত হয় যে, শোষণকারী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আওতায় তাহাদের বিক্রয়যোগ্য বাজার পাওয়া যায় না ; কারণ, শোষণরত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিপুল জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ করিয়া তোলে। পুঁজিবাদের আওতায় সঙ্কটের মূল কারণ কী ?

পণ্য-উৎপাদনের আওতায় ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদকের সংযোগ সাধিত হয়। কিন্তু এই সংযোগ স্বতই ক্রিয়াশীল। বাজারের অন্ধ শক্তি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র উৎপাদকের উপরই আধিপত্য করে। এই প্রকার ব্যবস্থায় উৎপাদন ও প্রয়োজনের মোট অসামঞ্জস্য সর্ব্বদাই সম্ভব। খোদ পণ্য-উৎপাদনই সঙ্কট এবং পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতার **সম্ভাবনা** সৃষ্টি করিয়া বসে।

পুঁজিবাদের আওতায় সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী কেন ?

কিন্তু সহজ পণ্য-উৎপাদনের আওতায় সঙ্কট সম্ভব হইলেও অনিবার্য্য নয়। সঙ্কটের **অবশ্যম্ভাব্যতা** কেবল পুঁজিবাদেই দেখা দেয়।

পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধই কেবল পুনঃ পুনঃ (নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে) অতিরিক্ত উৎপাদনের সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলে।

আমরা দেখিয়াছি যে, পুঁজিতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিকের বিভিন্ন শ্রমের স্রোতধারাকে একই প্রবাহে মিশাইয়া শ্রমের সামাজিক প্রকৃতিকে ব্যাপকতর করিয়া তোলে। সেই সঙ্গে এই লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি শ্রমিকের শ্রমের ফল সম্পূর্ণ রূপে পুঁজিপতিদের ক্ষুদ্র মণ্ডলীর লুব্ধ কবলে গিয়া পড়ে। এই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরাই হইল গোটা শিল্পের ভাগ্যনিয়ন্তা।

> "এই সকল উৎপাদন একটি সামাজিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে মিলাইয়া যায়। পক্ষান্তরে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান পৃথক পৃথক পুঁজিপতির নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে পরিচালিত হয়। সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ পুঁজিপতির ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। তাহা হইলে ইহা কি স্পষ্ট নয় যে, ভোগ-দখলাধিকারের পদ্ধতির সহিত উৎপাদনের এই প্রণালীর অমীমাংসিত বিরোধ উপস্থিত হয়?" *

উৎপাদনের সামাজিক প্রকৃতি এবং ভোগ-দখলাধিকারের ব্যক্তিগত প্রকৃতির মধ্যে বিরোধই হইতেছে **পুঁজিবাদের মৌলিক বিরোধ।** এই বিরোধই পুঁজিবাদের আওতায় সঙ্কটকে **অনিবার্য্য** করিয়া তোলে। এই বিরোধই আবার সঙ্কটের সময়ে অতিশয় চরম, তীব্র ও স্পষ্ট হইয়া উঠে।

এই বিরোধই অনিবার্য্য রূপে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যাহাতে উৎপাদিত পণ্যসমূহের **কোনো বাজার মেলে না।** বাজার (বা খরিদ্দার) না মিলিবার কারণ এই নয় যে, কাহারও খাদ্য বা পরিধেয়ের

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড,'জনগণের বন্ধুরা কি এবং কি ভাবে তাহারা সোশাল-ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে লড়ে', পৃঃ ৯২, রুশ সংস্করণ।

প্রয়োজন নাই ; পক্ষান্তরে, জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক দ্রব্যসম্ভারের দারুণ অভাব ভোগ করিতেছে এইরূপ লোকের সংখ্যা পুঁজি-বাদের আওতায় অপরিমিত। মুশ্‌কিল এই যে, যে-শ্রমিক সাধারণের এই রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব তাহাদের কিন্তু এইগুলি পাইবার কোনো উপায় নাই। বাজার সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং কারখানা তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার বিক্রয়ের কোনো ব্যবস্থা করিতে পারে না, শিল্পের শাখা হইতে শাখান্তরে অতি-উৎপাদন (over production) ছড়াইয়া পড়ে। তৈরী পণ্যে গুদাম ভরিয়া যায় ; কারখানা করে উৎপাদন ছাঁটাই, বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়, শ্রমিকরা একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য হয়। বেকারী বাড়িয়া যাইবার ফলে শ্রমিক শ্রেণীর ভোগ্যবস্তু ব্যবহারের মাত্রা আরও কমিয়া যায়, ভোগ্যবস্তুর চাহিদাও কমিয়া যায়। গুদাম ঘর যখন দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ, তখন অসংখ্য শ্রমিক অনাহারে ক্লিষ্ট—ইহাই হইতেছে পুঁজিবাদী সঙ্কটের চিত্র।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের সর্ব্বনাশা সঙ্কটের বর্ণনা করিয়া পুঁজিবাদী সঙ্কট প্রসঙ্গে লেনিন লিখিয়াছেন :

"দুই পদ সম্মুখে এবং এক (কখনো কখনো দুই) পদ পশ্চাতে —পুঁজিবাদী উৎপাদন এইরূপ লাফাইয়া চলা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। পূর্ব্বেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন হইতেছে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন, বাজারের জন্য পণ্য-উৎপাদন। উৎপাদন চালায় স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত পুঁজিপতিরা ; প্রত্যেকেই নিজের খুশি মত উৎপাদন করে ; তাহাদের কেহই কিন্তু কোন প্রকারের কত পরিমাণ পণ্য বাজারে দরকার তাহা সঠিক বলিতে পারে না। উৎপাদন চলে আন্দাজে ; প্রত্যেক

উৎপাদকেরই কেবল চেষ্টা হইল কোনো প্রকারে অপরকে ছাড়াইয়া উঠা। সুতরাং উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বাজারের চাহিদার অনুরূপ না হওয়াও খুবই স্বাভাবিক। নূতন অনাবিষ্কৃত বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রকাণ্ড এক বাজার হঠাৎ উন্মুক্ত হইলেই এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা বিশেষ ভাবে বড় হইয়া দেখা দেয়।" *

নিজেদের স্বার্থের অন্বেষণে বুর্জোয়া শ্রেণী উন্মত্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদনের উন্নতি সাধন করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণ মুনাফা দিতে পারে ততক্ষণ অবধি পুঁজিপতির নিকট এক প্রকারের পণ্য অন্য যে-কোনো পণ্যের তুল্য। প্রত্যেক ব্যবসায়ীই উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করে; বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র বিপুলতর মুনাফার আশাস্থল। ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, মুনাফা লাভের এই প্রতিযোগিতায়, সকলের বিরুদ্ধে সকলের এই সংগ্রামে বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় জটিল শর্ত্তসমূহ প্রতিপালিত হয় না।

"শক্তিশালী **সামাজিক** উৎপাদন-শক্তি একদল ধনিকের কুক্ষিগত হওয়ার ফলে কেবল বড় বড় বিপর্য্যয় সম্ভব এবং অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই ধনিকদের একমাত্র চিন্তা মুনাফা করা।" †

পুঁজিবাদের আওতায় উৎপাদন **স্বতস্ফূর্ত্ত ভাবে** বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনা-হীন বিশৃঙ্খল ভাবে অগ্রসর হয় শিল্প। মুনাফা লাভের প্রতিযোগিতা উৎপাদনের এক সীমাহীন প্রসার লাভের প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া বসে। এই প্রবৃত্তি আবার পুঁজিবাদী সম্পর্কের অলঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হয়। পুঁজি কর্ত্তৃক নির্ম্মম শোষণের ফলে বিশাল সর্ব্বহারা সাধারণের

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ১৭১-৭২

† ঐ, পৃঃ ১৭২

ভোগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে উপরোক্ত বাধার মূল।

"একটি প্রতিষ্ঠান যাহাতে মুনাফা করিতে পারে তাহার জন্য ইহার উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় করিতে হইবে, ইহাদের খরিদ্দার সংগ্রহ করিতে হইবে। আবার বিপুল জনসাধারণকেই কিন্তু হইতে হইবে এই দ্রব্যসমূহের ক্রেতা, কারণ এই বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান প্রভূত পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করে। কিন্তু সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের জনসমষ্টির দশ ভাগের নয় ভাগই দরিদ্র; তাহারা হইল শ্রমিক এবং কৃষক। শ্রমিকেরা মজুরি পায় অত্যন্ত সামান্য এবং কৃষকদের অধিকাংশই বাস করে শ্রমিকদের অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর অবস্থার মধ্যে। তারপর তেজী বাজারের (boom) সময়ে যখন বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি অসম্ভব ফলাওভাবে দ্রব্য উৎপন্ন করিতে শুরু করে, তখন ইহারা এই সব জিনিস এত বেশী পরিমাণে বাজারে রফ্তানি করে যে অধিকাংশ লোক দরিদ্র হওয়ার দরুন দ্রব্য-সম্ভারের সবটাই তাহারা ক্রয় করিয়া লইতে পারে না। যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, গুদাম, আড়ত, রেলপথ প্রভৃতির সংখ্যা বাড়িতে থাকে। সময় সময় এই বৃদ্ধি কিন্তু ব্যাহত হয়, কারণ উৎপাদনের এই সব উন্নত উপকরণ শেষ পর্য্যন্ত যাহাদের প্রয়োজন পূরণ করে সেই জনসাধারণই কালাতিপাত করে প্রায় ভিক্ষুকের মত নিদারুণ দারিদ্র্যে।" *

এইরূপে উৎপাদনের সম্ভাবনার বিপুল বৃদ্ধি ও শ্রমিক, সাধারণের আপেক্ষিক ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত ক্রয়-ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ গভীরতম বিরোধ

* ঐ, পৃঃ ১৭৩।

পুঁজিবাদের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। উৎপাদন-শক্তি অপরিমিত রূপে বৃদ্ধি পাইতে চায়। অধিকতর মুনাফা পাওয়ার লোভে পুঁজিপতিরা তাহাদের উৎপাদন সম্প্রসারিত করে, যান্ত্রিক প্রক্রিয়া উন্নত করে, আরও নিদারুণ তীব্র ভাবে শোষণ করে শ্রমিক সাধারণকে। ধার-জমার (credit) বিকাশের ফলে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত পুঁজিপতির পক্ষে তাহার নিজের পুঁজির সীমা ছাড়াইয়াও উৎপাদন প্রসারিত করা সম্ভব হয়। মুনাফা-হারের নিরন্তর হ্রাসপ্রবণতা পুঁজিবাদের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বই প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে তাহার উৎপাদন আরও প্রসারিত করিবার জন্য প্ররোচিত করে। কিন্তু **শিল্পের সীমাহীন প্রসারের এই ঝোঁকের সহিত** বিপুল শ্রমিক সাধারণের **ভোগ করিবার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার** অনিবার্য্য সংঘাত ঘটে। শোষণ বাড়িবার অর্থ কেবল মাত্র উৎপাদনের বৃদ্ধি নয়; ইহার অর্থ জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়া যাওয়া, পণ্য বিক্রয়ের সম্ভাবনাও কমিয়া যাওয়া। শ্রমিক ও কৃষক সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা পড়িয়া থাকে নিম্ন স্তরে। সেই কারণেই পুঁজিবাদের আওতায় অতি-উৎপাদনের সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী।

পুঁজিবাদের শুরু হইতেই ইহার সহচর হইল সঙ্কট। পুঁজিবাদী শিল্পের আরম্ভ হইতেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পুঁজিবাদকে আলোড়িত করিয়া তোলে সঙ্কট। সঙ্কটেরও জন্ম হইয়াছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সঙ্গে। এক শত বৎসরের বেশী সময় ধরিয়া পুঁজিবাদী জগত প্রতি আট হইতে বারো বৎসরে সঙ্কটের তাড়নায় বিপর্য্যস্ত হইতেছে।

সঙ্কটের পর্য্যাবৃত্তি

প্রথম সাধারণ সঙ্কট উপস্থিত হয় ১৮২৫ সালে। পরে ১৮৩৬, ১৮৪৭, ১৮৫৭, ১৮৭৩ (ইয়োরোপে), ১৮৯০, ১৯০০, ১৯০৭, ১৯২১, ১৯২৯-৩৫ সালে পর পর সঙ্কট দেখা যায়। ১৮২৫ সাল হইতেই সঙ্কট

কেবল মাত্র একটি দেশকেই সমাচ্ছন্ন করে নাই, পরন্তু যে-যে দেশে পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করিয়াছে সেই সব দেশের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়ে।

সঙ্কটের ধারাবাহিকতা হইতে দেখা যায় যে, পুঁজিবাদের ক্রমোন্নতির সারা পথেই নির্দ্দিষ্ট ব্যবধান অন্তে সঙ্কট দেখা দেয়। পুঁজিবাদী সঙ্কটের বিশেষত্ব হইতেছে তাহার পর্য্যাবৃত্তি (অর্থাৎ নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে সঙ্কট ঘটে)। দুই সঙ্কটের মধ্যবর্ত্তী সময়ে পুঁজিবাদী শিল্প এক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তের (Circle) বা (যেমন বলা হয়) চক্রের (Cycle) মধ্য দিয়া চলে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে সাধারণত সঙ্কট গিয়া দেখা দিত মন্দা; পরে এই মন্দা গিয়া পৌছাইত সামান্য পুনরুজ্জীবনে। পুনরুজ্জীবন আনিয়া দিত তেজী বাজারের যুগ, প্রসারণ এবং মুনাফার প্রতিযোগিতা উঠিত চরমে। তারপরে আসিত সঙ্কট। আবার নূতন করিয়া শুরু হইত চক্র।

দুই সঙ্কটের মধ্যবর্ত্তী পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমোন্নতির পদ্ধতি এঙ্গেল্‌স্ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:

"...১৮২৫ সালে যখন প্রথম সাধারণ ব্যাপক সঙ্কট দেখা দেয় তখন হইতে সমগ্র শিল্প ও ব্যবসায়ের জগত, সকল সভ্য জাতি ও তাহাদের অধীন কম বেশী অসভ্য জাতিগুলির উৎপাদন এবং বিনিময়ের ব্যবস্থা কার্য্যত প্রতি দশ বৎসরে একবার করিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। বাণিজ্য অচল, বাজার প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালে প্লাবিত, বহু পরিমাণ মাল অবিক্রীত থাকিয়া যায়। নগদ মুদ্রা অদৃশ্য হয়, ধার-জমা লোপ পায়। কারখানাগুলি থাকে অচল; অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া শ্রমিক সাধারণ পায় কম খাদ্য, দেউলিয়ার পর দেউলিয়া অবস্থা দেখা দেয়, বাধ্যতামূলক বিক্রয় আনে

বাধ্যতামূলক বিক্রয়। বৎসরের পর বৎসর চলিতে থাকে এই অচল অবস্থা। অবশেষে পুঞ্জিত পণ্যসম্ভার যথাসম্ভব কম বেশী মূল্যহ্রাসে (Depreciation) বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত উৎপাদন-শক্তি এবং উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার উভয়েরই হয় বহুল অপচয় এবং বিনাশ। ক্রমে পদক্ষেপ দ্রুত হয়, কদমে চলা শুরু হয়। শিল্পের কদম-গতি পরিণত হয় দ্রুত লাফাইয়া চলায়: তাহা আবার পরিণতি লাভ করে সমগ্র শিল্প, বাণিজ্য, ধার-জমা ও ফাট্‌কার ঘোড়দৌড়ের উন্মাদ গতিতে। কিন্তু এই সমস্তই কেবল পরিণামে সর্ব্বনাশা উল্লম্ফনের পরে আবার সঙ্কটের গহ্বরে নিমজ্জিত হইবার জন্যই। এই রকমই বার বার...।

"এই সঙ্কটে সামাজিক উৎপাদন এবং পুঁজিবাদী ভোগ-দখলাধিকারের মধ্যকার বিরোধ ভীষণ ভাবে প্রকট হইয়া উঠে। সাময়িক ভাবে পণ্যের সঞ্চালন শূন্যে পরিণত হয়: সঞ্চালনের বাহন মুদ্রাই হইয়া দাঁড়ায় সঞ্চালনের প্রতিবন্ধক। পণ্য-উৎপাদন এবং পণ্য-সঞ্চালনের সমস্ত বিধি উল্টাইয়া যায়। অর্থনৈতিক সংঘর্ষ চরমে পৌঁছিয়াছে। **উৎপাদন-পদ্ধতি বিনিময়-পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে**...।"*

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সঙ্কটের নিয়মিত প্রাদুর্ভাবের কারণগুলির মূল নিহিত রহিয়াছে পুঁজিবাদের মৌলিক অসঙ্গতির (শ্রমের সামাজিক প্রকৃতি এবং ভোগ-দখলাধিকারের ব্যক্তিগত প্রকৃতির) মধ্যকার বিরোধে। সঙ্কট একবার উপস্থিত হইয়া দেশের অর্থনৈতিক জীবন ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলে মন্দা হইতে পুনরুজ্জীবনের দিকে গতি পরিবর্ত্তনের

* এঙ্গেল্‌স্: 'হের ইউজেন ডুারিং-এর বিজ্ঞানে বিপ্লব,' পৃঃ ৩০৯-১০।

জন্য প্রয়োজন কোনো উদ্দীপনা। যে-সব মূল শিল্প উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদন করে সেই সব মূল শিল্পের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে এই প্রকার উদ্দীপনা হইল **শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরায় ঢালিয়া সাজা**। সঙ্কটের পরে কল-কারখানায় প্রয়োজন নূতন এবং উন্নত সাজ-সরঞ্জাম। তাহারা যন্ত্রপাতির ফরমাশ দেয় এবং ইহার ফলে যে-চাহিদার আন্দোলন সৃষ্টি হয় তাহার স্পন্দন দূর দূরান্তরের শিল্পেও গিয়া লাগে। এইরূপে ধরা যায় যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের **সাজ-সরঞ্জাম মোটামুটি দশ বৎসর কাজে লাগে**। তাহা হইলে কোনো এক প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী পুঁজি মোটামুটি দশ দশ বৎসর অন্তে পুনরায় নূতন করা দরকার। সুতরাং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাজ-সরঞ্জাম নূতন করিবার প্রয়োজনীয়তার দরুন মোটামুটি প্রতি দশ বৎসরে একবার শিল্পসমূহ উদ্দীপনা লাভ করে।

যুদ্ধোত্তর যুগে এই চিত্র বদলাইয়া গিয়াছে। পুঁজিবাদ বর্ত্তমানে ক্রম-অবনতির ভিতর দিয়া চলিয়াছে, জীবন্তেই ক্ষয় পাইতেছে। এখন এক একটি সঙ্কট ইহার ভিত্তিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অসংখ্যগুণ ভীষণ ভাবে আলোড়িত করিয়া তোলে। শিল্পের পূর্ব্ববর্ত্তী চক্রাকার অগ্রগতি ধ্বংস হইয়াছে।

অনেক দেশে শিল্পে আদৌ কোনো উন্নতি দেখা দেয় নাই, এবং অন্যান্য দেশে অল্প সময়ের জন্য সামান্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। অপর পক্ষে, বর্ত্তমান সঙ্কটের সময়ে অবনতি অত্যন্ত গভীর হইয়াছে।

সঙ্কটের গুরুত্ব

পুঁজিবাদী বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়ায় সঙ্কটের গুরুত্ব খুবই। পুঁজিবাদ নিজে যে-শক্তিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহাকে আয়ত্তাধীন রাখা সম্পর্কে পুঁজিবাদের নিদারুণ অক্ষমতা সঙ্কটের সময়ে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। পুঁজিবাদী **উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের বিশৃঙ্খলা** এবং অব্যবস্থা বিশেষ স্পষ্ট হইয়া উঠে।

বিপুল জনসাধারণের নিতান্ত অপরিহার্য্য প্রয়োজন অপূর্ণ রাখিয়াও পুঁজিবাদ বিপুল সম্পদরাশি নষ্ট হইতে দেয়—পুঁজিবাদের এই **দস্যুপ্রকৃতি** সঙ্কটের সময়ে প্রকাশ পায়।

> "সঙ্কট প্রতিপন্ন করে যে আধুনিক সমাজ যাহা উৎপাদন করে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে; এবং জমি, কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যদি জনগণের দারিদ্র্যের সুযোগে কোটি কোটি টাকার মুনাফা আদায়কারী মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগত মালিকের অধিকৃত না হইত, তবে সেই উৎপাদন সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের জীবন যাপনের অবস্থা উন্নত করার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিত।" *

শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় করিয়া এবং বেকারের সংখ্যা ভীষণ ভাবে বাড়াইয়া সঙ্কট **শ্রেণীবিরোধ তীব্র করিয়া তোলে**। পূর্ব্বে যাহারা পুঁজিবাদের সহিত শান্তিতে থাকিতে চাহিত বা পুঁজিবাদ সম্পর্কে উদাসীন ছিল এমন বহু শ্রমিককে সঙ্কট পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তৎপর হইতে বাধ্য করে। এই সঙ্কটই পুঁজিবাদের সমস্ত **বিরোধ** অনাবৃত করিয়া তাহার **ধ্বংসের অবশ্যম্ভাব্যতা** প্রতিপন্ন করে।

উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের অসঙ্গতিকে, পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত গভীর বিরোধকেই সঙ্কট জাজ্জ্বল্যমান করিয়া তোলে। এই বিরোধই পুঁজিবাদকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের দিকে টানিয়া আনে।

সঙ্কটের এই বিশেষ কার্য্যকে এঙ্গেল্‌স্‌ নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ১৭৩-৭৪।

"সঙ্কটের সময় বহু বড় বড় এবং আরও বেশী ছোট ছোট পুঁজিপতির সর্ব্বনাশের ভিতর দিয়া পুঁজির যে-প্রচণ্ড একত্রীকরণ সাধিত হয় তাহার দ্বারা খোদ পুঁজিপতিদের কাছে এই ঘটনাই স্পষ্ট হইয়া-উঠে যে, কারখানার ভিতরে উৎপাদনের সামাজিক সংগঠন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যেখানে ইহা আর সমাজে উৎপাদনের চতুর্দ্দিকের বিশৃঙ্খলার সহিত মানাইয়া চলিতে পারে না। পুঁজিবাদ নিজেই যে-উৎপাদনশক্তি সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই চাপে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির সমগ্র ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। উৎপাদনের উপকরণের এই সমগ্র পরিমাণকে ইহা আর পুঁজিতে পরিণত করিতে পারে না; উৎপাদনের উপকরণ বৃথাই পড়িয়া থাকে; এবং ঠিক এই কারণেই শ্রমিক মজুত বাহিনী হইয়া পড়ে কর্ম্মহীন। উৎপাদনের উপকরণ, জীবন ধারণের উপকরণ, সহজলভ্য শ্রমিক, উৎপাদনের এবং সাধারণ সম্পদের সকল উপাদানই রহিয়াছে প্রচুর। কিন্তু 'প্রাচুর্য্য দুঃখ ও অভাবের উৎসে পরিণত হয়' (ফরিয়ার)। কারণ, এই প্রাচুর্য্যই উৎপাদনের ও জীবনধারণের উপকরণকে পুঁজিতে রূপান্তরিত হইতে বাধা দেয়; কারণ, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপকরণ প্রথমেই পুঁজিতে রূপান্তরিত না হইলে, মনুষ্যশ্রমশক্তির শোষণের উপকরণে রূপান্তরিত না হইলে কাজে লাগিতে পারে না। উৎপাদন এবং জীবন ধারণের উপকরণের পুঁজি-রূপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তাহাদের ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রেতের মত দাঁড়াইয়া থাকে। একমাত্র ইহাই উৎপাদনের বাস্তব এবং মনুষ্যরূপী উপায়কে একত্রিত হইতে বাধা দেয়: একমাত্র ইহাই উৎপাদনের উপকরণকে কার্য্য সম্পাদন করিতে, শ্রমিককে কাজ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে বাধা দেয়। এইরূপে একদিকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি উৎপাদন-

শক্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখিতে অসমর্থ প্রমাণিত হইয়াছে ; অপর দিকে, এই উৎপাদন-শক্তি নিজেই ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি লইয়া বিরোধের অবসান করিতে, পুঁজি-প্রকৃতি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে, **সামাজিক উৎপাদন-শক্তি রূপে তাহার প্রকৃত স্বীকৃতির দিকে** অগ্রসর হয়।" *

পুঁজিবাদী উৎপাদনে সঙ্কটের এই বিশেষ কার্য্যের প্রকৃতি সম্পর্কে **কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার**-এ নিম্নলিখিত সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে :

আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ তাহার উৎপাদন, বিনিময় ও সম্পত্তিগত সম্পর্ক লইয়া এক বিশেষ সমাজ রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে ; এই সমাজ এক যাদুকরের মত উৎপাদন ও বিনিময়ের বিপুল উপকরণ গড়িয়া তুলিয়াছে ; সে-যাদুকর আপনার যাদুমন্ত্রে সঞ্জীবিত পাতালপুরীর শক্তিকে আর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেছে না ঃ বিগত বহু যুগ ধরিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস হইতেছে কেবল উৎপাদনের আধুনিক অবস্থাসমূহের বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিদ্রোহ ; যে-সম্পত্তিগত সম্পর্ক বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাহাদের আধিপত্যকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে, এই বিদ্রোহ তাহারও বিরুদ্ধে। ব্যবসায় সংক্রান্ত সঙ্কটের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সঙ্কট নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বকে প্রত্যেক বারই অধিকতর ভীষণ ভাবে পরীক্ষায় ফেলে। এই সঙ্কটে কেবল বর্ত্তমান উৎপন্নের এক বৃহৎ অংশ মাত্রই নয়, পরন্তু পূর্ব্বসৃষ্ট উৎপাদন-শক্তির এক প্রধান অংশও কিছুদিন পর পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সব সঙ্কটে অতি-উৎপাদনের এক প্রচণ্ড মহামারীর প্রাদুর্ভাব

* এঙ্গেল্‌স্ ঃ 'হের ইউজেন ড্যুরিং-এর বিজ্ঞানে বিপ্লব', পৃঃ ৩০৪-৫।

ঘটে ; পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে এই মহামারীকে মনে হইত অসম্ভব। সমাজ নিজেকে অকস্মাৎ সাময়িক বর্ব্বরতার অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত দেখিতে পায় ; মনে হয় যেন এক দুর্ভিক্ষ, বিশ্বব্যাপী এক সর্ব্বনাশা মহাযুদ্ধ জীবন ধারণের প্রত্যেকটি উপকরণের সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছে ; শিল্প ও বাণিজ্য মনে হয় ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু কেন ? অত্যধিক সভ্যতা, জীবনধারণের উপকরণের অত্যধিক প্রাচুর্য্য, অত্যধিক শিল্প, অত্যধিক ব্যবসায়ই ইহার কারণ। সমাজের আয়ত্তাধীন উৎপাদন-শক্তিসমূহ বুর্জোয়া সম্পত্তির শর্ত্তের বিকাশ সাধনে আর সচেষ্ট নয় ; পক্ষান্তরে, এই সব শর্ত্তের দ্বারা শৃঙ্খলিত উৎপাদন-শক্তি তুলনায় অতিশয় শক্তিশালী হইয়া উঠে ; যে-মুহূর্ত্তে উৎপাদন-শক্তি এই সব শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেলে সেই মুহূর্ত্তেই সমগ্র বুর্জোয়া সমাজে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, বিপন্ন হইয়া উঠে বুর্জোয়া সম্পত্তির অস্তিত্ব। নিজেদের সৃষ্ট সম্পদ ধারণের পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। কিন্তু কি প্রকারে এই সব সঙ্কট হইতে বুর্জোয়া শ্রেণী পরিত্রাণ লাভ করে ? এক দিকে প্রভূত পরিমাণ উৎপাদন-শক্তি জোর করিয়া ধ্বংস করিয়া, অপর দিকে নূতন নূতন বাজার জয় করিয়া এবং পুরাতন বাজার পুরাপুরি শোষণ করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণী এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করে ; অর্থাৎ আরও ব্যাপক, দুর্ব্বার ও ধ্বংসাত্মক সঙ্কটের পথ প্রসারিত করিয়া এবং সঙ্কট প্রতিরোধের উপায়গুলি হ্রাস করিয়া।" *

* 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার', পৃঃ ১৪-১৫।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। পুনরুৎপাদন কী ?

২। সহজ পুনরুৎপাদনের শর্তসমূহ কী ?

৩। বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনের শর্ত্ত কী কী ?

৪। পুঁজির একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ কী ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় ?

৫। পুঁজির একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের মধ্যে পার্থক্য কী ?

৬। পুঁজিবাদী সঙ্কটের কারণ কী ?

৭। শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে পুঁজিবাদী সঙ্কটের গুরুত্ব কিসে ?

৮। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সঙ্কটের পুনঃপ্রাদুর্ভাব কেমন করিয়া ব্যাখ্যা করা যায় ?

* এই পরিচ্ছেদে ২৫৬ পৃষ্ঠায় ১২শ পংক্তিতে ‘বাজারের অর্থশক্তির’ জায়গায় ‘বাজারের অন্ধশক্তির’ হইবে।

নবম পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যবাদ—সর্ব্বহারার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ব্বক্ষণ

শিল্প-পুঁজিবাদ হইতে সাম্রাজ্যবাদ

পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করে উনবিংশ শতকে এবং দেশ হইতে দেশান্তরে প্রসার লাভ করিতে করিতে সারা দুনিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মর্ম্মান্তিক অসঙ্গতি ক্রমশ অধিকতর প্রকট ও তীব্র হইয়া উঠে। এই যুগে পুঁজিবাদী অগ্রগতির পুরোভাগে ছিল শিল্প-পুঁজি (Industrial capital)। এই কারণেই এই যুগকে বলা হয় শিল্পপুঁজি বা শিল্প-পুঁজিবাদের যুগ।

শিল্প-পুঁজিবাদের মৌলিক অসঙ্গতির বৃদ্ধি ও বিকাশ পুঁজিবাদের বিকাশে এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া বসে—তাহা হইতেছে **সাম্রাজ্যবাদ**। পুঁজিবাদের বিকাশের এক নবতর ও উন্নততর পর্য্যায় রূপে সাম্রাজ্যবাদ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই দেখা দেয়। সাম্রাজ্য-বাদের আওতায় পুঁজিবাদের সমুদয় মৌলিক **বিরোধ** চরমতম **তীব্রতা লাভ করে**। পুঁজিবাদী বিকাশের চরম পরিণতি হইতেছে সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ হইতেছে মুমূর্ষু পুঁজিবাদ। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমাজের ব্যাপক বিকাশের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়।

সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষা

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বহারাদের বিপ্লবী সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষা হইতেছে এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। লেনিন-ই দেখাইয়াছেন যে সাম্রাজ্যবাদ হইল মুমূর্ষু পুঁজিবাদ, **সর্ব্বহারার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ব্বক্ষণ**।

লেনিনবাদের ভিত্তি সম্পর্কে রচনায় স্টালিন দেখাইয়াছেন যে, মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ যে-সময়ে জীবিত ছিলেন এবং সংগ্রাম করিয়াছেন সে-সময়ে সাম্রাজ্যবাদ বিকাশই লাভ করে নাই, তখনও বিপ্লবের জন্য সর্ব্বহারার উদ্যোগপর্ব্বই চলিতেছিল; পক্ষান্তরে, লেনিনের বিপ্লবী কার্য্যকলাপ ঘটিয়াছে পরিণত সাম্রাজ্যবাদের যুগে, যে-যুগে সর্ব্বহারার বিপ্লব প্রকাশ লাভ করিতেছিল। লেনিনবাদ হইল নূতন পরিস্থিতিতে, সাম্রাজ্যবাদ ও সর্ব্বহারার বিপ্লবের যুগের পরিস্থিতিতে **মার্ক্‌স্‌বাদের উন্নততর বিকাশ**। সুতরাং লেনিনপন্থী না হইয়া বর্ত্তমানে কেহই মার্ক্‌স্‌পন্থী হইতে পারে না। ইহা হইতে আরও প্রতিপন্ন হয় যে, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনবাদী তত্ত্বকে অস্বীকার করার অর্থই হইতেছে মার্ক্‌স্‌বাদ সম্পূর্ণ রূপে বর্জ্জন করা। এখন সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব (Theory) সম্পর্কে কোনো বিকৃতি বা ভ্রান্তির অপরিহার্য্য অর্থ হইল বিপ্লবী মার্ক্‌স্‌বাদ-লেনিনবাদ হইতে বিচ্যুতি।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের বিকাশে এক **বিশেষ পর্য্যায়** হিসাবে, পুঁজিবাদী বিকাশের এক নূতন পর্য্যায় হিসাবে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্ত্তনের দ্বারা নির্দ্ধারিত এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক যুগ হিসাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পুঁজিবাদী উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে-সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং যাহার ফলে পূর্ব্বগামী শিল্প-পুঁজিবাদী যুগ হইতে সাম্রাজ্যবাদী যুগের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে, লেনিন সেই সমস্তকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়াছেন। মার্ক্‌সের আবিষ্কৃত পুঁজিবাদী বিকাশের নিয়মের উপর লেনিন এই বিষয়ের তাত্ত্বিক বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছেন। আবার নূতন যুগে সেই সব নিয়ম কি ভাবে কার্য্যকরী হয় তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন তিনিই।

এই নূতন যুগ হইতেছে ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু পুঁজিবাদের যুগ,

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ব্বলক্ষণ। যে-সব **লক্ষণ** এই যুগের **বৈশিষ্ট্য**, লেনিন সে-সব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদই অবশ্যম্ভাবী রূপে **সর্ব্বনাশা যুদ্ধ** ও সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার **সাধারণ সঙ্কট** সৃষ্টি করে।

"সাধারণ ভাবে পুঁজিবাদের মৌলিক গুণসমূহের বিকাশ ও প্রত্যক্ষ পরিণতি রূপে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে।" *

পুঁজিবাদের বিকাশের এক নূতন পর্য্যায় হইতেছে সাম্রাজ্যবাদ; কিন্তু এই নূতন পর্য্যায় পূর্ব্ববর্ত্তী পর্য্যায়েরই (অর্থাৎ শিল্প-পুঁজিবাদী যুগেরই) **প্রত্যক্ষ পরিণতি**। বুর্জোয়া শ্রেণী ও সর্ব্বহারা শ্রেণীর বিরোধ, পুঁজিবাদী শিবিরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, উৎপাদনের বিশৃঙ্খলা, সঙ্কট ইত্যাদি যে-সব মৌলিক ও চরম বিরোধ পুঁজিবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে সেই সব বিরোধ অন্তর্হিত তো হয়ই না, বরং চরমতম তীব্রতাই লাভ করে।

পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্প-পুঁজিবাদী যুগের সহিত সাম্রাজ্যবাদের কোনো মিল নাই—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই প্রকার একটি মতবাদ (অর্থাৎ তথাকথিত 'বিশুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব') বুখারিন ও তাহার কতিপয় অনুচরেরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে প্রচার করে। এই মতবাদে সাম্রাজ্যবাদের অভিনব প্রকৃতির উপর অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, সেজন্য আপাতদৃষ্টিতে এই মতবাদ 'বামপন্থী' মনে হইতেও পারে; তথাপি আধুনিক পুঁজিবাদ এবং সমাজ-তন্ত্রাভিমুখী গতি উভয় সম্পর্কেই এই মতবাদ কার্য্যত সম্পূর্ণ সুবিধাবাদী সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বুর্জোয়া ও খুদে বুর্জোয়া শ্রেণীর সকল প্রকার মতের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ম্মম **সংগ্রামের পথে**, মার্ক্সবাদের

* লেনিন: "সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্ব্বোচ্চ স্তর", পৃঃ ৮০

সকল প্রকার সুবিধাবাদী বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের ভিতর দিয়াই লেনিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁহার তত্ত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন। **সর্ব্বহারা-বিপ্লব** সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব—এই দুই-এর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে লেনিনবাদ-বিরোধী মতবাদ প্রতিবিপ্লবী রাজনৈতিক অবস্থার সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনবাদী তত্ত্বের ব্যাখ্যায় যে-সব বিকৃতি ও ভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয় তাহার ফলে সুবিধাবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

উৎপাদনের একত্রীকরণের পদ্ধতির অনুসন্ধান হইতে লেনিন সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্লেষণ শুরু করিয়াছেন। পুঁজির এই একত্রীকরণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে **একচেটিয়া ব্যবসায়ের** আধিপত্য শুরু হয়। গত যুগের পুঁজিবাদী বিকাশের প্রতিটি ধারা সযত্নে অনুধাবন করিয়া লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পুঁজিবাদী একচেটিয়া ব্যবসায় পূর্ব্বপ্রচলিত অবাধ প্রতিযোগিতার স্থান দখল করিয়াছে; এই ঘটনাকে বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য বলা যায় এবং এই একচেটিয়া আধিপত্য পুঁজিবাদের বিরোধকে তীব্রতম করিয়া তোলে।

সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য

একচেটিয়া ব্যবসায়ের আধিপত্য পুঁজিবাদী দেশসমূহের সমগ্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে; ইহা সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। একচেটিয়া ব্যবসায়ের এই আধিপত্যই সাম্রাজ্যবাদী যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের সকল পর্য্যায়ের উপরই গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি মূল বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করিয়া লেনিন ইহার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন:

"১। উৎপাদন ও পুঁজির একত্রীকরণ এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, তাহার ফলে একচেটিয়া ব্যবসায় দেখা দিয়াছে। অর্থনৈতিক জীবনে এই একচেটিয়া ব্যবসায়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ;

"২। শিল্প-পুঁজির সহিত ব্যাঙ্ক-পুঁজির মিলন এবং এই 'ফিনান্স-পুঁজি'কে (Finance Capital) ভিত্তি করিয়া এক বিত্তশালী মোড়ল তন্ত্রের * (Financial Oligarchy) উৎপত্তি;

"৩। পণ্য-রফ্তানির তুলনায় পুঁজি-রফ্তানির গুরুত্ব বেশী;

"৪। আন্তর্জ্জাতিক পুঁজিবাদী একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা ও সমগ্র পৃথিবীকে তাহাদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লওয়া;

"৫। প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী শক্তির মধ্যে সারা দুনিয়ার আঞ্চলিক ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

"সাম্রাজ্যবাদ হইতেছে পুঁজিবাদের বিকাশের এক বিশেষ পর্য্যায়; এইপর্য্যায়ে একচেটিয়া ব্যবসায় ও 'ফিনান্স-পুঁজি' স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, পুঁজি-রফ্তানি সুস্পষ্ট গুরুত্ব লাভ করিয়াছে; এই অবস্থায় আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়-সঙ্ঘের (ট্রাস্ট্) মধ্যে দুনিয়ার ভাগ-বাঁটোয়ারা শুরু হইয়াছে; প্রধান প্রধান শক্তির মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল বণ্টন ইহাতে সম্পূর্ণ হইয়াছে।" †

সাম্রাজ্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রে ভাঙন নামক অপর একখানি গ্রন্থেও লেনিন সাম্রাজ্যবাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহের অনুরূপ

* মুষ্টিমেয় মুখ্য অর্থাৎ মোড়ল ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত শাসনতন্ত্রকে বলে অলিগার্কি; ইহাকে মোড়লতন্ত্র বলা যাইতে পারে।—অনুবাদক।

† ঐ, পৃঃ ৮১।

এক তালিকাই দিয়াছেন। যথাসম্ভব সঠিক ও বিশদ ভাবে সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা নির্দ্দেশের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া এই গ্রন্থে লেনিন লিখিয়াছেন ঃ

"সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের এক বিশেষ ঐতিহাসিক স্তর। ইহার বিশেষ প্রকৃতি ত্রিবিধ ঃ সাম্রাজ্যবাদ হইতেছে (১) একচেটিয়া পুঁজিবাদ, (২) পরস্বোপজীবী বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ, (৩) মুমূর্ষু পুঁজিবাদ। অবাধ প্রতিযোগিতার স্থলে একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, সাম্রাজ্যবাদের সারমর্ম্ম। একচেটিয়া ব্যবসায় পাঁচটি প্রধান রূপ লইয়া দেখা দেয় ঃ (১) মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘ (কার্টেল), বাণিজ্য-সঙ্ঘ (সিণ্ডিকেট) ও ব্যবসায়-সঙ্ঘ (ট্রাস্ট্) ; উৎপাদনের একত্রীকরণ এক বিশেষ অবস্থায় উপনীত হইয়া পুঁজিপতিদের এই সব একচেটিয়া ব্যবসায়-সমিতি গড়িয়া তোলে ; (২) বড় বড় ব্যাঙ্কের একচেটিয়া আধিপত্য ; তিনটি হইতে পাঁচটি বিরাট বিরাট ব্যাঙ্ক আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানির সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে নিজেদের মর্জি মাফিক পরিচালিত করে ; (৩) ব্যবসায়-সঙ্ঘ (ট্রাস্ট) এবং বিত্তশালী মোড়লতন্ত্র **কাঁচা মালের** উৎসসমূহ বলপূর্ব্বক অবৈধ ভাবে দখল করে (ফিনান্স-পুঁজি হইল একচেটিয়া শিল্প-পুঁজির সহিত ব্যাঙ্ক-পুঁজির মিলন) ; (৪) আন্তর্জ্জাতিক মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘগুলির মধ্যে দুনিয়ার (অর্থ-নৈতিক) ভাগ-বাঁটোয়ারা আরম্ভ হইয়াছে। **সারা** দুনিয়ার বাজারের উপর প্রভুত্বকারী এই আন্তর্জ্জাতিক মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘগুলি যুদ্ধের মারফত পৃথিবীর পুনর্বণ্টন না ঘটা পর্য্যন্ত নিজেদের মধ্যে 'আপোসে' বাজার ভাগ করিয়া নেয় ; ইতিপূর্ব্বেই ইহাদের সংখ্যা উঠিয়াছে **এক**

শতের উপরে ! পুঁজিবাদ যখন একচেটিয়া রূপ গ্রহণ করে নাই তখন পণ্য-রফ্‌তানি চলে ; সেই সময়কার পণ্য-রফ্‌তানি হইতে পুঁজি-রফ্‌তানি এক স্বতন্ত্র বিশিষ্ট ব্যাপার। ইহা পৃথিবীর অর্থনৈতিক এবং আঞ্চলিক (territorial) রাজনৈতিক বিভাগের সহিত বিশেষ ভাবে সংযুক্ত ; (৫) দুনিয়ার আঞ্চলিক বিভাগ (উপনিবেশসমূহ) **সম্পূর্ণ** হইয়াছে।" *

আমরা জানি, পুঁজিবাদের অন্যতম সর্ব্বপ্রধান নিয়ম হইল **পুঁজির একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের** নিয়ম। পুঁজিবাদের বিকাশে ক্ষুদ্রাকার উৎপাদনের বিনাশ ও বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জয়জয়কার ঘটে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ের আধিপত্য

প্রতিযোগিতার পথে প্রবল দুর্ব্বলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। প্রতিযোগিতামূলক এই সংগ্রামে সকল সুবিধাই বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বর্ত্তায়। বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ যন্ত্রবিজ্ঞানের সমস্ত অবদানের সুযোগ গ্রহণ করে, তাহাদের দুর্ব্বলতর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পক্ষে এই সুযোগলাভ সাধ্যাতীত।

বৃহদাকার উৎপাদনের জয়, পুঁজির একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের ফলে বিকাশের এক বিশেষ স্তরে অনিবার্য্য রূপে **একচেটিয়া ব্যবসায়ের** উদ্ভব হয়। পণ্যবিশেষের উৎপাদনের বিরাট অংশ যে-সমস্ত পুঁজিপতিদের হাতে একত্রিত হয়, একচেটিয়া ব্যবসায় হইতেছে তাহাদের মধ্যে চুক্তি বা মিলন। এইরূপ একটি সমিতি (combination) পুঁজিপতিদের পক্ষে কত **সুবিধাজনক** তাহা সহজেই বুঝা যায়। পণ্যবিশেষের সমগ্র উৎপাদন (বা তাহার বিরাট অংশ) কেবলমাত্র তাহাদেরই করতলগত হওয়ায় এই পণ্যটির দাম চড়াইয়া তাহারা

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ১৯শ খণ্ড, 'সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রে ভাঙ্গন,' পৃঃ ৩০১।

মুনাফা বাড়াইতে পারে যথেষ্ট। বেশ বুঝা যায় যে, উৎপাদনের বৃহত্তম অংশ মুষ্টিমেয় সর্ব্বপ্রধান পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত হইলেই কেবল এইরূপ সমিতি সম্ভব।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎপাদনের একত্রীকরণ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। অবশ্য, প্রত্যেক দেশে আজ্যাবধি মধ্যমাকার ও ক্ষুদ্রাকার প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বও আছে। ইহারা অল্পসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া সামান্য পরিমাণেও উৎপাদন করে। কিন্তু চূড়ান্ত ভূমিকা অভিনয় করে হাজার হাজার শ্রমিক শোষণকারী, যান্ত্রিক শক্তির বৃহত্তর অংশের অধিকারী এবং প্রভূত পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার-কারী **সর্ব্ববৃহৎ কল-কারখানাগুলি**। এই সব বিপুলকায় প্রতিষ্ঠান প্রভূত পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিয়া প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এই রকম করিয়াই যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে সমগ্র শিল্পোৎপাদনের প্রায় অর্দ্ধেকই হাজার তিনেক বিরাট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একত্রীভূত হইয়াছিল। এই তিন হাজার বিরাট প্রতিষ্ঠান কিন্তু সংখ্যার দিক হইতে সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের একশত ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহা স্পষ্ট যে, বাকি নিরানব্বইটি ক্ষুদ্র, বিক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠান, অল্প সংখ্যক বিরাট প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপারগ।

প্রতিষ্ঠানের যৌথ কারবারী রূপ (joint stock company) বৃহৎ পুঁজির জয়যাত্রাকে খুবই সাহায্য করিয়াছে। পূর্ব্বে স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীদের দ্বারা কল-কারখানা স্থাপিত হইত। প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল এক একজন পুঁজিপতির সম্পত্তি, তাহারা এইগুলি পরিচালনা করিয়া মুনাফা আত্মসাৎ করিত; তথাপি রেলপথ তৈরী প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে পুঁজির ব্যয়সাপেক্ষ এমন কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান আছে যাহার

পরিচালনা কোনো একজন পুঁজিপতির সাধ্যে কুলায় না; এবং এই সব কারণেই যৌথ কারবারের স্থাপনা। যৌথ কারবারে বহু পুঁজিপতির পুঁজি একত্রিত হয়। প্রত্যেক পুঁজিপতি তাহার নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ অনুসারে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অংশ (স্টক, শেয়ার) লাভ করে। নিয়ম অনুসারে সকল মূল বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের কথা অংশীদারদের সাধারণ সভার, কিন্তু কার্য্যত সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকে **বৃহত্তম অংশীদারদের** এক ক্ষুদ্র মণ্ডলীর হাতে। সাধারণ সভায় প্রত্যেকের ভোটসংখ্যা তাহার শেয়ারের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ক্ষুদ্র অংশীদারগণ ব্যবসায় পরিচালনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কোনো যৌথকারবারের পরিচালনা হস্তগত করিতে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ শেয়ারের মালিকানাই যথেষ্ট। অতএব যৌথ্ কারবার হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যাহার সাহায্যে বৃহৎ পুঁজি ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত পুঁজিপতিদের সঞ্চয় এবং কিছু পরিমাণে উচ্চ স্তরের চাকুরীজীবী ও শ্রমিকদের সঞ্চয়কে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া স্বীয় স্বার্থসাধনে নিয়োগ করে।

আধুনিক পুঁজিবাদী দেশে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যাধিক অংশই হইল যৌথ কারবার। যৌথ কারবার পুঁজিকে দ্রুত কেন্দ্রীকরণের ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্প্রসারণের পথে অসীম উৎসাহে আগাইয়া দেয়। একক কোনো পুঁজিপতির পক্ষে গড়িয়া তোলা অসম্ভব এমন বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তোলে যৌথ কারবারই। যৌথ কারবার গড়িয়া না উঠিলে আধুনিক রেলপথ, খনি, ধাতু কারখানা, বৃহৎ মোটর গাড়ির কারখানা, জাহাজ-পথ প্রভৃতি সমস্তই অসম্ভব হইত।

প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত করিয়া যৌথ কারবার একচেটিয়া সঙ্ঘের

(corporation) পথ প্রশস্ত করে। একচেটিয়া সংগঠন প্রথম দেখা দেয় প্রধান ও মূল শিল্পে—**ভারী শিল্পে** (Heavy Industry)। এই ক্ষেত্রে বৃহদাকার উৎপাদনের অগ্রগতি বিশেষ দ্রুত; একত্রীকরণের কাজও অগ্রসর হয় দ্রুতই। তৈল কূপ, কয়লাখনি, লৌহখনি, লৌহ ও ইস্পাত ঢালাইয়ের কারখানা প্রভৃতি শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক দেশেই একত্রীভূত হয় মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠানের হাতে। এই বিরাটকায় প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা প্রকাশ পায় অত্যন্ত উগ্র মূর্ত্তিতে। এই সব ক্ষেত্র হইতে পুঁজির অবাধ নিষ্ক্রমণ অতীব কঠিন। এই প্রকার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে ইমারত, সাজ-সরঞ্জাম ও বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতির জন্য বিপুল পরিমাণে পুঁজি ব্যয় করা প্রয়োজন। মন্দার বাজারে এই পুঁজি অন্য প্রকার পণ্য উৎপাদনের কাজে লাগানো অসম্ভব। সঙ্কট ভারীশিল্পকেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত হানে। সঙ্কটের দিনে যন্ত্রপাতি, লোহা ও কয়লার চাহিদা ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে কমিতে থাকে। উৎপাদনের প্রত্যেকটি ছাঁটাই দারুণ আঘাত করে ভারীশিল্পকেই; ফরমাশের অভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার কল-কারখানা পড়িয়া থাকে কর্ম্মহীন, ভীষণ ভাবে বাড়িয়া যায় উৎপাদনের ব্যয়। ভারীশিল্পই আবার প্রথমে একচেটিয়া ব্যবসায়ের আয়ত্তে আসে। ভারীশিল্পকে কুক্ষিগত করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায় সেই সঙ্গে লঘু শিল্পের (Light Industry) দিকে হাত বাড়ায়, একটির পর একটিকে হস্তগত করিয়া ফেলে।

পুঁজিবাদী সঙ্ঘগুলি বিভিন্ন ধরনের। প্রথমত, দাম সম্পর্কে আকস্মিক ধরনের স্বল্পকালস্থায়ী চুক্তি হয়। এই চুক্তির ফলে সমস্ত রকমের দীর্ঘকালস্থায়ী চুক্তির পথই শুধু সুগম হয়।

কোনা কোনো সময়ে দাম এক বিশেষ স্তরে রাখিবার জন্য বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠান চুক্তিবদ্ধ হয়। এই ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রতিযোগিতার দরুন একই ক্ষেত্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই জন্য প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান একটা বিশেষ স্তরের নিচে দাম না কমাইবার প্রতিশ্রুতি কেবল দেয়। এইরূপ সঙ্ঘকে (Association) বলে **মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘ** (কার্টেল)।

কার্টেল, সিণ্ডিকেট, ট্রাস্ট

বাণিজ্য-সঙ্ঘে (সিণ্ডিকেট) মিলিত হইলে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপিত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের বাণিজ্যিক স্বাধীনতা হারায়; উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় এবং কোনো কোনো সময়ে কাঁচা মাল খরিদও **বাণিজ্য-সঙ্ঘের সাধারণ দফতরের মারফত হয়**। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান স্বাধীন ভাবেই তাহার উৎপাদন চালায়; এই সঙ্ঘের মারফত এখন শুধু প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান প্রতি একটা বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট হইল যাহার বেশি পরিমাণ পণ্য সে-প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করিতে পারিবে না। এই বরাদ্দ ঠিক করিয়া দেয় সিণ্ডিকেট।

এই সংযোগ আরও ঘনিষ্টতর হইতেছে **ব্যবসায়-সঙ্ঘের** (ট্রাস্ট) মধ্যে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ রূপে মিলিত হইয়া পড়ে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিকরা ব্যবসায়-সঙ্ঘের অংশীদারে পরিণত হয়। ব্যবসায়-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একটি সাধারণ পরিচালন-ব্যবস্থা থাকে।

উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় কোনো রকমে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মিলন ক্রমেই বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, একটি ধাতু নিষ্কাশণের প্রতিষ্ঠান কাঁচা ও কোক কয়লা সরবরাহকারী কয়লাখনি-প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হয়। আবার এই ধাতুনিষ্কাষণ ও কয়লা-খনিপ্রতিষ্ঠান সচরাচর মিলিত হয় যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের

আনুষঙ্গিক শিল্পসমবায়

সহিত, যেখানে উৎপাদিত হয় রেল-ইঞ্জিন বা অপরাপর যন্ত্রাদি। এই রূপ সংমিশ্রণকে বলে **আনুষঙ্গিক শিল্প-সমবায়** (Vertical combinations)।

একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিকাশ অনেক পুঁজিপতিকে সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান গঠনে উৎসাহিত করে। ধরা যাক যে, কয়লাখনির প্রতিষ্ঠান-গুলি একটি বাণিজ্য-সঙ্ঘ গঠন করিয়া কাঁচা এবং কোক কয়লার দাম বাড়াইয়াছে। ধাতুনিষ্কাশণে এই উভয় উৎপন্ন দ্রব্যেরই যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন। এইরূপ অবস্থায় ধাতুনিষ্কাশনের প্রতিষ্ঠানগুলির অনেক মালিক নিজেদের খনি ও কোক প্রস্তুতকারী চুল্লী রাখিতে চেষ্টা করে। এইরূপে তাহারা বাণিজ্য-সঙ্ঘে মিলিত কয়লা-শিল্পকে চড়া দাম দেওয়ার হাত হইতে রেহাই পাইয়া অত্যধিক পরিমাণে অতি-মুনাফা (Super profits) আদায়ের সুযোগ পায়।

যৌথ কারবারের বিস্তারলাভ সচরাচর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ট সংযোগ আনিয়া দেয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের এক জটিল সংমিশ্রণ ঘটে; ইহার ফলে একটি প্রতিষ্ঠান অপর একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত কোনা সূত্রে সংযুক্ত হয়, দ্বিতীয়টি আবার যথা ক্রমে তৃতীয় একটির সহিত সংযুক্ত হয়, ইত্যাদি। শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী যোগাযোগ ও হস্তক্ষেপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে এইরূপ আর্থিক সংযোগের বিস্তৃতিকে শক্তিশালী করে।

করপোরেশন

পুঁজিপতিদের কোনো শক্তিশালী মণ্ডলী কর্ত্তৃক কোনো প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের এক বড় ভাগ খরিদ করিয়া লওয়া বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, একটি যৌথ কারবারের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব পাইতে হইলে তাহার সম্পূর্ণ অংশের এক তৃতীয়াংশের অধিকারী

হওয়াই যথেষ্ট। এই পরিমাণ অংশের (বা যেমন বলা হয়, **কর্ত্তৃত্ব-মূলক স্বার্থ**) অধিকারী হইয়া পুঁজিপতিদের মণ্ডলী একটির পর একটি যৌথ কারবারকে নিজের আয়ত্তে আনিয়া ফেলে। সর্ব্বত্রই বৃহৎ পুঁজির রাজাদের প্রভাব ও কাজের ক্ষেত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করিয়া বসে এবং এই পদ্ধতি যে-রূপ পরিগ্রহ করে তাহাও অত্যন্ত বিভিন্ন ধরনের।

সাধারণত, পারস্পরিক **আর্থিক** নির্ভরতার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান-সমূহকে এইরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে একত্র সংযুক্ত করাকে বলা হয় মিলিত-করণ (Incorporation), এবং এইরূপে গঠিত মণ্ডলীকেই বলা হয় **সঙ্ঘ** (করপোরেশন)।

অবাধ প্রতিযোগিতার স্থলে পুঁজিবাদী একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা সাম্রাজ্যবাদী যুগের এক মৌলিক বৈশিষ্ট। মার্ক্স্ এমন কি তাঁহার নিজের যুগেই প্রচার করিয়াছিলেন যে, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে অনিবার্য্য রূপে একচেটিয়া ব্যবসায়ের উদ্ভব এবং প্রাধান্য ঘটিবে। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায়ে অবাধ প্রতিযোগিতাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা কোনো একটি পণ্যের সমগ্র উৎপাদনের কর্ত্তৃত্ব পাইবার চেষ্টা করে। একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবস্থা ব্যাপক শ্রমিক সাধারণের শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া পুঁজিপতিদের ঐশ্বর্য্য লাভের অসাধারণ সুযোগ সৃষ্টি করে।

একচেটিয়া ব্যবসায় ও প্রতিযোগিতা

একচেটিয়া ব্যবসায়ের উদ্ভব এবং বিকাশ কিন্তু পুঁজিপতিদের আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার অবসান ঘটায় না, বরঞ্চ এই প্রতি-যোগিতাকেই করিয়া তোলে তীব্র ও ভীষণতর। আগেকার অবাধ প্রতি-যোগিতার আমলে বিভিন্ন পুঁজিপতি পরস্পরে সংগ্রাম করিত; এখন তাহার

জায়গায় মণ্ডলীর বিরুদ্ধে মণ্ডলীর যুদ্ধ—পুঁজিপতিদের শক্তিশালী সম্মিলনগুলি (ইউনিয়ন) সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। যে-সব প্রতিষ্ঠান তাহাদের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয় না (অর্থাৎ তথাকথিত 'অবাধ্য' প্রতিষ্ঠান) সেই সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা ভীষণ জেহাদ শুরু করে। এই সংগ্রামে সর্ব্ব প্রকারের হীন কৌশলই অবলম্বিত হয়; এমন কি, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানকে বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা পণ্যের দাম বাড়াইবার ফলে শিল্পের যে-সব শাখা এই সব পণ্য খরিদ ও ব্যবহার করে সেই সব শিল্পের তরফ হইতে ভীষণ বাধার উদ্ভব ঘটে। কয়লা-বাণিজ্যসঙ্ঘ যখন কয়লার দাম বাড়ায়, তখন কয়লা ব্যবহারকারী কারখানার সমস্ত মালিকদের নিকট হইতেই আসে বাধা। অনেকে কয়লার পরিবর্ত্তে বোদমাটি (peat, অর্থাৎ পচা গাছপালা যাহা এখনও কয়লায় রূপান্তরিত হয় নাই অথচ শুক্নো অবস্থায় কয়লার মত জ্বলে) বা তৈল প্রভৃতি অন্য জ্বালানি ব্যবহারের চেষ্টা করে কিংবা বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার আরম্ভ করে। ধাতুনিষ্কাশনের শিল্প বিশেষ ভাবে বেশী পরিমাণে কয়লা ও কোক ব্যবহার করে বলিয়া নিজস্ব কয়লার খনি রাখার চেষ্টা করে। শিল্পের বিভিন্ন শাখায় শুরু হইয়া যায় জীবনমরণের সংগ্রাম। কোনো শিল্পে একত্রীকরণের পরিমাণ যত বেশী, একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রাধান্য যত বেশী—এই সংগ্রামও ততই প্রচণ্ড।

একচেটিয়া ব্যবসায়ী-সমিতির ভিতরে তীব্র সংগ্রাম শুরু হয়। অতীতের প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগীরা মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘে, বাণিজ্য-সঙ্ঘে বা ব্যবসায়-সঙ্ঘে মিলিত হইয়া নূতন উপায়ে নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম চালাইতে থাকে। প্রত্যেকেই এজমালী (common) একচেটিয়া লাভের বৃহত্তম ভাগ আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে। একচেটিয়া ব্যবসায়ের

আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা সাধারণত অত্যন্ত গোপনে পরিচালিত হয়; কেবল উগ্র সংগ্রামের ক্ষেত্রেই ইহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রতিযোগিতাই কেবল একচেটিয়া ব্যবসায় সৃষ্টি করে না, একচেটিয়া ব্যবসায়ও আবার **প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়া** তাহাকে অত্যন্ত **প্রবল** ও **তীব্র** করিয়া তোলে।

"অবাধ প্রতিযোগিতা পুঁজিবাদের, এবং সাধারণ ভাবে, পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। একচেটিয়া ব্যবসায় কিন্তু অবাধ প্রতিযোগিতার ঠিক বিপরীত: কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে অবাধ প্রতিযোগিতা চোখের সামনে একচেটিয়া ব্যবসায়ে রূপান্তরিত হইয়া ক্ষুদ্রাকার শিল্প নিশ্চিহ্ন করিয়া বৃহদাকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতেছে, বৃহদাকারের স্থানে আরও বৃহদাকার শিল্পের সৃষ্টি করিতেছে, পরিশেষে উৎপাদন ও পুঁজির একত্রীকরণ এত দূর পর্য্যন্ত হইতেছে যে তাহার ফলে একচেটিয়া ব্যবসায়ের (যেমন, মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘ, বাণিজ্য-সঙ্ঘ এবং ব্যবসায়-সঙ্ঘের) উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে; ইহাদের সহিত সংযুক্ত থাকে কোটি কোটি টাকার কারবারী দশ বারোটি ব্যাঙ্ক। কিন্তু সেই সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতা হইতে উদ্ভূত একচেটিয়া ব্যবসায় আপনার প্রসূতির বিনাশ সাধন করে না, তাহার পাশাপাশি বর্ত্তমান থাকে ও তাহারই চারিধারে ঘোরাফেরা করে, ফলে অনেক তীব্র বিরোধ, সংঘর্ষ ও সংঘাতের সৃষ্টি করে।" *

লেনিন বারবার জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, একচেটিয়া ব্যবসায়ের আধিপত্যের দ্বারা অবাধ প্রতিযোগিতার স্থান পূরণ সাম্রাজ্যবাদী যুগের

* লেনিন: 'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্ব্বোচ্চ স্তর,' পৃঃ ৮০।

সর্ব্বাপেক্ষা **গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য**। এই স্থান পূরণের অর্থ প্রতিযোগিতার অবসান নয়, পক্ষান্তরে প্রতিযোগিতার চরমে উঠার এক শর্ত্ত! লেনিন সর্ব্বদাই নির্দ্দেশ করিতেন যে, সাম্রাজ্যবাদ হইল একচেটিয়া পুঁজিবাদ (monopoly capitalism)। লেনিনের ভাষায় একচেটিয়া ব্যবসায় হইল পুঁজিবাদী বিকাশের আধুনিকতম স্তরের শেষ কথা। লেনিন বলেন: **অবাধ প্রতিযোগিতার বদলে একচেটিয়া ব্যবসায়** প্রতিষ্ঠা সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক অর্থনৈতিক বিশেষত্ব, তাহার সারবস্তু। সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের এক বিশেষ স্তর হিসাবে বর্ণনা করিতে যাইয়া লেনিন সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে তাঁহার লেখায় বলিতেছেন:

সাম্রাজ্যবাদ—একচেটিয়া পুঁজিবাদ

"সাম্রাজ্যবাদের সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজন হইলে বলিতে হইবে যে সাম্রাজ্যবাদ হইতেছে পুঁজিবাদের একচেটিয়া ব্যবসার স্তর। এইরূপ একটি সংজ্ঞায় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই প্রকাশ পায়; কারণ এক দিকে, আর্থিক পুঁজি হইল কয়েকটি বড় বড় একচেটিয়া ব্যবসায়ীর ব্যাঙ্কের পুঁজি, এই ব্যাঙ্ক-পুঁজি মিলিত হইয়াছে উৎপাদকদের একচেটিয়া সমবায়ের (combines) পুঁজির সহিত; এবং অপর দিকে, পৃথিবীর ভাগ-বাঁটোয়ারার পথ হইতেছে পুরাতন ঔপনিবেশিক নীতি হইতে নূতন ঔপনিবেশিক নীতিতে বিবর্ত্তন;—পৃথিবীর অঞ্চলগুলি যখন কোনো পুঁজিবাদী শক্তি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই, তখন যে-নীতি অবাধে ঐসব অনধিকৃত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা হইতেছে পুরাতন ঔপনিবেশিক নীতি; সমগ্র পৃথিবী যখন পুঁজিবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া গিয়াছে, তখন বিভিন্ন অঞ্চলে

একচেটিয়া অধিকার কায়েম করা হইতেছে নূতনতর ঔপনিবেশিক নীতি।" *

অন্যত্র লেনিন লিখিয়াছেন :

"অর্থনীতির দিক হইতে বলিতে গেলে সাম্রাজ্যবাদ (অথবা, ফিনান্স পুঁজির যুগ—শব্দ লইয়া আমরা বিতর্ক করিব না) হইল পুঁজিবাদের বিকাশের সর্ব্বোচ্চ স্তর, অর্থাৎ এই স্তরে উৎপাদন এত বৃহদাকারে চলে যে **একচেটিয়া ব্যবসা অবাধ প্রতিযোগিতার স্থান অধিকার করে।** ইহাই হইল সাম্রাজ্যবাদের **অর্থনৈতিক** সারমর্ম্ম। ব্যবসায় সঙ্ঘ, বাণিজ্য সঙ্ঘ প্রভৃতির মধ্যে, অসীম ক্ষমতাশালী বিরাট বিরাট ব্যাঙ্কের মধ্যে, কাঁচামাল একচেটিয়াকরণ (cornering) প্রভৃতির মধ্যে, ব্যাঙ্ক পুঁজির একত্রীকরণ প্রভৃতির মধ্যে একচেটিয়া ব্যবসা আত্মপ্রকাশ করে। সমগ্র বিষয়টির মূল রহিয়াছে অর্থনৈতিক একচেটিয়া ব্যবসায়ে।" †

এখানে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে একদিকে লেনিনের আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যদিকে সোশাল ডেমোক্রাটদের তত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত হিলফারডিং-এর (Hilferding) দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য প্রকাশ পাইয়াছে। আধুনিকতম পুঁজিবাদের শিল্প-কাঠামোর ক্ষেত্রে যে-সমস্ত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে হিলফারডিং তাহাদিগকে প্রধান মনে না করিয়া বরং সঞ্চালনের ক্ষেত্রে (প্রথমত ধার জমা ও ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে) যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাদিগকেই প্রাধান্য দিয়াছে। হিলফারডিং কর্ত্তৃক মার্ক্সের

* ঐ, পৃঃ ৮০-৮১।

† লেনিনের গ্রন্থাবলী, ১৯শ খণ্ড, 'মার্ক্সবাদের ব্যঙ্গ চিত্র ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদ' রুশ সংস্করণ, পৃঃ ২০৭।

অপব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য সূচক বিনিময়-ধারণা এই ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। উৎপাদনের প্রাধান্যের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতার চূড়ান্ত গুরুত্বের বদলে তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন সঞ্চালনের। বিনিময়-ধারণা হইল সোশাল-ডেমোক্রাট তাত্ত্বিকদের বিশেষত্ব। বিনিময়-ধারণা, এবং ইহার সহিত যুক্ত মূল্য, মুদ্রা এবং সঙ্কট সম্পর্কে কতকগুলি ভুলের জন্য হিলফারডিং এমন কি যুদ্ধের পূর্ব্বেই সুবিধাবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই সিদ্ধান্ত বিষয়ে লেনিন উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে হিলফারডিং বিষয়-গুলিকে এরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন যেন সমগ্র দেশের কর্ত্তা হইবার পক্ষে বার্লিনের বিরাট বিরাট ব্যাঙ্কগুলির ছয়টির কর্তৃত্ব লাভই যথেষ্ট। সমস্যাটিকে এইরূপভাবে উপস্থাপিত করার গূঢ় অর্থ হইতেছে ক্ষমতার জন্য, আপনার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা এবং দৃঢ় করার জন্য, উৎপাদনে কর্তৃত্ব করার জন্য, শিল্প ও কৃষি উভয়ক্ষেত্রে উৎপাদন সংগঠন করার জন্য সর্ব্বহারার এক সুদীর্ঘ বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাকে চাপিয়া রাখা। বিজয়ী সর্ব্বহারার প্রতি পদক্ষেপে বুর্জোয়াশ্রেণী যে ভীষণ প্রতিরোধের সৃষ্টি করে তাহা দূর করার প্রয়োজনীয়তাও ইহাতে চাপা পড়ে। যুদ্ধের পরে হিলফারডিং সংগঠিত পুঁজিবাদের বিশ্বাসঘাতক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। বিনিময়ধারণার মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবের পরিণত রূপই হইল সংগঠিত পুঁজিবাদ (organised capitalism)। এই তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা পরে করা চলিবে।

একচেটিয়া ব্যবসায় সমিতি সমূহ অতি দ্রুত প্রসার লাভ করে **আমেরিকায়**—তাই তাহাকে বলা হয় 'ব্যবসায় সঙ্ঘের দেশ।' বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভেই উৎপাদনের বৃহত্তর অংশ একীভূত হয় আমেরিকান ব্যবসায় সঙ্ঘ সমূহের হাতে। এইরূপ সমগ্র তৈল

উৎপাদনের শতকরা ৯৫ ভাগ ছিল তৈল ব্যবসায় সঙ্ঘের হাতে; একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুবিধা লইয়া তৈল ব্যবসায় সঙ্ঘ ইহার মুনাফা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৫ ভাগ হইতে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে তুলিয়াছিল শতকরা ৪২ ভাগে। রাসায়নিক শিল্পে উৎপাদনের শতকরা ৮১ ভাগ গেল রাসায়নিক ব্যবসায় সঙ্ঘের হাতে; সীসা-ব্যবসায় সঙ্ঘের হাতে শতকরা ৮৫ ভাগ, ইত্যাদি। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ষ্টিল করপোরেশন (যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত সঙ্ঘ—অনুবাদক) পৃথিবীর মধ্যে পুঁজির এক অতি শক্তিশালী সঙ্ঘ। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইহার পুঁজি ছিল ৪৫০ কোটি টাকা; এই পুঁজি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বাড়াইয়াছে ৭৫০ কোটি টাকা। এবং ইহার ১৪৭টি প্রতিষ্ঠান আছে। সঙ্কট পর্য্যন্ত এই সঙ্ঘ ৪৩ কোটি ২০ লক্ষ মণ অসংস্কৃত ঢালা লোহা এবং ৫৪ কোটি মণ ইস্পাত উৎপাদন করিয়াছিল। এই উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রের এই জাতীয় সমগ্র উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগের সমান। এই ব্যবসায় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজ করিত ২ লক্ষ ৭৬ হাজার লোক। প্রায় সমান সংখ্যক লোক 'আমেরিকান টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কোম্পানী' নামক অপর একটি ব্যবসায় সঙ্ঘ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল; দেশের সকল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের যোগাযোগের শতকরা ৮০-৮৫ ভাগই ছিল ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন। যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশ তিনটি বিরাট ব্যবসায় সঙ্ঘের হাতে একত্রীভূত। বৈদ্যুতিকশিল্পে একটি ব্যবসায় সঙ্ঘ (দি জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানি) প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। চিনি ও তামাক শিল্পের উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় সঙ্ঘের হাতেই।

অগ্রগণ্য পুঁজিবাদী দেশগুলিতে একচেটিয়া কারবার

আমেরিকার তৈল ব্যবসায় সঙ্ঘে খাটে ৩০০ কোটি টাকার উপর

পুঁজি। মোটরযান শিল্পে কুড়ি খানেক কারবার আছে; এই শিল্পের মোট উৎপাদনের কিন্তু তিন-চতুর্থাংশ হইল বড় বড় পাঁচটি কারবারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

ইহাদের মধ্যে আবার দুইটি প্রতিষ্ঠান পরস্পর ভীষণ রেষারেষি চালাইতেছে। ইহার একটি হইল সুবিখ্যাত ফোর্ড কোম্পানী এবং অপরটি ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল মোটরস্ করপোরেশন। ফোর্ডের মূলধনের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকার উপর; জেনারেল মোটরস্ করপোরেশনের—৪৫০ কোটি টাকা। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মোটর গাড়ী বিক্রয় হইতে জেনারেল মোটরস্-এর মোট আয় হইয়াছিল ৩০০ কোটি টাকা আর ফোর্ডের হইয়াছিল ২২৫ কোটি টাকা। ইহার নীট মুনাফা হইয়াছিল ৫৪ কোটি টাকা আর ফোর্ডের ৩০ কোটি টাকা।

আমেরিকার রেলপথের বিরাট জাল মুষ্টিমেয় কোটিপতিদের সম্পত্তি। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ২১৮৫০ মাইল রেলপথ ছিল মরগ্যান ধনাগার মণ্ডলীর পরিচালনাধীন; ইহার মূল্য ছিল ১০৫০ কোটি টাকা।

আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলি শিল্পের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। ব্যাঙ্কগুলির প্রভাব এবং পরিচালনাধীনে বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান আছে। এই জন্য মরগ্যান ব্যাঙ্ক মণ্ডলীর (Morgan banking group) পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট পুঁজির পরিমাণ ২২,২০০ কোটি টাকা বলিয়া অনুমান করা হয়।

সঙ্কটের ধাক্কায় অতি বিপুলকায় একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পর্য্যন্তও ফাটল ধরে। ইহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে ফোর্ডের কারখানা সমূহ সঙ্কটের পূর্ব্বে ১ লক্ষ ২০ হাজার লোক নিয়োগ করিত, কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের শরতকালে ১৫ হাজারের বেশী লোক নিয়োগ করে নাই। একচেটিয়া পুঁজির অপরাপর দানবগুলির দশাও

অনুরূপ। ক্রুগার ম্যাচ ট্রাষ্টের মত কয়েকটি বৃহত্তম ব্যবসায় সঙ্ঘ একেবারে দেউলিয়া হইয়া পড়ে। বৃটিশ তৈল 'রাজা' ডিটারডিং (Deterding) সোভিয়েটের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের জন্য প্রতিনিয়ত প্ররোচনা দিতেছিল, সঙ্কটের ফলে সে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়াছিল।

যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্মানিতে মোট ইস্পাত উৎপাদনের নয়দশমাংশ ছিল ষ্টিল ইউনিয়নের (Steel union) নিয়ন্ত্রণাধীন কয়লা শিল্পে, রেনিস ওয়েষ্টফেলিয়ান কোল সিণ্ডিকেট (Rhenish Westphalion coal syndicate) সংগঠনের সময়ে এই কয়লা অঞ্চলের কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৮৭ ভাগ (এবং পরে শতকরা ৯৫ ভাগ) উহার কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল; এই অঞ্চল কয়লা সম্পদে জার্মেনিতে সর্ব্বপ্রধান।

যুদ্ধোত্তর কালে ষ্টিন্‌স্ করপোরেশন সম্পর্কে জার্মানিতে আলোচনা চলিত। যুদ্ধের দিনে ষ্টিন্‌স্ (Stinnes corporation) সামরিক সরবরাহের দ্বারা বিপুল সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছিল। মুদ্রাস্ফীতির সুযোগ অর্থাৎ মার্কের মূল্য হ্রাস পাওয়ার সুবিধায় ষ্টিন্‌স্ প্রায় মাটির দামে কয়লার খনি, বৈদ্যুতিক সরবরাহ কারখানা, টেলিগ্রাফ এজেন্সী এবং ধনাগার, কাগজের কল এবং জাহাজ পথ, ধাতুনিষ্কাশনের কারখানা এবং সংবাদ পত্র প্রভৃতি সকলরকম প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিয়াছিল। মার্কের মূল্যের স্থিতিশীলতা লাভ হওয়া মাত্রই লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-নিয়োগকারী এই প্রতিষ্ঠানটি তাসের ঘরের মত টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

যুদ্ধোত্তর যুগে জার্মানিতে একত্রীকরণের এবং বিরাট একচেটিয়া ব্যবসায়ী সম্মিলনী সংগঠনের এক নূতন ঢেউ আসিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের শেষাবধি সকল যৌথ কারবারের দুই তৃতীয়াংশ (নিয়োজিত পুঁজি অনুসারে) সঙ্ঘ (করপোরেশন) সমূহের মধ্যে মিলিত হইল। প্রায় সেই সময়েই মিলনের ফলে জার্মানি রাসায়নিক ও ইস্পাতের দুইটি

বৃহত্তম ব্যবসায় সঙ্ঘ গঠিত হইল। রাসায়নিক ব্যবসায় সঙ্ঘে মূলধন খাটিত প্রায় ৭০ কোটি ৯০ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা (১২০ কোটি জার্মান মার্ক)। ইহারই হাতেই একীত্রভূত হইয়াছিল রংয়ের কারখানার শতকরা ৮০ ভাগ এবং নাইট্রোজেন উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ। জার্মানির ইস্পাত ব্যবসায় সঙ্ঘে খাটিত প্রায় ৪৬ কোটি ৯ লক্ষ ৯ হাজার টাকার (৮০ কোটি মার্ক) মূলধন আর দেড় লক্ষের উপর শ্রমিক (সঙ্ঘের সময় পর্য্যন্ত)। ইহারা উৎপাদন করিত জার্মানির মোট ঢালা লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনের প্রায় অর্দ্ধেক।

অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও ঠিক একই জিনিস দেখা যায়। ইংলণ্ডে, জাপানে, ফ্রান্সে, ইটালিতে, এমন কি, বেলজিয়াম বা সুইডেনের মত ক্ষুদ্র দেশেও—সর্ব্বত্রই অত্যন্ত অল্পসংখ্যক বিরাট একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের হাতেই কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে: এই সব একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান মুষ্টিমেয় ফ্রান্সের ডিরেক্টরদের দ্বারা পরিচালিত।

জারশাসিত রুশীয়াতেও পুঁজিপতিদের কতকগুলি বিরাটকায় একচেটিয়া সমবায় ছিল। ডোনেৎস অববাহিকায় উৎপন্ন কয়লার অর্দ্ধেকের বেশী ছিল প্রোডুগোল সিণ্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণাধীন। অপর একটি বাণিজ্য সঙ্ঘ প্রোডামেটেব বাজারে লোহ বিক্রয়ের শতকরা ৯৫ ভাগ পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করিত। চিনি-বাণিজ্য সঙ্ঘ ছিল অতি পুরাতন সঙ্ঘগুলির অন্যতম।

সাম্রাজ্যবাদের আওতায় **ব্যাঙ্কগুলি** যে নূতন ভূমিকা গ্রহণ করে তাহার ফলে একচেটিয়া ব্যবসায়ের শক্তি এবং গুরুত্ব উভয়ই যথেষ্ট বাড়িয়াছে। প্রথম দিকে আদানপ্রদানের ব্যাপারে মধ্যস্থের কাজ করিত

ফিনান্স ক্যাপিটেল

ব্যাঙ্ক। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙ্কের ধারজমা দেওয়া-নেওয়ার কাজ বাড়িতে থাকে। ব্যাঙ্ক কারবার করে পুঁজি লইয়া। যে-সব পুঁজিপতি আপাতত পুঁজি নিজেরা

ব্যবহার করিতে পারে না, তাহাদের নিকট হইতে পুঁজি সংগ্রহ করিয়া বা যে-সব পুঁজিপতির পুঁজির প্রয়োজন ব্যাঙ্ক তাহাদিগকে সেই পুঁজি সরবরাহ করে। ব্যাঙ্ক সর্ব্বপ্রকারের আয় সংগ্রহ করিয়া পুঁজি-পতিদের হাতে দেয়।

পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মতই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানও সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহাদের আকার ও আবর্ত্তন নিয়ত বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা বিপুল পরিমাণ পুঁজি সঞ্চয় করে। এই পুঁজির বৃহত্তর অংশ অন্যের সম্পত্তি, কিন্তু ব্যাঙ্কের নিজের পুঁজিও বাড়িয়া চলে। ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস পায়, ছোট ছোট ব্যাঙ্ক বন্ধ হয় বা বৃহত্তর প্রতিদ্বন্দ্বীর কুক্ষিগত হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কের আকার ও তাহাদের পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে নিচের দৃষ্টান্তটিই যথেষ্ট হইবে। ১৮৯০ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১০৪ হইতে ৪৪ হয়, কিন্তু তাহাদের পুঁজি ৫৫৯ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া হয় ১১০৫ কোটি টাকা। কেবলমাত্র প্রয়োজনের সময়ে পুঁজিপতিদের অল্প-মেয়াদী (short termes) ঋণ-দানের মধ্যে কোনো ব্যঙ্ক আর এখন নিজের কাজ সীমাবদ্ধ রাখিতে পারে না। বিপুল সঞ্চিত পুঁজির সদ্ব্যবহারের জন্য **ব্যাঙ্ক শিল্পের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে।** উৎপাদন প্রসারণ প্রভৃতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী (long termed) ঋণ দান করিয়া ব্যাঙ্ক এখন তাহার আমানতী জমার (Deposits) কিছু অংশ প্রত্যক্ষ ভাবে শিল্পে নিয়োগ করে।

যৌথ কারবারের দৌলতে ব্যাঙ্ক শিল্পে পুঁজি খাটাইবার অত্যন্ত সুবিধা লাভ করে। ব্যাঙ্কের পক্ষে করণীয় হইল প্রতিষ্ঠানটির নিয়মিত পরিমাণ অংশ খরিদ করা। মোট অংশের মাত্র এক-তৃতীয়াংশের

কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াই ব্যাঙ্ক সমগ্র প্রতিষ্ঠানের উপর পূর্ণকর্ত্তৃত্ব এবং অপরিমিত ক্ষমতা লাভ করে।

যৌথ কারবার এইরূপে ব্যাঙ্ক ও শিল্পের মধ্যে সংযোগসূত্র রূপে কাজ করে। ব্যাঙ্কগুলি আবার যৌথ কারবারের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, নিজেরাই ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলিকে যৌথ কারবার রূপে পুনর্গঠন (নূতন নীতি অনুযায়ী পুনর্গঠন) এবং নূতন যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়। অংশ (শেয়ার) ক্রয়-বিক্রয়ও ক্রমেই অধিক পরিমাণে ব্যাঙ্কের মারফতেই হইতে থাকে।

একত্রীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের নিয়ম ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে বিশেষ প্রবল ভাবে প্রকাশ পায়। বৃহত্তম পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তিনটি হইতে পাঁচটি বৃহত্তম ব্যাঙ্কই সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করে। অপরাপর ব্যাঙ্কগুলি কার্য্যত এই বিরাট ব্যাঙ্ক সমূহের তাঁবেদার এবং তাহাদের স্বাধীনতা কেবল লোক দেখানো, অথবা তাহাদের গুরুত্ব অতি নগণ্য। এই সব বিরাট ব্যাঙ্ক একচেটিয়া শিল্প সমিতিগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। **ব্যাঙ্ক পুঁজি ও শিল্প পুঁজির** মিশ্রণ বা সম্মিলন চলিতেছে। শিল্প পুঁজির সহিত সম্মিলিত ব্যাঙ্ক পুঁজিকে ফিনান্স পুঁজি (ফিনান্স ক্যাপিটেল) বলে। একচেটিয়া শিল্প ব্যবসায়ের সহিত ব্যাঙ্ক পুঁজির সংমিশ্রণ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ। সেই জন্যই সাম্রাজ্যবাদকে বলা হয় ফিনান্স পুঁজির মূল।

একচেটিয়া ব্যবসায় ও ফিনান্স পুঁজির বিকাশ ও বৃদ্ধি পুঁজিবাদী জগতের সমগ্র ভাগ্য **প্রধানতম পুঁজিপতিদের ক্ষুদ্র এক মণ্ডলীর** হাতে ছাড়িয়া দেয়। শিল্প-পুঁজির সহিত ব্যাঙ্ক-পুঁজির মিলন এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাহাতে বৃহত্তম ব্যাঙ্ক মালিকেরা শিল্পের পরিচালনা আরম্ভ করে এবং বৃহত্তম শিল্পপতিরা স্থান পায়

ব্যাঙ্কের পরিচালক মণ্ডলীতে। প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশেই সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের ভাগ্য অতি অল্পসংখ্যক ব্যাঙ্ক মালিক ও একচেটিয়া ব্যবসায়ীর করতলগত থাকে। আর অর্থনৈতিক জীবনের ভাগ্যনিয়ন্তাই হইল সমগ্র দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা। সাম্রাজ্যবাদী যুগে বুর্জোয়া দেশগুলির গভর্নমেণ্টের গঠন যেমনই হোক না কেন, কার্য্যত **সম্পূর্ণ ক্ষমতা** থাকে ফিনান্স পুঁজির মুষ্টিমেয় মুকুটহীন রাজার হাতে। সরকারী রাষ্ট্র (official state) এই পুঁজিপতি পাণ্ডাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-সমূহের মীমাংসা নির্ভর করে বড় বড় পুঁজিপতিদের এক ক্ষুদ্র মণ্ডলীর উপর। নিজেদের লোভনীয় স্বার্থ সাধনে এই সব পুঁজিপতিরা এক দেশের সহিত অপরাপর দেশের প্রচণ্ড বিরোধ সৃষ্টি করে, যুদ্ধের উস্কানি দেয়, শ্রমিক আন্দোলন দমন করে আর উপনিবেশ সমূহের জন-অভ্যুত্থানকে পিষিয়া ফেলে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুষ্টিমেয় লোক সমগ্র জাতির জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পুঁজিবাদী জার্মানির নেতাদের অন্যতম 'এ, ই, জি'র (General Electric Co.) পরিচালক র‍্যাথেন্যু এক সময়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন ঃ

> "পরস্পরের সহিত পরিচিত তিন শত লোক সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্তা এবং তাহারা নিজেদের দল হইতেই স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করে।"

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ অনুমিত হয় যে ফ্রান্সে ৫০-৬০ জন বড় বড় আর্থিক পুঁজিপতি (Financiers) ১০৮টি ব্যাঙ্ক, ভারী শিল্পের (অর্থাৎ কয়লা, লোহা ইত্যাদি) বৃহত্তম ১০৫টি প্রতিষ্ঠান, ১০১ টি রেলপথ কারবার এবং অন্যান্য ১০৭টি প্রধান প্রতিষ্ঠান—একুনে ৪২১টি

প্রতিষ্ঠানের মালিক; ইহাদের প্রত্যেকটিরই মূলধন হইল কোটি কোটি টাকা। অতিশয় ক্ষুদ্র এক মণ্ডলীর হাতে সমগ্র সম্পদের প্রধান অংশের একত্রীকরণ অতি দ্রুতগতি অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে ইংলণ্ডে দেশের সমগ্র সম্পদের শতকরা ৩৮ ভাগ বেসরকারী মালিকদের শতকরা ০·১২ ভাগের কুক্ষিগত এবং শতকরা ২ ভাগেরও কম লোক দেশের সম্পদের শতকরা ৬৪ ভাগের মালিক। যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা প্রায় ১ ভাগ লোক সমগ্র দেশের সম্পদের শতকরা ৫৯ ভাগের মালিক।

অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। বিপুল পরিমাণ **পণ্য** জাহাজযোগে দেশ হইতে দেশান্তরে রফতানী হয়। একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে পুঁজি রফ্তানী অতিশয় গুরুত্ব লাভ করে।

পুঁজি রফ্‌তানি

সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য—পুঁজি রফ্তানি একচেটিয়া ব্যবসায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। পুরাতন পুঁজিবাদী দেশ সমূহে বহুকাল ধরিয়া পুঁজিবাদের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই সব দেশে একচেটিয়া ব্যবসায়ে প্রভূত পরিমাণে "উদ্বৃত্ত" পুঁজি সৃষ্টি করে। একচেটিয়া ব্যবসায় আবার স্বদেশে পুঁজি খাটাইবার সুযোগ হ্রাসেরও কারণ। একচেটিয়া ব্যবসায়ে সঞ্চিত মুনাফা লাভজনক দাদনের সুযোগ সন্ধানে দেশের বাহিরে চলিয়া যায়। লাভজনক দাদনে (investment) পুঁজি খাটাইবার এমন সুযোগ পাওয়া যায় অধিকতর অনুন্নত দেশে। সেখানে মজুরীও যেমন খুবই কম, কাজের রোজও তেমনি অত্যন্ত দীর্ঘ। পুঁজিপতিদের দ্বারা কাঁচা মালের উৎস এখনও সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠিত হয় নাই। বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা বিপুল—পুঁজিবাদী উৎপন্ন পণ্যসম্ভার ক্ষুদ্র কারিগরী প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপন্ন পণ্যকে হটাইয়া

দেয়, কোটি কোটি ক্ষুদ্র উৎপাদককে বুভুক্ষা আর অনশনের কবলে নিক্ষেপ করে। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায় দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার অধিকার করে। বৈদেশিক পুঁজিপতিদের পক্ষে সেখানে পণ্য বিক্রয় করা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠে। আমদানী শুল্ক চড়া হওয়ার দরুণ পণ্যের আমদানি বাধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায়ের সংগঠন সেই সঙ্গে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যে উন্নত পুঁজিবাদী দেশ সমূহেও আভ্যন্তরীণ বাজার বিরাট প্রতিষ্ঠান সমূহের পণ্যবিক্রয়ের দাবী পূরণ করিতে ক্রমেই অপারগ হইয়া পড়ে। একচেটিয়া ব্যবসায় দাম চড়াইয়া দেয়, ফলে আভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কুচিত হয়: বাধ্য হইয়া প্রতি নিয়ত অধিক মাল তাহাদিগকে বাহিরের বাজারে পাঠাইতে হয় কিন্তু উচ্চ শুল্ক-প্রাচীরে ঘেরাও এই সব বাজারে পণ্য বিক্রয় তাহারা কেমন করিয়া করে?

এইখানেই সাহায্য করে পুঁজি রফতানি। বৃহত্তম পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান সমূহ তাহাদের পুঁজির অংশ রফ্তানি করে। বিদেশে নিজেদের শাখা স্থাপন করে। সেখানে কলকারখানা স্থাপন করিয়া তাহারা সেই দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে তাহাদের পণ্যসম্ভার চালান দেয়।

পুঁজির রফ্তানি কিন্তু কেবল প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্যই হয় না। বিভিন্ন প্রকারের ঋণের আকারেও ধনী দেশ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশকে দাসত্ব ও অধীনতার শিকলে বাঁধিয়া ফেলে।

যুদ্ধের আগে ইওরোপের সর্ব্বপ্রধান তিনটি দেশের (ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানি) বিদেশে নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ বিপুল আকার ধারণ করে: প্রায় ৫১৪৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। এই পুঁজির বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৩,৬৮১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের পুঁজি রফ্তানির যে-গুরুত্ব তাহা নিম্নলিখিত

তথ্যের দ্বারা দেখানো হইয়াছেঃ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ শিল্পজাত পণ্য রফ্‌তানি হইয়াছিল ৯১০ কোটি টাকার, আর এই রফ্‌তানিতে মুনাফা হইয়াছিল প্রায় ১৩০ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯২৫ খৃষ্টাব্দেই বৃটেন বিদেশে নিয়োজিত তাহার পুঁজির সুদ বাবদ পাইল ৫৪৬ কোটি টাকা। মাল রফ্‌তানি হইতে প্রাপ্ত মুনাফার চার গুণেরও বেশী হইল সুদ।

পুঁজি প্রধানত যায় অনুন্নত দেশে, শ্রমশক্তি সেখানে সস্তা, শিল্প দুর্ব্বল, পণ্যের বাজারও তাই বিরাট ও ব্যাপক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪) প্রারম্ভে রুশ শিল্পে নিয়োজিত বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ছিল ২৭৬২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার উপর। রুশিয়ার কয়লা শিল্পে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের পুঁজি এত অধিক পরিমাণে নিয়োজিত হইয়াছিল যে রুশিয়ার সর্ব্ববৃহৎ কয়লা উৎপাদনকারী (শতকরা ৬৫ ভাগ) প্রতিষ্ঠান প্রোড়ুগোলের প্রধান দফ্‌তর স্থায়ী ভাবে প্যারিসে অবস্থিত ছিল। রুশ বিদ্যুৎ এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম শিল্পসমূহ জার্মান এ, ই, জি, এবং সিমেন্‌স্ সুকার্ট-এর প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। রুশিয়ার তৈলশিল্পে বৃটেন, আমেরিকা এবং হল্যাণ্ডের বিপুল পরিমাণ পুঁজি নিয়োজিত হইয়াছিল।

পুঁজির রফ্‌তানির সঙ্গে সঙ্গেই রফ্‌তানিকারী ও আমদানীকারী দেশসমূহের মধ্যে **ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ** স্থাপিত হয়। পুঁজির রফ্‌তানিকারী দেশের স্বার্থ হইল যে-দেশে পুঁজি যায় সেই দেশের তৎকালীন অবস্থা বজায় রাখা। ফরাসী পুঁজিপতিদের যেমন স্বার্থ ছিল রুশিয়ার জারতন্ত্র কায়েম রাখা, এবং সেই জন্যই তাহারা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জারকে ঋণ দিয়া প্রথম রুশ বিপ্লবকে নির্ম্মূল করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি রফ্তানির পরিমাণ নিয়ত বাড়িতে থাকে এবং অতিশয় গুরুত্ব লাভ করে।

পুরাতন ধরণের পুঁজিবাদের আওতায় অবাধ প্রতিযোগিতা প্রচলিত ছিল। তখন মাল রফ্তানি ছিল বিশিষ্ট লক্ষণ। আধুনিক পুঁজিবাদী আওতায় যখন একচেটিয়া ব্যবসায় প্রচলিত, তখন বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে পুঁজিতন্ত্র রফ্তানি।" *

সাম্রাজ্যবাদের অধীনে পুরোভাগে আসে পুঁজি রফতানি। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, মাল রফতানি হ্রাস পায় বা তাহার গুরুত্ব লোপ পায়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বিপুল পরিমাণ মাল জাহাজে চালান দেওয়ার সহিত পুঁজি রফ্তানি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ যদি ধরা যায় যে, বৃটেন আর্জেন্টিনায় পুঁজি রফ্তানি করে—ইহার অর্থ তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, বৃটিশ পুঁজিপতিরা আর্জেন্টিনায় সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয় করিল। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, এই সব প্রতিষ্ঠানের সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির বৃহত্তম অংশ আমদানী করা হইবে ইংলণ্ড হইতে। অথবা পুঁজি রফতানি নিম্নলিখিত রূপও গ্রহণ করিতে পারে। ধরা যাক, গ্রেট বৃটেন অন্য কোনো দেশকে ঋণ দিল। এইরূপে প্রাপ্ত মুদ্রার বিনিময়ে উক্ত ঋণী দেশ ইংলণ্ড হইতে রেলপথের উপকরণ, সামরিক সরঞ্জাম প্রভৃতি মালপত্র খরিদ করে। অতএব দেখা গেল যে, পুঁজি রফ্তানি কেবল যে পণ্য রফ্তানি হ্রাস করে না তাহাই নহে, পক্ষান্তরে বহির্বিশ্বের বাজারের জন্য সংগ্রাম, পণ্য বিক্রয় প্রসারণের সংগ্রামে এক শক্তিশালী নূতন অস্ত্রে রূপান্তরিত হয়।

* লেনিন: 'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্ব্বোচ্চ স্তর'। পৃঃ ৫৭।

বাণিজ্য সঙ্ঘ ও ব্যবসায় সঙ্ঘগুলি কৃত্রিম উপায়ে দাম চড়া রাখে এবং নিজেরা বিপুল পরিমাণে অতি-মুনাফা উপায় করে। চড়া দাম **বজায় রাখার উদ্দেশ্যে** একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের দেশকে বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে আড়ালে রাখিবার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্ট আমদানী পণ্যের উপর উচ্চ বসায়। অনেক সময়ে শুল্কের পরিমাণ পণ্য মূল্যের বহুগুণের বেশী হয়।

পুঁজিপতিদের সম্মিলনী সমূহের মধ্যে পৃথিবী বিভাগ

১৯২৭ খৃষ্টাব্দেই গড়পড়তা শুল্কের পরিমাণ (পণ্যমূল্যের শতকরা হার হিসাবে) ছিল—যুক্তরাষ্ট্রে ৩৭ ভাগ, জার্মানিতে ২০ ভাগ, ফ্রান্সে ২১ ভাগ, বেলজিয়ামে ১৫ ভাগ, আর্জেন্টিনায় ২৯ ভাগ, স্পেনে ৪১ ভাগ, হাঙ্গেরীতে ২৭ ভাগ, অষ্ট্রিয়ায় ১৬ ভাগ, চেকোশ্লোভাকিয়ায় ২৭ ভাগ, যুগোশ্লাভিয়ায় ২৩ ভাগ, পোল্যাণ্ডে ৩২ ভাগ, ইতালীতে ২২ ভাগ, সুইডেনে ১৬ ভাগ। ইহাই হইল গড়পড়তা শতকরা হিসাব। কতকগুলি জিনিসের উপর (যেমন, দেশে যে সব কাঁচা মাল পাওয়া যায় না) অতি উচ্চ শুল্ক বসানো সম্ভবপর নয় বলিয়া অন্যান্য জিনিসের উপর (মুখ্যত শিল্পজাত দ্রব্যাদি, অংশত খাদ্যাদি) শুল্কের হার অত্যন্ত উচ্চ হইতে বাধ্য। গত কয়েক বৎসরের মধ্যেই অধিকাংশ দেশে নূতন বর্দ্ধিত শুল্ক হার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে যুক্তরাষ্ট্রে এক নূতন শুল্ক আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহার ফলে বহু সংখ্যক পণ্যের আমদানী কার্য্যত নিষিদ্ধ করা হয়। সেই বৎসরই জার্মানি কৃষিজাত পণ্যসম্ভারের উপর শুল্ক অভূতপূর্ব্ব পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। এই উপায়ে পূর্ব্ব প্রুশিয়ার জমিদারেরা নিজেদের উৎপন্ন মালের দাম বাড়াইয়া দিবার সুযোগ পায়। শেষ পর্য্যন্ত এই সব কিছুর বোঝা

শ্রমিকশ্রেণীকেই বহন করিতে হয়, কারণ তাহারাই জিনিস ব্যবহার-কারীদের মূল অংশ।

এই ভাবে আভ্যন্তরীণ বাজারকে একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল করা হয়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাজার হইল সীমাবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় শ্রেণীবিরোধ অধিকতর তীব্র হয় এবং জনসাধারণের দারিদ্র্য বাড়িয়া চলে। বিরাট প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ পণ্যসম্ভারের কাটতি দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে সম্ভব হয় না। বিদেশী বাজারের জন্য লড়াই পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করে। একচেটিয়া পুঁজির অধীন সশস্ত্র রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে থাকে। প্রবল শক্তিশালী একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান সমূহ এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। এই সংগ্রাম যে ক্রমশই তীব্র ও ভীষণতর হইবে তাহা সুস্পষ্ট। এ কথা খুবই স্পষ্ট যে,—সাম্রাজ্যবাদের আওতায় বাজারের জন্য সংগ্রাম, তৎসহ **কাঁচা মালের উৎসের জন্য সংগ্রাম, পুঁজি রফ্তানির বাজারের জন্য সংগ্রাম, দুনিয়ার ভাগ বাঁটোয়ারার জন্য সংগ্রাম,** অবশ্যম্ভাবী সশস্ত্র সংঘর্ষ ও সর্ব্বনাশা যুদ্ধের কারণ হইয়া উঠে।

এক চেটিয়া ব্যবসায় প্রসার লাভ করার ফলে বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহ বাজার বিভাগ সম্পর্কে এক আপোস চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করে। যখন বিভিন্ন দেশে দুইটি কি তিনটি বৃহত্তম ব্যবসায় সঙ্ঘ কোনো নির্দ্দিষ্ট পণ্য বিশেষের উৎপাদনে চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের মধ্যে সংগ্রাম বিশেষ ধ্বংসকর হইয়া উঠে। তখন চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা অবশ্যম্ভাবী। এই চুক্তিতে সাধারণত বাজারবিভাগের ব্যবস্থা থাকে। প্রত্যেক চুক্তিকারীর জন্য কয়েকটি দেশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই সব

দেশে সে অপরাপর চুক্তিকারীদের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়াই স্বীয় পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। এমন কি, যুদ্ধের (১৯১৪) পূর্ব্বেই শিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এইরূপ **আন্তর্জ্জাতিক মূল্যনিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘের** অস্তিত্ব ছিল। সেই সময়ে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের উৎপাদন ব্যাঙ্কের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত দুইটি বিপুলকায় আমেরিকান এবং জার্মান ব্যবসায়-সঙ্ঘের হাতে একত্রীভূত ছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে তাহারা এক আপোস চুক্তিতে উপনীত হয়: প্রত্যেকের 'ভাগেই' কয়েকটি দেশ নির্দ্দিষ্ট হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকান ও জার্মান জাহাজী কারবারের মধ্যেও একটি চুক্তি ছিল। রেলপথ ও দস্তা ব্যবসায়ের বাণিজ্য-সঙ্ঘ ছিল। তৈল ব্যবসায়ের সঙ্ঘগুলির মধ্যেও চুক্তির আলোচনা চলিতেছিল।

যুদ্ধের পরে ইওরোপের কতকগুলি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া কয়েকটি মূল্যনিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল, যেমন, ইস্পাত মূল্যনিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘ, পাথর, রাসায়নিক দ্রব্য, তামা, এ্যালুমিনিয়ম, রেডিও, তার, কৃত্রিম রেশম, দস্তা, কাপড়, কলাইকরা বাসনপত্র উৎপাদনের মূল্যনিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘ সমূহ। ইহাদের অধিকাংশেই ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়া যোগদান করিয়াছিল। কোনো কোনোটিতে আবার পোল্যাণ্ড, স্যুইট্জারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, স্পেন এবং স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান দেশসমূহও ছিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের বিশ্বসঙ্কট এই সব মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘের অধিকাংশের উপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ বিরোধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং এই সব মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘের অনেকগুলিই হয়তো ইতি পূর্ব্বেই ভাঙিয়া পড়িয়াছে, না হয় ভাঙার মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

এই সব আন্তর্জ্জাতিক একচেটিয়া ব্যবসায়ের চুক্তিকে বিরোধ মীমাংসার

শান্তিপূর্ণ উপায় মনে করিলে ভুল করা হইবে। বরঞ্চ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত।

"পুঁজিবাদী একচেটিয়া ব্যবসায় কতদূর বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহারই সাক্ষ্য দেয় আন্তর্জ্জাতিক মূল্যনিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘগুলি, এবং বিভিন্ন পুঁজিবাদী সঙ্ঘের (ইউনিয়ন) মধ্যে সংগ্রামের **উদ্দেশ্যও** তাহারা প্রকাশ করে।" *

অনিশ্চয়তা আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির বৈশিষ্ট্য; এবং এই চুক্তির মধ্যেই নিহিত থাকে ভীষণতম সংঘর্ষের আশঙ্কাজনক কারণ। বাজার বাঁটোয়ারায় প্রত্যেক পক্ষই ভাগ পায়, নিজের শক্তি ও ক্ষমতার অনুপাতে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসায় সঙ্ঘের ক্ষমতার পরিবর্ত্তন ঘটে। বৃহত্তর অংশের কামনায় নিয়তই প্রত্যেকে নীরব সংগ্রাম চালাইতে থাকে। আপেক্ষিক শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি অনিবার্য্য রূপেই বাজারের পুনর্বণ্টন ঘটায় এবং প্রত্যেক বাজার পুনর্বিভাগের ফলে শুরু হয় ভীষণতম সংগ্রাম। অতএব আন্তর্জ্জাতিক একচেটিয়া ব্যবসায় সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধকে কেবল যে দুর্ব্বল করে না তাহাই নহে, বরঞ্চ এই বিরোধকে চরম তীব্রতা লাভের উপযোগী করে।

একচেটিয়া ব্যবসা এবং আর্থিক পুঁজির যুগে পুঁজিবাদীদেশ কর্ত্তৃক উপনিবেশগুলি দখল অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হইয়াছে।

পুরাকাল হইতে ইওরোপীয়রাই তাহাদের পণ্য আমদানী করিয়াছে উপনিবেশ ও অনুন্নত দেশে। সকল রকম বাজে জিনিসের জন্য তাহাদের কাছে তিনগুণ দাম আদায় করিয়াছে এবং বেশীর ভাগ মূল্যবান জিনিস উপনিবেশ হইতে লইয়া গিয়াছে তাহারা

* লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্ব্বোচ্চ স্তর' পৃঃ ৭১-২

নিজেরাই। শক্তিশালী দেশ সমূহ ক্রমে ক্রমে দখল করিয়াছে জনবহুল বিস্তীর্ণ ভূভাগ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বড়াই করে, 'বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না।' প্রকৃত পক্ষেই কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্থান পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে, কাজেই যে কোন মুহূর্ত্তে সূর্য্য ইহার কোনা না কোনো স্থানে আকাশে দেখা যায়ই। পৃথিবীর ১৭৫ কোটি অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৬০ কোটি বাস করে, উৎপীড়িত উপনিবেশ-গুলিতে আর ৪০ কোটি বাস করে অর্দ্ধ উপনিবেশগুলিতে (চীন, পারস্য প্রভৃতিতে)। কাজেই মানব জাতির অর্দ্ধেকেরও বেশী (প্রায় ১০০ কোটি লোক) রহিয়াছে বড় বড় দস্যু জাতির অধীনে।

উপনিবেশ দখল ও পৃথিবী বিভাগ

বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক দশকে দুনিয়ার বাঁটোয়ারা বিশেষ দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৭৬ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'প্রধান শক্তিগুলি' প্রায় এককোটি ৫৬ লক্ষ বর্গ মাইল অঞ্চল দখল করিয়া লইয়াছিল। এই ভাবে তাহারা খাস ইওরোপের আয়তনের দ্বিগুণ পরিমাণ ভূ-ভাগ গ্রাস করিয়াছিল। ইহার অধিকাংশ পড়িয়াছিল বনেদী দস্যু বৃটেন আর ফ্রান্সের ভাগে। জার্মানি ইতালীর মত তরুণ দস্যুরা কেবল উচ্ছিষ্টমাত্র লাভ করিয়াছিল। যে-কোনো উপায়ে শোষণ করিবার উপযোগী দেশগুলি ইতিপূর্ব্বেই অন্যের দখলীভূত হইয়াছে। যাহারা বিলম্বে এই কাজে নামিয়াছে তাহারা থালা হইতে ছিটকাইয়া পড়া উচ্ছিষ্টকণাতেই ভোজন শেষ করিতে বাধ্য হয়, অথবা অন্যের গ্রাস হইতে বড় খাবল মারিয়া লইতে চেষ্টা করে।

বিক্রয়ের বাজার, কাঁচা মালের বাজার ও পুঁজিদাদনের বাজারের জন্য ভীষণ সংগ্রামের ফলে সারা দুনিয়া কয়েকটি শয়তান ডাকাতের হাতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আজ আর 'স্বাধীন ভূখণ্ড' নাই। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নূতন ভাগ লাভ করিতে পারে কেবল মাত্র একটি উপায়েই: প্রতিদ্বন্দ্বীর কবল হইতে লুণ্ঠিত অঞ্চলের কিয়দংশ কাড়িয়া লইয়া। পৃথিবীর বাঁটোয়ারা **সম্পূর্ণ** হইয়াছে। দুনিয়ার **পুনর্বণ্টনের** জন্য সাম্রাজ্য-বাদীদের মধ্যে লড়াই এখন অবশ্যম্ভাবী। আর এই রকম রেষারেষির ফলেই ঘটে সশস্ত্র সংঘর্ষ বা **যুদ্ধ**।

বিদেশী বাজার দখলের জন্য একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত ব্যাপক ভাবে অবলম্বন করে 'ক্ষতি দিয়া মাল চালাইবার রীতি' বা ডাম্পিং (Dumping)। স্বদেশের অন্তর্বাণিজ্যের বাজার অপেক্ষা অনেক কম দামে, অনেক সময়ে আবার উৎপাদন ব্যয়ের যে পড়তা তারও কমে বিদেশের বাজারে পণ্য বিক্রয় করাকে বলে 'ক্ষতি দিয়া মাল চালাইবার রীতি' বা ডাম্পিং।

ক্ষতি দিয়া মাল চালানো

একাধিক কারণে ব্যবসায় সঙ্ঘের পক্ষে বিদেশের বাজারে ডাম্পিং দামে পণ্য বিক্রয় করা প্রয়োজন হয়। প্রথমত ডাম্পিং-এর ফলে বিদেশী বাজার দখলে আসে। তারপর বিদেশে পণ্য বিক্রয়ের ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ সরবরাহ হ্রাস করা সম্ভব হয়; দাম চড়ানো এবং চড়া একচেটিয়া দাম বজায় রাখার জন্যই তাহার প্রয়োজন। বিদেশে ডাম্পিং-এর ফলে উৎপাদন কিছুমাত্র হ্রাস না করিয়াই দেশে বিক্রয় হ্রাস করা সম্ভব হয়। উৎপাদন হ্রাস করিতে হইলে উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া যাইত।

সাম্রাজ্যবাদী আওতায় ডাম্পিং হইল একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। জার্মানিতে ইস্পাত ব্যবসায় সঙ্ঘ তাহার দামের তালিকা প্রকাশ করে প্রতি মাসেই। প্রত্যেকটি পণ্যের দুই রকমের দাম দেওয়া হয়—একটি স্বদেশী বা আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য, এবং অপরটি রফতানির জন্য; রফতানির দাম প্রায় এক তৃতীয়াংশ কম।

বর্ত্তমানে জাপসাম্রাজ্যবাদ অব্যাহত ভাবে ডাম্পিং চালাইতেছে। শ্রমিকদের উপর নির্ম্মম শোষণের সুযোগ লইয়া জাপানী পুঁজিপতিরা দুনিয়ার বাজার পণ্যে ছাইয়া ফেলিতেছে এবং নাম মাত্র দামে পণ্য বিক্রয় করিতেছে। তাহারা যে কেবল চীনের বাজার হইতে ইওরোপীয় ও আমেরিকান পণ্য সরাইয়া দিতেছে তাঁহাই নহে, পরন্তু শিল্প প্রধান দেশগুলিকেও তাহাদের পণ্য প্লাবনে ডুবাইয়া দিতেছে। তাই তাহারা মোটর গাড়ী চালান দেয় আমেরিকায়, অসম্ভব কম দামে সাইকেল বিক্রয় করে জার্মানিতে, রেশমী জামা রফ্‌তানি করে ফরাসী রেশম শিল্পের কেন্দ্র লিয়োঁতে।

জার আমলের অতীত রুশীয়ায় চিনি বাণিজ্য সঙ্ঘ আসল ডাম্পিং অবলম্বন করিত। তখন একটিও পুঁজিবাদী দেশ এই ডাম্পিং-এর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করে নাই, অথচ তাহার পর হইতে পুঁজিপতিরা এবং তাহাদের সংবাদপত্রগুলি ঘন ঘন 'সোভিয়েটে ডাম্পিং-এর' ধুয়া তুলিয়াছে। এই চীৎকার ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নকে কোণ-ঠাসা করার প্রচেষ্টার একটি অংশ, আর তাহার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় প্রথম সমাজতন্ত্রের সংগঠক দেশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের ভিত্তি গড়িয়া তোলা। 'সোভিয়েট ডাম্পিং' পুঁজিবাদী দেশে সঙ্কট নিদারুণ করিয়া তুলিতেছে—এই আর্ত্তনাদ বিশেষ হাস্যকর। ডাম্পিং দামে সোভিয়েট ইউনিয়ন পণ্য বিক্রয় করে না, বিদেশী বাজার দখলের উদ্দেশ্যে পণ্য রফ্‌তানি করে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন পণ্য রফ্‌তানি করে, প্রয়োজনীয় মালের দাম পরিশোধের জন্য। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুবিধার দরুন সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে বহু পণ্য পুঁজিবাদীদের অপেক্ষা সস্তায় উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। অক্টোবর বিপ্লব পরস্বোপজীবী জমিদার আর পুঁজিপতিকে ধ্বংস করিয়াছে এবং সেই

সঙ্গে বিলুপ্ত করিয়াছে তাহাদের (পরস্বোপজীবীদের) পোষণের ব্যয়ভার— জমির খাজনা আর পুঁজিবাদী মুনাফা। তাই ইহা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, সোভিয়েটের ডাম্পিং সম্পর্কে সমস্ত কাহিনী সোভিয়েটের শত্রুদের আবিষ্কার মাত্র এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ; কারণ সোভিয়েট অর্থনীতি পুঁজিবাদী পথ পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং পুঁজিবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট সংগ্রাম পদ্ধতি ও রেষারেষি হইতেও নিজেকে করিয়াছে মুক্তি।

সাম্রাজ্যবাদের আওতায় অসম উন্নতির নিয়ম

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শিল্পের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এবং বিভিন্ন দেশ বিকাশ লাভ করে **অসম ও আকস্মিক ভাবে**। পুঁজিবাদী আওতায় উৎপাদনের বিশৃঙ্খলা ও মুনাফার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিদের উন্মত্ত সংগ্রাম চলিতে থাকিলে ইহা ছাড়া যে আর কিছুই সম্ভবপর নয় তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

বিকাশের এই অসমতা **সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিশেষ তীব্রতার সহিত প্রকাশ পায় এবং পরিণত হয় একটি চূড়ান্ত শক্তিতে, এক চূড়ান্ত বিধানে।**

> "দুনিয়ার আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের বিকাশের পার্থক্য হ্রাস না করিয়া বরঞ্চ তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া তোলে আর্থিক পুঁজি এবং ব্যবসার সঙ্ঘ।" *

সাম্রাজ্যবাদ হইল একচেটিয়া পুঁজিবাদ। একচেটিয়া ব্যবসায়ের আধিপত্য বিভিন্ন দেশের বিকাশে অসমতা এবং আকস্মিকতাই বৃদ্ধি করে। একদিকে একচেটিয়া সমিতিগুলি নূতন দেশগুলিকে প্রাচীন পুঁজিবাদী দেশ সমূহের সমকক্ষ হইতে এবং তাহাদের অপেক্ষাও উন্নত হইবার

* লেনিন—'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্ব্বোচ্চ স্তর,' পৃঃ ৮৮

সুযোগ দেয়, আর অন্যদিকে একচেটিয়া ব্যবসায়ের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে পরস্বোপজীবী বৃত্তি (Parasitism), ধ্বংস এবং যান্ত্রিক উন্নতির অন্তরায়ের ঝোঁক : বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একচেটিয়া ব্যবসায় কোনো কোনো দেশের বিকাশে বিলম্ব ঘটায় এবং এইরূপে অন্যান্য দেশের পক্ষে অগ্রসর হইবার সুযোগ সৃষ্টি করে।

"...পুঁজিবাদের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায় সঙ্ঘ, শিল্পের শাখা বা বিভিন্ন দেশের বিকাশ **সমান** হইতে পারে না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে তদানীন্তন ইংলণ্ডের তুলনায় পুঁজিবাদী শক্তি হিসাবে জার্মানি ছিল অতি নগণ্য দেশ। রুশীয়ার তুলনায় জাপানও ছিল এমনি নগণ্য। ইহা কি কল্পনা করা যায় যে, দশ বা বিশ বৎসর সময়ের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আপেক্ষিক শক্তি **অপরিবর্ত্তিত** থাকিবে ? ইহা একেবারেই কল্পনার অতীত।"*

পুঁজি-রফ্‌তানি অন্যান্য আরও অনেক দেশের উন্নতির গতি রোধ করিয়া কোনো কোনো দেশের বিকাশ অতিশয় দ্রুত করিয়া তোলে। আধুনিক যন্ত্রপাতি, উৎপাদন শক্তির বিকাশের আধুনিক অবস্থা নূতন দেশ সমূহের সমনে সুযোগের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় : তাহাদের প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বীদের অতিক্রম করার সুযোগ পায়। যন্ত্রোন্নতির যে ধারাবাহিক স্তরগুলি অতিক্রম করিতে প্রাচীন দেশগুলির বহু বৎসর লাগিয়াছিল অল্প সময়ে সেই স্তরগুলি লাফ দিয়া পার হইয়া যাওয়ার সুযোগ ইহারা পায়।

সাম্রাজ্যবাদের আওতায় দুনিয়ার ভাগ বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ হইয়াছে। পুনর্বণ্টনের জন্য সংগ্রাম শুরু হইয়াছে। এই সংগ্রাম প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে উন্মত্ত গতিতে শক্তি সঞ্চয়ে বাধ্য করে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে প্রত্যেক দেশই।

* ঐ পৃঃ ১০৮

বিভিন্ন দেশের অসম ও আকস্মিক বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় আরও স্পষ্টতর হইয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরোধকে তীব্র করিয়া তোলে। অসম বিকাশের মূল সূত্রই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের দৃঢ় ও স্থায়ী আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীকে অসম্ভব করিয়া তোলে। বিভিন্ন দেশের **আপেক্ষিক শক্তিতে** ক্রমাগত **পরিবর্ত্তন** ঘটিতেছে; আপেক্ষিক শক্তির পরিবর্ত্তনই অনিবার্য্য রূপে সৃষ্টি করে সর্ব্বপ্রকারের **সংঘর্ষ**।

সাম্রাজ্যবাদের আওতায় অসম বিকাশের লেনিনপন্থী বিধান সুষ্ঠু ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে স্টালিনের কতিপয় গ্রন্থে। অসম বিকাশের লেনিনপন্থী বিধানকে অস্বীকার করে ট্রটস্কিবাদ ; এই ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লেনিনের শিক্ষাকে আরও বিকশিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছেন স্টালিন। স্টালিন এই সমস্যাটিকে এইরূপে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন :

"সাম্রাজ্যবাদের যুগে অসম বিকাশের বিধানের অর্থ হইল অপরপর দেশের তুলনায় কোনো কোনো দেশের আকস্মিক উন্নতি, পৃথিবীর বাজার হইতে অপরাপর দেশ কর্ত্তৃক কোনো কোনো দেশকে দ্রুত বিতাড়ন, সামরিক সংঘর্ষ ও সামরিক বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া **পূর্ব্ববিভক্ত** পৃথিবীর পুনরাবর্ত্তনশীল পুনর্বিভাগ, সাম্রাজ্যবাদের স্বীয় শিবিরে বিরোধের গভীরতা ও তীব্রতা সাধন, বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের সম্মুখ ভাগের দুর্ব্বলতা বিধান, বিভিন্ন দেশের সর্ব্বহারা কর্ত্তৃক ওই সম্মুখ ভাগ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলার সম্ভাবনা, বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় লাভের সম্ভাবনা।

"সাম্রাজ্যবাদের আওতায় অসম বিকাশের বিধানের মৌলিক উপাদান কি কি ?

"প্রথমত, পৃথিবী ইতিপূর্ব্বেই সাম্রাজ্যবাদী মণ্ডলিগুলির মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে, দুনিয়ায় আর 'স্বাধীন' অনধিকৃত অঞ্চল নাই;

নূতন বাজার ও কাঁচা মালের উৎস দখল করার জন্য, আত্ম-প্রসারের জন্য এই রকম অঞ্চল অপরের হাত হইতে বল পূর্ব্বক কাড়িয়া নেওয়া প্রয়োজন।

"দ্বিতীয়ত, যন্ত্রের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি এবং পুঁজিবাদী দেশ সমূহে বিকাশের ক্রমবর্দ্ধমান সাদৃশ্য কোনো কোনো দেশকে আকস্মিক ভাবে অপরাপর দেশকে পরাভূত করিতে সাহায্য ও সক্ষম করে, দ্রুত উন্নতিশীল অল্পশক্তিশালী দেশ অধিক শক্তিশালী দেশকে হটাইয়া দিতে সক্ষম হয়।

"তৃতীয়ত, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী মণ্ডলীর মধ্যে পূর্ব্বে ভাগ বাঁটোয়ারা করা এলাকা সমূহের পুরাতন বিভাগ পৃথিবী ব্যাপী বাজারে নূতন শক্তি-সম্পর্কের সহিত প্রতিনিয়তই সংঘর্ষে আসে। প্রভাবাধীন এলাকার প্রাচীন বাঁটোয়ারা এবং নূতন শক্তি-সম্পর্কের মধ্যে 'ভারসাম্য' প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদী মহাসমরের সহায়তায় পৃথিবীর পুনরাবর্ত্তনশীল পুনর্বণ্টন প্রয়োজন হয়।"*

সাম্রাজ্যবাদের আওতায় রাজ্যগ্রাসের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এই যুদ্ধের ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার শক্তি-সম্পর্কে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধে জার্মানির পতন হয়, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীকে টুকরা টুকরা করা হয় এবং জার্মানির ধ্বংসস্তূপের উপর কতকগুলি নতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন দেশের বিকাশের অসমতা যুদ্ধোত্তর কালে খুবই স্পষ্ট ও নিঃসংশয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। যুদ্ধের ফলে সর্ব্বাধিক লাভবান হইয়াছিল আমেরিকা। অন্যান্য রাষ্ট্রের সংগ্রামের ফলে লাভ হইয়াছিল তাহারই সব চেয়ে বেশী। পূর্ব্বে অন্যান্য দেশের,

* স্টালিন—'সোশাল ডেমোক্রাটিক বিচ্যুতি সম্বন্ধে আর এক দফা।'

বিশেষত, ইংলণ্ডের নিকট সে ছিল ঋণী। এখন কিন্তু ইংলণ্ড সমেত প্রায় সারা দুনিয়াই হইল আমেরিকার নিকট ঋণী। যুদ্ধের পরে আমেরিকার শিল্পের কয়েকটি শাখার উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন সমগ্র পৃথিবীর ১০০ ভাগের প্রায় ৬ ভাগ; কিন্তু তাহার অধিবাসীর সংখ্যা পৃথিবীর জন-সংখ্যার শতকরা সাত ভাগেরও কম। অথচ, বর্ত্তমান (১৯২৯-৩৫) সঙ্কট পর্য্যন্ত পৃথিবীর কয়লা খনিগুলির শতকরা ৪০ ভাগ, জল-চালিত বৈদ্যুতিক শক্তির ৩৫ ভাগ, তৈলের ৭০ ভাগ, পৃথিবীর গম ও তুলার ৬০ ভাগ, কাঠের ৫০ ভাগ, লোহা ও তামার প্রায় ৫০ ভাগ, সীসা ও ফসফেটের ৪০ ভাগ উৎপন্ন হইত আমেরিকায়। সঙ্কটের সময় অবধি পৃথিবীর উৎপন্ন লোহার শতকরা ৪২ ভাগ, তামার ৪৭ ভাগ, তৈলের ৬৯ ভাগ, রবারের ৫৬ ভাগ, রাংএর ৫৩ ভাগ, কফির ৪৮ ভাগ, চিনির ২১ ভাগ, রেশমের ৭২ ভাগ, এবং মোটর গাড়ীর ৮০ ভাগ ব্যবহার করিত যুক্তরাষ্ট্র।

পক্ষান্তরে যুদ্ধের পূর্ব্বে যে ইংলণ্ড দুনিয়ার আর্থিক ব্যবস্থায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল সেই ইংলণ্ডের দ্রুত গতিতে অবনতি ঘটে। যুদ্ধের পরে ইংলণ্ড পরিণত হয় এক সুদখোর দেশে। তাহার শিল্পের কয়েকটি প্রধানতম শাখা, বিশেষত কয়লা শিল্প, একই স্তরে থাকিয়া যায়। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলি অগ্রসর হইয়া চলে।

বর্ত্তমান সঙ্কট বিভিন্ন পুঁজিবাদী দস্যুজাতির মধ্যেকার শক্তি-সম্পর্কে বিপুল পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন মাত্রায় আঘাত হানিয়াছে, এবং এই ভাবে বিকাশের অসমতাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। এই সঙ্কট নিদারুণ আঘাত করিয়াছে যুক্ত-রাষ্ট্রকেই। সেই জন্যই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে যুক্তরাষ্ট্র সমাসীন ছিল আজ আর সে

সেখানে নাই। তারপর, আমেরিকাই ছিল ইওরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং সোশাল ডেমোক্রাট নেতাদের একমাত্র 'মতবাদের গুরু' (Ideological ruler)। এই সঙ্কট এখন আমেরিকার পুঁজিবাদের সমস্ত বিরোধই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। আমেরিকার বহু প্রশংসিত 'সমৃদ্ধির' কোনো চিহ্নই এখন নাই। তবু যুক্তরাষ্ট্রই এখনও বৃহত্তম ও প্রবলতম পুঁজিবাদী দেশ। যে-সব বিরোধের সংঘাতে পুঁজিবাদী জগত ছিন্নভিন্ন হইতেছে, আমেরিকা দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে সেই সব বিরোধই শক্তিশালী হইতেছে।

অসম উন্নতির নিয়ম ও সর্ব্বহারা বিপ্লব

অসম বিকাশের মূল সূত্র সাম্রাজ্যবাদী যুগে তীব্রতা লাভ করে; ফলে বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্থায়ী শান্তিপূর্ণ চুক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে সমস্ত কাল্পনিক তত্ত্ব চুরমার হইয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি ও সামরিক সংঘাতের অনিবার্য্যতার ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা পরস্পরকে দুর্ব্বল করিয়া তোলে এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সর্ব্বহারা বিপ্লবের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী ব্যূহ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ইহার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী ব্যূহের যে-স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, অবস্থা যেখানে সর্ব্বহারার বিজয়লাভের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী **ব্যূহের সেই স্থানটিতেই ভাঙন** দেখা দেয়। পুঁজিবাদের অসম বিকাশের মূলসূত্র সাম্রাজ্যবাদের যুগে তীব্রতার চরমে উঠে; সর্ব্বহারা বিপ্লব ও একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের সাফল্য সম্পর্কে লেনিনবাদী শিক্ষার সহিত এই মূলসূত্র অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। লেনিনবাদী এই শিক্ষাকেই ট্রট্স্কিবাদ কঠোরভাবে আক্রমণ করে। এ সম্বন্ধে লেনিন লিখিয়াছেন ঃ

"অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ পুঁজিবাদের এক নির্ব্বিশেষ বিধান (absolute law); সুতরাং সমাজতন্ত্রের সাফল্য প্রথমে কয়েকটি মাত্র দেশে, এমন কি একটি মাত্র দেশেও সম্ভব। সেই দেশের বিজয়ী সর্ব্বহারা পুঁজিপতিদের সম্পত্তিচ্যুত করিয়া এবং নিজেদের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠন করিয়া অবশিষ্ট পুঁজিবাদী দুনিয়ার সম্মুখীন হইবে, অন্যান্য দেশের নিপীড়িত শ্রেণী-সমূহকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করিবে, তাহাদের মধ্যে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিবে, এবং প্রয়োজন হইলে শোষক-শ্রেণী ও তাহাদের রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শক্তি লইয়া পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিবে।" *

বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে অসম বিকাশের লেনিনবাদী বিধান তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্টালিন দেখাইয়াছেন, এমন কি মহাযুদ্ধ চলিতে থাকার সময়েই লেনিন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অসম বিকাশের মূল সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া সুবিধাবাদীদের তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাহার সর্ব্বহারা বিপ্লবের তত্ত্ব একটি মাত্র দেশে, 'এমন কি, পুঁজিবাদী বিকাশের পথে এই দেশ কম অগ্রসর হইলেও' সমাজতন্ত্রের সাফল্য সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু সকল দেশের সুবিধাবাদীরাই বিপ্লবে তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা গোপন করিবার জন্য জোর গলায় প্রচার করে যে সর্ব্বহারা বিপ্লব সারা দুনিয়ার একই সঙ্গে অবশ্যই শুরু হইবে। বিপ্লবের বিশ্বাস-ঘাতকরা এমনি করিয়াই নিজেদের পক্ষে এক প্রকার পারস্পরিক দায়িত্ব গড়িয়া তোলে। সোশাল ডেমোক্রাট তাত্ত্বিকরা এবং মুখ্যত

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ১৮শ খণ্ড, 'ইওরোপের যুক্তরাষ্ট্রের শ্লোগান', পৃঃ ২৭২।

প্রতিবিপ্লবী ট্রট্‌স্কিবাদী অসম বিকাশের মূল সূত্রের তত্ত্বের উপর ভীষণ আক্রমণ চালায়। ট্রট্‌স্কিবাদ হইল প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী। ট্রট্‌স্কি এবং তাহার অনুচরেরা দাবী করে যে, সাম্রাজ্যবাদের আওতায় বিভিন্ন দেশের বিকাশের অসমতা বৃদ্ধি না পাইয়া বরঞ্চ হ্রাস পায়। যে-সব চূড়ান্ত বিরোধ সাম্রাজ্যবাদী যুগে অসমতা বৃদ্ধির মূল, ট্রট্‌স্কিবাদ তাহাদের লক্ষ্য করে না। অসম বিকাশের লেনিনবাদী বিধানের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া ট্রট্‌স্কিবাদ এই সোশাল ডেমোক্রাট সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, 'একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গঠন অসম্ভব'। ট্রট্‌স্কিবাদীরা সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের সাফল্যের সম্ভাবনা অস্বীকার করে। তাহাদের এই অস্বীকৃতির সহিত ট্রট্‌স্কি কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'চিরস্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্বে'র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে; এই অস্বীকৃতি হইতেই বুঝা যায় যে, সর্ব্বহারা ও মধ্যবিত্ত কৃষক সাধারণের মধ্যে দৃঢ় মৈত্রীর সম্ভাবনায় তাহাদের বিশ্বাস নাই এবং সমাজতন্ত্র গঠনে সর্ব্বহারার সৃষ্টিক্ষমতা ও শক্তিসামর্থ্যেও তাহাদের বিশ্বাস নাই।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র সংগঠনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; সোভিয়েট ইউনিয়নের লেনিনবাদী এই কার্য্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে ট্রট্‌স্কিবাদ চালাইতেছে ভীষণ সংগ্রাম। ট্রট্‌স্কিবাদের প্রতিবিপ্লবী প্রকৃতি সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার কাজে স্টালিন এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। বহু বৎসর ধরিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি যখন ট্রট্‌স্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছিল, তখন স্টালিন, ট্রট্‌স্কিবাদী ভূমিকার প্রতিবিপ্লবী মেনশেভিক চরিত্র যতই "বামপন্থী" বাক্যজালে প্রচ্ছন্ন থাকুক না কেন, তাহা অত্যন্ত চমৎকারভাবে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইতেছিলেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ঐতিহাসিক সাফল্য ট্রট্‌স্কিপন্থী ভূমিকার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া স্টালিন বলিতেছেন :

"স্বতন্ত্রভাবে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গঠন অসম্ভব—এই সোশাল-ডেমোক্রাট মতবাদকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, একটিমাত্র দেশেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন সম্পূর্ণ সম্ভব ; কারণ এই ধরনের সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি সোভিয়েট ইউনিয়নে ইতিপূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" *

চরম সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে সোশাল ডেমোক্রাটরা চরম সাম্রাজ্যবাদের (Ultra Imperialism) ভূয়া তত্ত্ব উপস্থাপিত করিয়াছে। কাউট্‌স্কি এই মতবাদের প্রবর্ত্তক। মার্কস্‌বাদের বিকৃতি সাধনে ও অপব্যাখ্যায় কাউট্‌স্কির অভিজ্ঞতা অপরিসীম। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যাহারা নির্লজ্জ কুৎসা রটনা করিতেছে এবং তাহার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার জন্য আন্দোলন চালাইতেছে—কাউট্‌স্কি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

কাউট্‌স্কির মতবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করিয়াছেন লেনিন। কাউট্‌স্কির মতবাদের সারমর্ম্ম এই : কাউট্‌স্কি অস্বীকার করে যে সাম্রাজ্যবাদ হইল পুঁজিবাদের বিকাশের এক স্বতন্ত্র স্তর, পর্য্যায় বা নূতন সোপান ; গভীর অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য এই পর্য্যায়ের মুখ্য লক্ষণ। কাউট্‌স্কির মতে সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, পরন্তু কোনো

*স্টালিন :—"লেনিনবাদ—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল" পৃঃ ৪৩৯-৪০

কোনো দেশের পুঁজিপতিদের এক বিশেষ কর্ম্মনীতি মাত্র। কাউট্স্কির যে-প্রধান সংজ্ঞার বিরুদ্ধে লেনিন দৃঢ় ভাবে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহা হইতেছে এই ঃ

"সাম্রাজ্যবাদ হইল অত্যন্ত উন্নত শিল্পাত্মক পুঁজিবাদের ফল। ইহা হইল প্রত্যেক শিল্পাত্মক পুঁজিবাদী জাতির পক্ষে জাতিনির্ব্বিশেষে অধ্যুষিত বড় বড় **কৃষিপ্রধান অঞ্চল** ক্রমশ বর্দ্ধিত পরিমাণে নিজেদের আয়ত্তে আনার এবং স্বাধিকারভুক্ত করার প্রয়াস।" *

লেনিন বলেন—"তত্ত্বের দিক হইতে এই সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ভুল।" এই সংজ্ঞার ভুল কোথায়? লেনিন কাউট্স্কির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন এইরূপে ঃ

"সাম্রাজ্যবাদের বিশিষ্ট লক্ষণ শিল্প-পুঁজির প্রাধান্য **নহে**। বরঞ্চ ফিনান্স পুঁজির প্রাধান্য, বিশেষ করিয়া, কৃষিপ্রধান দেশ দখলের প্রয়াস নহে, পরন্তু **সকল রকমের** দেশ দখলের প্রয়াস। কাউট্স্কি সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি হইতে **পৃথক করে**। 'নিরস্ত্রীকরণ', 'চরম-সাম্রাজ্যবাদ' ও অনুরূপ অসংবদ্ধ প্রলাপের মত হীন বুর্জোয়া সংস্কারবাদের পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে কাউট্স্কি রাজনীতিক ক্ষেত্রের একচেটিয়া আধিপত্যকে অর্থনীতিক ক্ষেত্রের একচেটিয়া আধিপত্য হইতে পৃথক করে। এই তাত্ত্বিক কপটতার তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য হইল সাম্রাজ্যবাদের গভীর বিরোধকে গোপন করা এবং এইরূপে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকদের প্রকৃত জঙ্গী জাতীয়তাবাদী ও সুবিধাবাদীদের সহিত 'ঐক্যের' তত্ত্বের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা।"†

* 'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্ব্বোচ্চ স্তর' গ্রন্থে লেনিন কর্তৃক উদ্ধৃত। পৃঃ ৮২

† লেনিনের গ্রন্থাবলী, ১৯শ খণ্ড, 'সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বিচ্ছেদ,' পৃঃ ৩০৩, রুশ সংস্করণ

লেনিন খুব জোরের সহিতই বলিয়াছেন যে, কাউট্‌স্কির সংজ্ঞা ভুল এবং মার্ক্‌স্‌বাদ-সম্মত নয় (non-marxian)। যে-সব মত তত্ত্বে এবং কাজে উভয় দিকেই মার্কস্‌বাদ হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্যুত হইয়াছে, সেই সব মতের ভিত্তি হইতেছে এই সংজ্ঞা। রাজনীতিকে অর্থনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সাম্রাজ্যবাদকে কেবলমাত্র কতিপয় পুঁজিবাদী দেশের বাঞ্ছিত কর্ম্মনীতি হিসাবে বর্ণনা করিয়া কাউট্‌স্কি সেই সমস্ত বুর্জোয়া সংস্কারবাদীদের স্থান গ্রহণ করে যাঁহারা মনে করে যে, সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অলঙ্ঘনীয়তা ব্যাহত না করিয়া অধিকতর শান্তিপূর্ণ কর্ম্মনীতি প্রবর্ত্তন করা সম্ভব। লেনিন স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন, ইহার ফলে কাউট্‌স্কির পক্ষে দাঁড়ায়—

"পুঁজিবাদের আধুনিকতম পর্য্যায়ের সুগভীর বিরোধকে প্রকাশ না করিয়া উপেক্ষা ও গোপন করা। পরিণতি হইতেছে মার্ক্‌স্‌বাদের পরিবর্ত্তে বুর্জোয়া সংস্কারবাদ।" *

কাউট্‌স্কির সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা মূলত মার্ক্‌স্‌বাদ-বিরোধী; চরম সাম্রাজ্যবাদ (বা অতি-সাম্রাজ্যবাদ) সম্পর্কে তাহার যুক্তি এতই মার্ক্‌স্‌বাদবিরোধী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাউট্‌স্কির এই যুক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহার মতবাদ ও কর্ম্মনীতি প্রতিবিপ্লবী পাকা বুর্জোয়া সংস্কারবাদকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

চরম সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে একচেটিয়া সমিতি বৃদ্ধি পাইবার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরোধ ও সংগ্রাম লোপ পায়, এই সব দেশের পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অতীতের ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়,

* লেনিন : 'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্ব্বোচ্চ স্তর,' পৃঃ ৮৪।

বিশ্বব্যাপী এক সম্মিলিত আর্থিক ব্যবস্থার হয় পত্তন। 'শান্তিপূর্ণ' চরম-সাম্রাজ্যবাদের এই মতবাদ বিপ্লবী মার্ক্‌স্‌বাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী; সাম্রাজ্য-বাদের বাস্তব সত্যের ছবি আগাগোড়া বিকৃত করিয়া দেখায়। কাউট্‌স্কির এই আবিষ্কারকে যুক্তির দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া লেনিন লিখিয়াছেন:

> "অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার অসীম বৈচিত্র্য, বিভিন্ন দেশের বিকাশ ধারায় নিরতিশয় বৈষম্য, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের সশস্ত্র সংগ্রাম—এই বাস্তব ব্যাপারগুলির সহিত কাউট্‌স্কির 'শান্তিপূর্ণ' চরম-সাম্রাজ্যবাদের অর্থহীন তুচ্ছ উপকথার তুলনা করুন। ইহা কি ভীতিগ্রস্ত সঙ্কীর্ণমনা রক্ষণশীলদের কঠোর সত্য হইতে দূরে পালাইবার প্রতিবিপ্লবী প্রয়াস নহে? পৃথিবীর বাঁটোয়ারা ও **পুনর্বিভাগ,** শান্তিপূর্ণ বাঁটোয়ারা হইতে **বলপ্রয়োগের সাহায্যে** ভাগ-বাঁটোয়ারায় পরিণতি (এবং ইহার উল্টা) আন্তর্জাতিক মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘের (কাউট্‌স্কি যাহাকে মনে করে চরম-সাম্রাজ্যবাদের অঙ্কুর) ইহাই কি উদাহরণ নয়? আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের ফিনান্স পুঁজি, আন্তর্জাতিক রেল বাণিজ্য সঙ্ঘে বা আন্তর্জাতিক সওদাগরী জাহাজ ব্যবসায় সঙ্ঘে জার্মানির সহিত মিলিত হইয়া একযোগে সারা দুনিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়াছিল; সেই ফিনান্স পুঁজি কি এখন এক নূতন শক্তিসম্পর্কের ভিত্তিতে (যে উপায়ে এই শক্তিসম্পর্কের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা **কোনোক্রমেই** শান্তিপূর্ণ নহে) পৃথিবীর পুনর্বিভাগে ব্যাপৃত হয় নাই?" *

বিভিন্ন দেশের অসম বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠে এবং চরম-সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ রূপে খণ্ডন করে। এ বিষয়ে লেনিন লিখিয়াছেন:

* ঐ, পৃ: ৮৭-৮৮

"চরম সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কাউট্স্কির অর্থহীন প্রলাপ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকদের সুবিধা করিয়া দেওয়া এই অত্যন্ত ভুল ধারণাকেও উৎসাহিত করে যে, ফিনান্স পুঁজির আধিপত্য বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসমতা এবং বিরোধ **হ্রাস করে** ; প্রকৃত-পক্ষে কিন্তু **বাড়াইয়াই তোলে**।"*

বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক হওয়ায় কাউট্স্কি সাম্রাজ্যবাদের তীব্রতম **বিরোধ ও অসঙ্গতি চাপা দিতে** চেষ্টা করে। সাম্রাজ্যবাদ যে পুঁজিবাদের বিকাশের একটি বিশেষ স্তর ইহা সে অস্বীকার করে। এই নবতম স্তরের যে-মৌলিক-বিশেষত্ব-গুলির দরুণ সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ব্বক্ষণের রূপলাভ করিতেছে, তাহা গোপন করার জন্যই দরকার তাহার এই অস্বীকৃতি। চরম সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব তাহার পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তন সমূহের (variations) মতই অসম বিকাশের লেনিনপন্থী মূলসূত্রের বিরুদ্ধে নিয়োজিত; এই অসমতা সাম্রাজ্যবাদের আওতায় চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। চরম সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব পুঁজিবাদের বিকাশে ক্রমবর্দ্ধমান অসমতা অস্বীকার করে এবং যে সুস্পষ্ট ঘটনাবলী এই অসমতার স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় তাহার দিকে চোখ বুজিয়া থাকে। কাউট্স্কি পুঁজিবাদের বিকাশের নূতন যুগের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ হিসাবে একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রভুত্বের গুরুত্ব অস্বীকার করে। একচেটিয়া ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ধ্বংসমুখী লক্ষণগুলিও করে অস্বীকার। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি যে পরস্বোপজীবী, সে-কথা সে সযত্নে গোপন করিয়া রাখে। সাম্রাজ্যবাদ যে মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ, সে-কথাও সে অস্বীকার করে। বরং ইহার বিপরীত অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ কোনো

* ঐ পৃঃ ৮৬

রকমেই পুঁজিবাদের শেষ দশা নহে, সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদের সমস্ত সঙ্গতিই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই—এই মূল কথা হইতেই কাউট্‌স্কির চরম সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। এখানে কাউট্‌স্কি বুর্জোয়া শ্রেণীর সমস্ত বিজ্ঞ অনুচরের দলভুক্ত। এই বিজ্ঞেরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, পুঁজিবাদ এখনও বহু যুগ টিকিয়া থাকিবে এবং পুঁজিবাদ সবে মাত্র পরিণতি লাভ করিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কাউট্‌স্কি যে মনোভাবকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহা আন্তর্জাতিক সোশাল ডেমোক্রাটিক মতবাদের বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে রোজা লুক্‌সেম্‌বুর্গ নিখুঁত কাউট্‌স্কি ধরনের **ভুল** করিয়াছিলেন। লুক্‌সেম্‌বুর্গবাদের গুণ কীর্ত্তনের ছলে ট্রট্‌স্কিপন্থীরা নিজেদের ধারণা প্রচারের সময়ে এই ভুলগুলিই গ্রহণ করিয়াছিল। লুক্‌সেম্‌বুর্গ সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের এক স্বতন্ত্র স্তর বলিয়া মনে না করিয়া নূতন যুগের এক বিশেষ নীতি বলিয়া মনে করিতেন। **পুঁজির সঞ্চয়** নামক তাঁহার প্রধান গ্রন্থে লুক্‌সেম্‌বুর্গ পুঁজিবাদের ধ্বংসের অবশ্যম্ভাব্যতা প্রমাণ করিয়াছেন ; এই ধ্বংসের কারণ কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধসমূহের চরম তীব্রতা প্রাপ্তি নহে, পরন্তু ধ্বংস এই জন্য অনিবার্য্য হয় যে, 'বিশুদ্ধ' পুঁজিবাদের আওতায় উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় অসম্ভব হইবে ; এই 'বিশুদ্ধ' পুঁজিবাদ মানে এমন এক পুঁজিবাদী সমাজ যেখানে পুঁজিপতি ও শ্রমিক ব্যতীত ক্ষুদ্র উৎপাদক রূপে কোনো 'অপুঁজিবাদী জনসংখ্যা' নাই। এইরূপে আধা-মেনশেভিক মতবাদ ও নীতিকে আশ্রয় করিয়া থাকার ফলে লুক্‌সেম্‌বুর্গ সাম্রাজ্যবাদের লেনিন-পন্থী ধারণা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং সাম্রাজ্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা লাভ করিতে পারেন নাই। সোশাল ডেমোক্রাসিতে বিভেদের সমস্যা, কৃষি ও জাতীয় সমস্যা, আন্দোলনে পার্টি ও

স্বতস্ফূর্ত উপাদান সমূহের ভূমিকা প্রভৃতি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে লুক্সেমবুর্গ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন; এই ভুল পথের সহিত সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে ধারণায় তাঁহার ভ্রান্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। পুঁজিবাদ স্বতপ্রবৃত্তভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে—পুনরুৎপাদন সম্পর্কে লুক্সেমবুর্গের ভ্রান্ত মতবাদ হইতে এই মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে; এই মতবাদ কার্য্যত শ্রমিক শ্রেণীকে নিরস্ত্র করে, তাহাদের সংগ্রামেচ্ছাকে বিহ্বল করিয়া একটা **নিষ্ক্রিয়তার** মনোভাব ও অদৃষ্টবাদ তাহাদের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। ইহা অতি স্পষ্ট যে সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে লুক্সেমবুর্গের কাউট্স্কিপন্থী ভ্রান্তিই তাঁহাকে কাউট্স্কি ও কাউট্স্কিবাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে দেয় নাই। এমন কি কাউট্স্কির পরম বিশ্বাসঘাতকতা এবং দলত্যাগ করিয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবিপ্লবী শিবিরে তাহার আশ্রয় গ্রহণ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলিতে থাকার সময়ে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এমন কি সে সময়েও লুক্সেমবুর্গের উপরোক্ত ভ্রান্তিই কাউট্স্কিপন্থী কেন্দ্রের সহিত তাঁহার যোগসূত্রের কাজ করিয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ট্রট্স্কিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি **কাউটস্কিবাদের নানা রূপের মধ্যে একটি রূপ মাত্র**। যুদ্ধের সময় লেনিন পুনঃ পুনঃ এই সত্য প্রমাণিত করিয়াছেন যে—ট্রট্স্কি একজন কাউট্স্কিপন্থী, কাউট্স্কির মতাবলম্বী, কাউট্স্কি মার্কসবাদের যে বিকৃতি সাধন করিয়াছে ট্রট্স্কি সেই বিকৃতিকে সমর্থন করে ও গোপন করিয়া রাখে। কাউট্স্কিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করিতে যাইয়া ট্রট্স্কিবাদ অসম বিকাশের লেনিনপন্থী মূলসূত্রের বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে বিষ উদ্গীরণ করে। ইহা কিন্তু আদৌ আশ্চর্য্যজনক নয়। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, অসমবিকাশের মূলসূত্র "চরম সাম্রাজ্যবাদের" বিশ্বাসঘাতক, প্রতিবিপ্লবী কাউট্স্কিপন্থী মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। অসম

বিকাশের লেনিনপন্থী মূলসূত্রের অস্বীকৃতির উপরই ট্রটস্কিবাদ এই প্রতিবিপ্লবী মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছে যে, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গঠন অসম্ভব।

সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্ব

সোশাল ডেমোক্রাসির পাণ্ডারা এমন ভাবে ঘটনা সাজায় যেন একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিস্তার ও বৃদ্ধির ফলে পুঁজিবাদী বিশৃঙ্খলার স্থলে এক নূতন ব্যবস্থা—**সংগঠিত পুঁজিবাদী** ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রধানত যুদ্ধোত্তর আংশিক স্থিতিশীলতার সময়ে সোশাল ডেমোক্রাটরা সংগঠিত পুঁজিবাদ সম্পর্কে রূপকথা রটাইতে থাকে। এই তত্ত্বের সর্ব্বপ্রধান প্রচারক হইল সোশাল-ডেমোক্রাসির একান্ত নির্লজ্জ পাণ্ডাদের অন্যতম হিলফারডিং। সোশাল-ডেমোক্রাটরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাজারের অন্ধ শক্তির অবসান ঘটিয়াছে। অনুমান করা হয় যে, পুঁজিবাদ **নিজেকে সংগঠিত করে,** প্রতিযোগিতা লোপ পায়, উৎপাদনের **বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটে, সঙ্কট** হইয়া পড়ে অতীতের বস্তু, **পরিকল্পিত সচেতন সংগঠন** প্রচলিত হয়। ইহা হইতে সোশাল-ডেমোক্রাটরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ব্যবসায় সঙ্ঘ ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘগুলি শান্তিপূর্ণভাবে **পরিকল্পিত** সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় **রূপান্তরিত হয়।** অতএব, ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় সঙ্ঘগুলিকে তাহাদের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করিলেই পুঁজিতন্ত্র দৃষ্টির অন্তরালে কোনো সংগ্রাম বা বিপ্লব ব্যতীতই আপনা-আপনি সমাজতন্ত্রে 'রূপান্তরিত' হইয়া উঠিবে।

ইহা খুবই স্পষ্ট যে, সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্ব হইতেছে কাউট্স্কির চরম-সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবিকাশ। কাউট্স্কির চরম-সাম্রাজ্যবাদের মতই সোশাল-ডেমোক্রাটিকদের সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্বও সাম্রাজ্যবাদের জ্বলন্ত বিরোধসমূহকে **ধামাচাপা দেয় ও অদৃশ্য করিয়া রাখে।** লেনিন

দেখাইয়াছেন যে, হিলফারডিং যুদ্ধের পূর্ব্বেই সাম্রাজ্যবাদের পরস্বোপজীবী বৃত্তি ও ক্ষয়িষ্ণু প্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়া কোনো কোনো বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকেরও নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছিল; কারণ এই বৈজ্ঞানিকেরাও সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিতে গিয়া এই জ্বলন্ত বিশেষত্ব ও লক্ষণগুলিকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই।

সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্ব শান্তিপূর্ণ ও সুগম পথে সমাজতন্ত্রে উপনীত হইবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অংশকে ধাপ্পা দেওয়ার এবং বিপ্লবী সংগ্রাম হইতে তাহাদের দূরে রাখার উপায় হিসাবে কাজ করে।

এই প্রতিবিপ্লবী তত্ত্ব সমসাময়িক পুঁজিবাদের বাস্তব ঘটনাপ্রবাহে প্রতি পদে **মিথ্যা প্রতিপন্ন** হইতেছে। লেনিন সাম্রাজ্যবাদের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন সেই বিশ্লেষণের আলোকে বিচার করিলেই এই তত্ত্ব চুরমার হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, **সাম্রাজ্যবাদ** পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক **বিরোধগুলিকে** নিশ্চিহ্ন তো করেই না, বরং আরও প্রবল ও **তীব্র** করিয়া তোলে। **উৎপাদনের বিশৃঙ্খলা** দূর তো হয়ই না, উপরন্তু প্রচণ্ড **আকার** ধারণ করিয়া সর্ব্বনাশা পরিণাম ডাকিয়া আনে। মৈত্রীবদ্ধ একচেটিয়া ব্যবসাগুলির মধ্যে **প্রতিযোগিতা** পূর্ব্বের বিভিন্ন পুঁজিপতিদের ভিতরের প্রতিযোগিতা অপেক্ষা ভীষণতর হইয়া উঠে। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় সঙ্কট অধিকতর **প্রচণ্ড** ও **ধ্বংসাত্মক** হয়, এবং এই সঙ্কটের পরিণতি আরও নির্দ্দয় ভাবে শ্রমিকশ্রেণীর উপর আঘাত হানে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সঙ্কট ইহার সাক্ষ্য দেয়; কারণ, যে-দেশে একচেটিয়া ব্যবসায়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাদুর্ভাব সেই যুক্তরাষ্ট্রই এই সঙ্কটে বিশেষ জোর আঘাত পায়। বুর্জোয়া শ্রেণীর পদলেহীরা সংগঠিত পুঁজিবাদ সম্পর্কে যে-রূপকথা

রটনা করিয়া বেড়ায়, পুঁজিবাদের বর্ত্তমান **বিশ্বব্যাপী সঙ্কটে** সে-রূপকথার অলীকতা সম্পূর্ণরূপে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের (কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল) অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পার্টিগুলির সভ্যদের মধ্যে যাহারা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী, তাহারা সংগঠিত পুঁজিবাদের এই রূপকথা লুফিয়া লইয়াছিল। কমরেড বুখারিন বলেন যে, 'বাজার, দাম, প্রতিযোগিতা ও সঙ্কটের অন্যান্য সমস্যাগুলি ক্রমেই বেশী পরিমাণে বিশ্ব-অর্থনীতির সমস্যা হইয়া উঠে, এবং দেশের ভিতরে এই সব সমস্যার জায়গায় দেখা দেয় সংগঠনের সমস্যা'।

দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল যে, পুঁজিবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ বিরোধ হ্রাস পাইতেছে, পুঁজিবাদ শক্তিশালী হইতেছে, এবং নূতন এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরেই কেবল বিপ্লবী স্রোতধারার জোয়ারের বেগ সম্পর্কে কথা বলা চলিতে পারে।

সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্ব সম্পর্কে এই স্থূল ভ্রান্তি কমরেড বুখারিনের পক্ষে আকস্মিক নয়। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি যে রাশীকৃত ভুল করিয়াছেন তাহার সহিত এই লেনিনবাদ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। লেনিন বুখারিনের ভুলের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কাল (১৯১৫—২০) ধরিয়া সংগ্রাম করিয়াছেন। লেনিনের মতবাদের বিরুদ্ধে বুখারিন উপস্থিত করিলেন তাঁহার তথাকথিত 'বিশুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ'-এর তত্ত্ব। এই মতবাদের অনুবর্ত্তীরা 'বামপন্থী' বাক্যচ্ছটায় আকৃষ্ট হইয়া নিজেরাই সেই বুলি আওড়াইতে থাকে, এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সোশাল-ডেমোক্রাটদের সুবিধাবাদী মতের সহিত তাহারা এইরূপে কার্য্যত নিজেদের জড়াইয়া ফেলে।

বুখারিনের 'বিশুদ্ধ' সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি হইল এই যে,

এই তত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদের বাস্তব রূপ অত্যন্ত সহজ করিয়া এবং ভুল ভাবে চিত্রিত করে। এই তত্ত্বের অনুবর্তীরা সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত গভীরতম বিরোধকে ঢাকিয়া রাখে। সাম্রাজ্যবাদ পুরাতন পুঁজিবাদ হইতে উদ্ভূত হইয়া তাহারই ভিত্তির উপর বিকাশলাভ করে, এবং এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের মৌলিক বিরোধ দূর না করিয়া বরঞ্চ তীব্রতর করিয়াই তোলে—বুখারিনের উক্ত মতবাদের সমর্থকরা এই ঘটনার প্রতি চোখ বুজিয়া থাকে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কংগ্রেসে পার্টির কার্য্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট করিতে গিয়া লেনিন বুখারিনের সহিত তাঁহার মতভেদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

"...পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি ব্যতীত বিশুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ কোনো দিন ছিল না, এখনও নাই এবং কখনও থাকিবে না।" *

সেই বক্তৃতায় লেনিন আরও বলিয়াছেন :

"বুখারিনের বাস্তবতা হইতেছে ফিনান্স পুঁজিবাদের কেতাবী বর্ণনা। পৃথিবীতে এমন কোনো স্থান নাই যেখানে একচেটিয়া পুঁজিবাদের পাশাপাশি কয়েকটি ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতাও প্রচলিত নাই বা ভবিষ্যতে থাকিবে না।"

লেনিন পুনরায় বলিয়াছেন :

"যদি আমাদের এমন এক অখণ্ড সাম্রাজ্যবাদের সহিত কারবার করিতে হইত যাহা পুঁজিবাদকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করিয়াছে, তাহা হইলে আমাদের সমস্যা সহস্র গুণ সহজ হইত। সে-অবস্থায় আমরা এমন একটি ব্যবস্থা পাইতাম যেখানে সব কিছুই কেবল

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ২৪শ খণ্ড, 'পার্টির কার্য্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট', পৃঃ ১৩১ রুশ সংস্করণ

ফিনান্স পুঁজিরই অধীন থাকিত। তখন আমাদের কেবল এই নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইয়া বাকি সব কিছু সর্ব্বহারার হাতে ছাড়িয়া দিলেই হইত। ব্যাপারটা খুবই প্রীতিকর হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাস্তবে এমন ঘটে না। প্রকৃত পক্ষে বিকাশের ধারা এমনই যে, আমাদের কাজ করিতে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে। সাম্রাজ্যবাদ হইল পুঁজিবাদের উপর গঠিত এক অট্টালিকা (super structure)······সেই পুরাতন পুঁজিবাদই বর্ত্তমান থাকে; কতিপয় ক্ষেত্রে এই পুজিবাদ আবার রূপায়িত হইয়াছে সাম্রাজ্যবাদে।"*

বুখারিন যখন তথাকথিত বামপন্থী কমিউনিস্টদের মণ্ডলীর অন্যতম নেতা ছিলেন, তখন তিনি 'বিশুদ্ধ'সাম্রাজ্যবাদের ভ্রান্ত তত্ত্ব সমর্থন করেন। এই তত্ত্ব সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্বের প্রত্যক্ষ ভিত্তিরূপে কাজ করিয়াছে।

পুঁজিবাদের বর্ত্তমান সঙ্কট এই তত্ত্বের নিদারুণ অসারতা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। সংগঠিত পুঁজিবাদ সম্পর্কে এই সুবিধাবাদী উপকথা সোশাল ডেমোক্রাটদের নিকট হইতে ধার করা; ইহা খুবই স্পষ্ট যে, মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের সহিত এই উপকথার কোনোই সম্পর্ক নাই। লেনিন পুনঃ পুনঃ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, প্রতিযোগিতা হইতে উদ্ভূত হইলেও একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিযোগিতার অবসান ঘটায় না, পরন্তু তাহার উপরে এবং পাশাপাশি বর্ত্তমান থাকে ও ফলে, সমস্ত বিরোধ ও সংঘাতের বিশেষ তীব্রতা সাধন করে। লেনিন লিখিয়াছেন:

"সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধ বাড়াইয়া তোলে ও তীব্র করিয়া তোলে, অবাধ প্রতিযোগিতার সহিত একচেটিয়া ব্যবসায়

* ঐ পৃঃ ১৩৩—৪

জড়াইয়া ফেলে কিন্তু বিনিময়, বাজার, প্রতিযোগিতা, সঙ্কট প্রভৃতির **বিলোপ সাধন** করিতে পারে না।

> "সাম্রাজ্যবাদ হইতেছে বিলীয়মান পুঁজিবাদ (অর্থাৎ যে-পুঁজিবাদ লয় প্রাপ্ত হইতেছে) বিলুপ্ত পুঁজিবাদ নয় ... মুমূর্ষু কিন্তু মৃত নয়। সাম্রাজ্যবাদ খাঁটি একচেটিয়া ব্যবসায় নয়, পরন্তু প্রতিযোগিতা, বিনিময়, বাজার এবং সঙ্কটের পাশাপাশি একচেটিয়া ব্যবসায়—সাধারণত ইহাই হইতেছে সাম্রাজ্যবাদের একান্ত মূল বৈশিষ্ট্য।"*

এই জন্যই লেনিন জোর দিয়া বলিয়াছেন যে,—

> "বিরুদ্ধনীতির অর্থাৎ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া ব্যবসায়ের এইরূপ সম্মিলনই সাম্রাজ্যবাদের সারমর্ম্ম; ইহার ফলেই সংঘটিত হয় চরম বিপর্য্যয়,—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।" †

সাম্রাজ্যবাদ হইল **পরস্বোপজীবী বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ**। পুঁজিবাদী একচেটিয়া ব্যবসায় অবশ্যম্ভাবী রূপে জড়ত্ব ও ক্ষয়াভিমুখে অগ্রসর হয়। পুঁজিবাদী একচেটিয়া ব্যবস্থা একচেটিয়া দাম নিদ্ধারণ করে এবং সেই দামের হার চড়া রাখিতে প্রয়াস পায়। অবাধ

পরস্বোপজীবী বৃত্তি ও পুঁজিবাদের ক্ষয়

প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক পুঁজিপতিই নিজের উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করিয়া তাহার মুনাফা বাড়াইতে চেষ্টা করে, এবং ব্যয় হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার যান্ত্রিক উন্নতির প্রবর্ত্তন করে। একচেটিয়া চড়া দাম বজায় রাখিতে পারে বলিয়া একচেটিয়া ব্যবসায়গুলি নূতন উন্নততর যান্ত্রিক

* লেনিনের গ্রন্থাবলী ২০শ খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৩৩১, লরেন্স এ্যাণ্ড উইশার্ট সংস্করণ, লণ্ডন ১৯২৯

† ঐ

আবিষ্কার কাজে লাগাইতে উৎসুক নয়। পক্ষান্তরে তাহারা সচরাচর অন্য যে কোনো কিছু হইতে যান্ত্রিক আবিষ্কারকে অধিক ভয় করে, কারণ ইহার ফলে উৎপাদনে তাহাদের একচেটিয়া অধিকার লোপ পাইবার অথবা তাহাদের নিয়োজিত বিপুল পুঁজি মূল্যহীন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দেয়। একচেটিয়া ব্যবসায় তাই সচরাচর কৃত্রিম উপায়ে **যান্ত্রিক উন্নতি স্থগিত** রাখে। সাম্রাজ্যবাদী যুগে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লিখিত পুস্তকে লেনিন ওয়েন্‌সের বোতল ভর্ত্তি করার যন্ত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রে এই যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। একটি জার্মান মূল্যনিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘ ওয়েন্‌সের পেটেন্ট খরিদ করিয়া তাহার ব্যবহার বন্ধ রাখিল। যুদ্ধোত্তর যুগেও এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। খুব বেশী দিন আগের কথা নহে, 'চিরস্থায়ী প্রদীপের' মত এক রকম বৈদ্যুতিক দীপ আবিষ্কৃত হইয়াছিল—যে দীপ জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়া যায় না। বৈদ্যুতিক একচেটিয়া ব্যবসায় সঙ্ঘের দীপ বিক্রয়ের হ্রাস করিতে পারে, এই ভয়ে এই আবিষ্কারকে অদ্যাবধি বাজারে ছাড়া হয় নাই। সুইডিস ক্র্যুগার ম্যাচ ট্রাস্ট্ আমেরিকান ব্যাঙ্কের সাহায্যে কারবার করিত, প্রায় সারা দুনিয়া ছাইয়া ছিল তাহার শাখা-প্রশাখা; ভিয়েনাবাসী কোনো এক রাসায়নিক কর্ত্তৃক 'চিরস্থায়ী' দিয়াশলাই আবিষ্কারের ফলে তাহারাও কিন্তু কম বিচলিত হয় নাই। আমেরিকার তৈল ব্যবসায় সঙ্ঘগুলি জার্মানির অধ্যাপক বার্জিয়াসের আবিষ্কৃত কয়লা হইতে তৈল প্রস্তুতের পদ্ধতি ক্রয় করিয়া লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের পক্ষে অসুবিধা জনক হইবে বলিয়াই আমেরিকার রেলপথ আজও বিদ্যুৎসম্পন্ন করা হইতেছে না।

এ সমস্ত সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে যে, যান্ত্রিক উন্নতির সাহায্যে মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা কিছু পরিমাণে চলিতে থাকে। এই জন্যই বৃহত্তম ব্যবসায়গুলি চমৎকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে: এই সব প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক এবং পদার্থবিজ্ঞানবিৎ কাজ করেন। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায়ের দরুন আবিষ্কারগুলির একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র কাজে লাগানো হয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই পরস্পর বিরোধী লক্ষণের এক একটি প্রকট হইয়া উঠে—কখনও ঝোঁক দেখা যায় যান্ত্রিক উন্নতির দিকে, কখনও বা আবার ঝোঁক দেখা যায় নিষ্ক্রিয়তার দিকে।

পরস্বোপজীবী ও ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থারূপ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ-সমূহের আসল প্রকৃতি সম্বন্ধে উপলব্ধির একান্ত অভাবই হইল ট্রট্স্কিবাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। একদিকে উৎপাদনশক্তিসমূহ বিকশিত করার প্রচেষ্টা এবং অপর দিকে যান্ত্রিক উন্নতি রোধের প্রবৃত্তি—সাম্রাজ্যবাদের আওতায় এই দুইটি ঝোঁকের যে **সংগ্রাম** চলিতেছে ট্রট্স্কিবাদীর তাহা বোধগম্য হয় না। এই **সংগ্রামই**, এই দুই গতির অবিরত **সংঘাতই** বিরোধ তীব্র করিয়া তোলে; বিরোধের এই তীব্রতাই হইতেছে সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য। ট্রট্স্কিবাদ ঘটনাকে এমন ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করে যাহাতে মনে হয় যে, সাম্রাজ্যবাদের আওতায় যান্ত্রিক উন্নতি এক দম বন্ধ হইয়া গিয়াছে, উৎপাদনশক্তির বিকাশ সম্পূর্ণ 'রুদ্ধ' হইয়াছে। এইরূপ চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ ফল হইল 'পুঁজিবাদের স্বতপ্রবৃত্ত বিনাশের' বিশ্বাসঘাতী মতবাদ। ইহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। সাম্রাজ্য-বাদের আওতায় অসম বিকাশের লেনিনপন্থী মূলসূত্রকে ট্রট্স্কিপন্থীরা অস্বীকার করে। আর এই অস্বীকৃতির সহিত তাহাদের উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর অচ্ছেদ্য সম্পর্কও রহিয়াছে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর পরস্বোপজীবী বৃত্তি সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিশেষ স্পষ্ট হইয়া উঠে। বুর্জোয়া শ্রেণীর অধিকাংশেরই উৎপাদন-পদ্ধতির সহিত অনুমাত্র সম্পর্কও থাকে না। পুঁজিপতিদের অধিকাংশই হইল এমন সব লোক যাহাদের একমাত্র কাজ হইতেছে 'চেক কাটা'। পুঁজিপতিরা কারবারের শেয়ার, খত্ সরকারী ঋণ এবং অপরাপর জামিনের মালিক হইয়াছে ; ইহাই তাহাদের আয় জোগায়। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে ভাড়াটিয়া বিশেষজ্ঞ লোকেরা (technical forces)। পুঁজিবাদের কোটি কোটি ভাড়াটিয়া ক্রীতদাসের কঠোর শ্রমের ফল ভোগ করে বুর্জোয়া শ্রেণী আর তাহার অগনিত পদলেহীরা (রাজনীতির বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী, পাণ্ডা-পুরোহিত প্রভৃতি)। সুইডেনের মত সমগ্র দেশ অথবা ফ্রান্সের দক্ষিণ, ইতালী ও অংশত ইংলণ্ডের মত একটা গোটা অঞ্চল আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রীড়াক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। উন্মত্ত বিলাসে অনুপার্জ্জিত আয় বেপরোয়া ভাবে ব্যয় করিবার জন্যই এই সব জায়গায় তাহারা আসে।

সাম্রাজ্যবাদী যুগের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় পুঁজিবাদী সভ্যতার বিশেষ **অবনতি** (decline)। দুর্নীতি (ঘুষ ইত্যাদি) বৃদ্ধি পাইয়া রাজনীতি, নাগরিক জীবন, শিল্পকলা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ছড়াইয়া পড়ে। বৃহত্তম একচেটিয়া ব্যবসায় দেশের আইন সভার সভ্যদের নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলী ও উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে বেতনভুক্ করিয়া রাখে। সরকারের প্রধান ব্যক্তিরা বড় বড় ব্যাঙ্ক, সঙ্ঘ ও ব্যবসায় সঙ্ঘ সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত থাকে। উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারীদের লক্ষ লক্ষ টাকার 'ভেট' দিয়া ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় সঙ্ঘ দেশের মধ্যে নিজেদের খেয়াল-খুশি মত কাজ করিতে পারে। সংবাদপত্র হইতেছে বৃহৎ পুঁজির ভাড়াটিয়া নোকর। কোনো নূতন মালিকের হাতে যাওয়া মাত্রই অতি পুরাতন

এবং অত্যন্ত 'সুযোগ্য' বুর্জোয়া সংবাদপত্র সমূহও তাহার রাজনৈতিক 'ভোল' বদলাইয়া ফেলে। বহু সংখ্যক চুট্‌কি সাময়িক পত্রিকা (yellow journals অর্থাৎ সাধারণের মনে উত্তেজনা ও বিভীষিকা সৃষ্টিকারী) উপরোক্ত ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই রূপেই যুদ্ধের পরে জার্মানিতে অধিকাংশ 'চুটকি' সাময়িক পত্রিকা, এমন কি বহুগুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রেরও মালিক ছিল বড় পুঁজিপতি ষ্টিনস্। যুদ্ধের বাজারে এবং তাহার পরে যথেচ্ছ ফাটকা ব্যসায়ের কল্যাণে এই 'ভদ্র' লোকটি ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। জাহাজী ব্যবসা, কয়লা ও অসংস্কৃত ধাতুর খনি, এবং ছায়াচিত্রের মালিক ষ্টিনস্-প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া পড়ার পর সংবাদপত্র ব্যবসায়ে নিয়োজিত তাহার সম্পদের এক বিরাট অংশ ভারী শিল্পের অপর একজন বড় পুঁজিপতির করতলগত হয়। তিনি হইতেছেন হিউজেনবের্গ। এই হিউজেনবের্গ জার্মান বাণিজ্যজীবীশ্রেণীর অন্যতম নেতা, ইনি হিটলারের রক্তাক্ত ফাশিস্ত একনায়কত্বের ক্ষমতালাভে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

ডাহা জুয়াচুরি, জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা এবং শঠতা বড় পুঁজিপতি ও বাণিজ্যজীবী রাজনীতিকদের উত্তরোত্তর উন্নতির প্রচলিত পন্থায় পরিণত হয়। এই সব অপরাধ কিন্তু ধরা পড়ে কেবলমাত্র কালেভদ্রে—অকৃতকার্য্যতার ফলে যখন কেলেঙ্কারী প্রকাশ পায়। এইরূপে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আইভার ক্র্যুগারের অপকীর্ত্তি সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। আইভার ক্র্যুগার ছিলেন সুইডেনের দিয়াশলাই ব্যবসায়-সঙ্ঘের নায়ক এবং সোভিয়েট-বিরোধী আক্রমণ চালনার অতি প্রচণ্ড প্ররোচনাদাতাদের অন্যতম। দেউলিয়া হইবার মুখে তিনি আত্মহত্যা করেন। সংকটের ভিতরে সর্ব্বনাশের যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ক্র্যুগার যত জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা

এবং মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছিলেন তাঁহার আত্মহত্যার পর সে সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেই ১৯৩২ খৃষ্টাব্দেই আবার ফ্রান্সে ধরা পড়ে আউষ্ট্রীক স্টক্-কোম্পানীর লোমহর্ষণ অপকীর্ত্তি। এই অপকীর্ত্তি প্রধান প্রধান সরকারী রাজনীতিক ও ব্যাঙ্ক মালিকদের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ধড়িবাজ জুয়াচোরের কাজ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। সকল রকমের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির সাহায্যে এই জুয়াচোরের দলটি সরল বিশ্বাসী ক্ষুদে পেটি বুর্জোয়াদের হাত হইতে লক্ষ লক্ষ ফ্রাঙ্ক অর্থ বাহির করিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান পুঁজিপতি মরগ্যানের কয়েকটি সন্দেহজনক লেনদেন ধরা পড়ায় যথেষ্ট সোরগোল উঠিয়াছিল।

আমেরিকায় কুচক্রী রাহাজানদের অনেকগুলি সুসংগঠিত দল আছে; বিশেষ কুখ্যাত হইলেও তাহারা আবার সম্মানও পায়। তাহাদের নিজেদের ব্যবসায়-সঙ্ঘও আছে। পুলিস ও সরকারের সঙ্গে এই সঙ্ঘ অতিশয় সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলে।

অগ্রগামী দেশসমূহে সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকশ্রেণীর **ঊর্দ্ধতন মণ্ডলীকে** ঘুষ খাওয়ায়। উপনিবেশ হইতে প্রাপ্ত প্রভূত আয় হইতে, অনুন্নত দেশ সমূহ হইতে নিংড়াইয়া সংগৃহীত অতি-মুনাফা হইতে, এবং বিপুল সংখ্যক সর্ব্বহারার অত্যধিক শোষণ ও দারিদ্র্যের বিনিময়ে ব্যবসায় সঙ্ঘের (trustified) পুঁজি শ্রমিকদের সংখ্যাল্প সুবিধাপ্রাপ্ত এক অংশের মজুরী বৃদ্ধি করে এবং সাধারণ ভাবে তাহাদের অবস্থার উন্নতিবিধান করে। বাণিজ্যজীবী বিধানের রক্ষণঘাটিতে পরিণত হয় সর্ব্বহারার এই ঘুষখোর অংশই। সাম্রাজ্যবাদ অবশ্য শ্রমিকশ্রেণীর অতি অল্পসংখ্যক লোককেই ঘুষ খাওয়াইতে পারে। শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক প্রধান অংশের নিয়ত বর্দ্ধমান শোষণের ফলেই এমন ঘুষ খাওয়ানো সম্ভব হয়। শেষ

পর্য্যন্ত কিন্তু ইহার ফলে শ্রেণীবিরোধ আরও বৃদ্ধি পায় এবং শ্রেণীসমূহের মধ্যে বিচ্ছেদ আরও গভীর হয়।

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্তর। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, এই বৈশিষ্ট্য তিন রকমের; প্রথমত সাম্রাজ্যবাদ হইল **একচেটিয়া ব্যবসায়ী পুঁজিবাদ**; দ্বিতীয়ত, **পরস্বোপজীবী** বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ; তৃতীয়ত, **মরণোন্মুখ বা মুমূর্ষু** পুঁজিবাদ। পরস্বোপজীবী, ক্ষয়িষ্ণু, মুমূর্ষু পুঁজিবাদের যুগ রূপে সাম্রাজ্যবাদের যুগ একচেটিয়া ব্যবসায়ের যুগ। ইহার আসল রূপই মার্ক্সবাদের সকল রকমের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা হইতে বিপ্লবী মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের সকল মৌলিক বিরোধ-অসঙ্গতিই চরম সীমায় উপনীত হয় এবং চূড়ান্ত তীব্রতা লাভ করে। স্টালিন তাঁহার লেনিনবাদের ভিত্তি বিষয়ক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিরোধ তিনটি।

সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের ধ্বংসের যুগ

প্রথমত, **শ্রম ও পুঁজির মধ্যে বিরোধ**। সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়া ব্যবসায় ও ব্যাঙ্কের মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির সর্ব্বশক্তিমত্তা সূচিত করে। সম্পদশালী মোড়লতন্ত্রের নিপীড়ন এত কঠোর হয় যে শ্রমিকশ্রেণীর পুরাতন সংগ্রামপদ্ধতি সমূহ যেমন—পুরাতন ধরনের শ্রমিক সঙ্ঘ, আইনসভাগত দল সমূহ সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য অভূতপূর্ব্ব মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া, তাহাদের উপর একচেটিয়া ব্যবসায় ও জুয়াচোর ব্যাঙ্ক মালিকদের ক্ষুদ্র মণ্ডলীকৃত নিদারুণ শোষণ বাড়াইয়া সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখে সংগ্রামের নূতন বিপ্লবী পদ্ধতির সমস্যা পূর্ণ গুরুত্বে উপস্থাপিত করে। সাম্রাজ্যবাদই শ্রমিককে বিপ্লবের সম্মুখীন করে।

দ্বিতীয়ত, পণ্যবিক্রয় ও পুঁজি খাটাইবার উদ্দেশ্যে নূতন ভূভাগ, কাঁচা মালের উৎস ও বাজার দখলের জন্য নিরবচ্ছিন্ন রেষারেষিতে আর্থিক জগতের প্রতারকদের **বিভিন্ন চক্রের মধ্যে** এবং **সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের** মধ্যে **বিরোধ**। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী চক্রের (celque) মধ্যে উন্মত্ত রেষারেষির ফলে অনিবার্য্যরূপে আরম্ভ হয় যুদ্ধ—যাহাতে পূর্ব্বের বিভক্ত পৃথিবীকে পুনর্বিভাগের সংগ্রামে, কয়েক-জন কোটিপতির জন্য সম্পদের নূতন উৎস কুক্ষিগত করার সংগ্রামে, প্রধানতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ রক্তের অতলস্পর্শ বন্যা বহাইয়া দেয় এবং স্তূপীকৃত শবের পাহাড় খাড়া করে। সাম্রাজ্যবাদীদের সংগ্রামের ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তাহারা উভয়েই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সাধারণ ভাবে পুঁজিবাদী অবস্থার অবনতি ঘটে এবং এইরূপে সর্ব্বহারা বিপ্লবের দিন ঘনাইয়া আসে, সমাজকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহার একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে।

তৃতীয়ত, তথাকথিত **অল্পসংখ্যক সভ্য জাতি** এবং **উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের** বিপুল জনসাধারণের **মধ্যে বিরোধ**। সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের শাসনে উপনিবেশ ও আধা-ঔপনিবেশিক জগতে কোটি কোটি লোক উৎসন্নে যায়।

> "সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হইল বিশাল উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশসমূহের কোটি কোটি জনসাধারণের উপর অত্যন্ত নির্লজ্জ শোষণ ও নিতান্ত অমানুষিক নিপীড়ন।" *

অতিমুনাফার লোভে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে কল কারখানা স্থাপন করে, রেলপথ গড়ে, পুরাতন বিধিব্যবস্থা

* স্টালিন—'লেনিনবাদের ভিত্তি,' পৃঃ ১৪ ; ও 'লেনিনবাদ', পৃঃ ৪

ভাঙ্গিয়া দেয় এবং গোলাবারুদ, আগুন আর তরবারীর সাহায্যে নূতন পুঁজিবাদী সম্পর্কের পথ উন্মুক্ত করে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বৃদ্ধির ফলে উপনিবেশ ও অধীন দেশসমূহে মুক্তি আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করে, সারা দুনিয়ায় পুঁজিবাদী সংস্থা দুর্ব্বল হয়, ইহার ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে, এবং স্টালিনের ভাষায়, এই দেশ সমূহ "সাম্রাজ্যবাদের সংরক্ষিত (reserve) শক্তি হইতে সর্ব্বহারা বিপ্লবের সংরক্ষিত শক্তিতে" রূপান্তরিত হয়। উপনিবেশের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের ভয়ের কারণ হইয়া উঠে ও সর্ব্বহারা বিপ্লবের সহায়ক হয়।

সকল বিরোধ অসঙ্গতি চরমতম তীব্রতা লাভ করার ফলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, তাহার ফলে সাম্রাজ্যবাদই হইয়া উঠে **সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ব্বলক্ষণ।** পুঁজিবাদের বিরোধ অসঙ্গতি সমূহ এতই তীব্র হইয়া উঠে যে, পুঁজিবাদী সম্পর্ক আর বজায় রাখা মানব সমাজের বিকাশের পথে অসহ্য বাধা হইয়া দাঁড়ায়। পুঁজি-বাদী সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির সুদূরপ্রসারী বিকাশে বাধা দেয়; তাহারই ফলে পুঁজিবাদ ক্ষয় পাইতে থাকে এবং জীবিতাবস্থাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে সুরু করে। এই ধ্বংস-প্রবণতা কিন্তু ব্যাপক পুঁজিবাদী সঙ্কটের সময়েও বিভিন্ন দেশের বা শিল্পের বিভিন্ন শাখার উন্নতির পথ রোধ করে না। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় প্রভূত পরিমাণ পুঁজি উৎপাদনের কাজে না লাগিয়া নষ্ট হয়; অবশেষে পুঁজিপতি শ্রেণী তাহার পদলেহী পারিষদবর্গ সহ হইয়া দাঁড়ায় মারাত্মক শক্তিশোষক শত্রু বিশেষ এবং সম্পত্তিচ্যুত শ্রমিকদের বিপুল এক সংখ্যার উপর ক্রমেই অসহনীয় ভাবে চাপিয়া বসিতে থাকে। একচেটিয়া পুঁজিবাদ সেই সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি করিয়া চলে সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার অনুকূল পূর্ব্বাবস্থা সমূহের।

"বিশ্ব জোড়া পুঁজিবাদের বিকাশের অত্যন্ত ব্যাপক উন্নত অবস্থা ও অবাধ প্রতিযোগিতার স্থানে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের (state monopoly capitalism) আবির্ভাব; ব্যাঙ্ক ও পুঁজিবাদী সঙ্ঘ সমূহের দ্বারা উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদিত দ্রব্য সম্ভার বণ্টনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (apparatus) সৃষ্টি; দাম বাড়া এবং একচেটিয়া ব্যবসায় বিস্তারের ফলে বাণিজ্য সঙ্ঘ কর্ত্তৃক শ্রমিক শ্রেণীর উপর উৎপীড়ন বৃদ্ধি ; সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র কর্ত্তৃক শ্রমিক শ্রেণীকে দাসে পরিণত করা ; সর্ব্বহারার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে বিপুল বাধা স্থাপন ; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সৃষ্ট বিভীষিকা, দারুণ দুর্ব্বিপাক, ধ্বংস—এই সমস্তই পুঁজিবাদের পতন এবং উন্নত ধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলে।" *

সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্য্য ফল হইল সর্ব্ববিধ্বংসী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে নিদারুণ ব্যাপক এক সঙ্কট নিমজ্জিত করিয়াছিল ; সাম্রাজ্যবাদের সকল বিরোধ অসঙ্গতির চরম তীব্রতা ও প্রখরতা এই সঙ্কটের বিশিষ্ট লক্ষণ। পুঁজিবাদের ব্যাপক সঙ্কট তাহার ভাঙ্গন ও ধ্বংসের সূচনা ; পুঁজিবাদের ব্যাপক এই সঙ্কটের উপরে 'সাম্যবাদী আন্তর্জাতিক' (Comintern) যে নীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে লেনিনপন্থী সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার এক অপরিহার্য্য অংশ, এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র। সকল সম্প্রদায়ের ট্রট্স্কিপন্থী অপরাধীরা,—যাহারা পুঁজিবাদের ব্যাপক সঙ্কট সম্পর্কে 'সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকের' নীতি অস্বীকার করে, তাহারা মার্ক্স্‌বাদ-লেনিনবাদ হইতে সম্পূর্ণ অপসৃত ও লেনিনপন্থী সাম্রাজ্যবাদ তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত ।

* সোভিয়েট সঙ্ঘের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কার্য্যক্রম ও বিধানাবলী

সাম্রাজ্যবাদ হইল পুঁজিবাদের পতন ও ধ্বংসের যুগ, বিজয়ী সর্ব্বহারা-বিপ্লবের যুগ। একাধিকবার লেনিন উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

"সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের বিকাশের সর্ব্বোচ্চ স্তর। অগ্রবর্ত্তী দেশসমূহে পুঁজি জাতীয় রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। প্রতিযোগিতার স্থানে একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং এই ভাবে সৃষ্টি করিয়াছে সেই সমস্ত বাস্তব অবস্থাপরিবেশের, সমাজতন্ত্র স্থাপনের আগে যে সবের প্রয়োজন হয়।" *

অপর এক স্থানে লেনিন বলিয়াছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের যুগ হইল পরিণত, অত্যন্ত পরিণত পুঁজিবাদের যুগ। এ পুঁজিবাদ ধ্বংসের মুখে, এবং এত পরিণত যে সমাজতন্ত্রকে নিজের আসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে।

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের যুগ হইতেছে পুঁজিবাদের পতন ও ধ্বংসের যুগ, সর্ব্বহারা বিপ্লবের যুগ।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। প্রতিযোগিতার ফলে কেমন করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায় গড়িয়া উঠে ?

২। একচেটিয়া ব্যবসায় কি প্রতিযোগিতার অবসান ঘটায় ?

৩। একচেটিয়া ব্যবসায়ের মুনাফার উৎস কি ?

৪। সাম্রাজ্যবাদের যুগে ব্যাঙ্কের ভূমিকা পরিবর্ত্তিত হয় কি প্রকারে ?

৫। পুঁজি রফ্তানির কারণ কি ?

৬। মূল্য নিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘের কাজ কি ?

৭। অসম বিকাশের মূল সূত্র কি ?

৮। সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্বে প্রকৃত বিশ্বাসঘাতী প্রকৃতি কি কি ?

৯। সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্ব কি প্রকারে চরম-সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের সহিত সংযুক্ত।

১০। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় পুঁজিবাদের ক্ষয় কি প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে ?

১১। সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি মৌলিক লক্ষণ কি কি ?

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ৫ম খণ্ড, 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার,' পৃঃ ২৬৭

দশম পরিচ্ছেদ

মহাযুদ্ধ ও পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কট

সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের পতন

পুঁজিবাদী বিধানের মৌলিক বিরোধসমূহ সাম্রাজ্যবাদের যুগে **চরম পর্য্যায়ে** উপনীত হয়। একদিকে মুষ্টিমেয় অধঃ-পতিত পুঁজিপতি পাণ্ডারা; অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিত বিরাট মানবজাতি। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আওতায় ইহাই হইল সমাজের রূপ।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্ষয় ও অবনতি ঘটে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরবর্ত্তী বিকাশের পথে অন্তরায় হইয়া উঠে। মানুষের চিন্তা, বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা প্রকৃতির উপর নিত্যনূতন বিজয় বার্ত্তা ঘোষণা করে। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর শক্তিসমূহকে একের পর এক মানুষ নিজের বশীভূত করিয়া ফেলে। এই জয়ের ফল কিন্তু ভোগ করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবান মাত্র। অধিকন্তু, পুঁজিবাদী সম্পর্কের আওতায় অধিকাংশ বিস্ময়কর আবিষ্কার ও উদ্ভাবনাকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

সমগ্রভাবে মানবজাতি এইরূপ সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছে যাহাতে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার উপযোগী উপকরণ পাইতে পারে। ইহাতেও বাদ সাধে পুঁজিবাদী সম্পর্ক। বিপুল জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া এই অফুরন্ত সম্পদসম্ভার ব্যবহৃত হয় তাহাদের অকল্যাণের জন্য, অনিষ্টের জন্য। পুঁজিবাদের আওতায়

অনিবার্য্য ঘটনা হইল সর্ব্বনাশা যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদ অসংখ্য মানুষকে বলি দেয়, বহু যুগের কঠোর শ্রমসাধনার ফল করে ধ্বংস।

সমাজতন্ত্র অথবা ধ্বংস, সমাজতন্ত্র অথবা অনিবার্য্য অধঃপতন—সাম্রাজ্যবাদী যুগে সমস্যাটি এই ভাবেই দেখা দেয়। পৃথিবীর সর্ব্বহারা শ্রেণীকে এক চরম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিতে হইবে, সাম্রাজ্যবাদের গ্রাস হইতে মানবজাতিকে ছিনাইয়া আনিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদী রাজত্বের উচ্ছেদের সংগ্রামে সর্ব্বহারারা দুনিয়ার বঞ্চিতদের মধ্যে বহু **মিত্রকে** সঙ্গে পায়। ঔপনিবেশিক দেশের শ্রমিক সাধারণ সাম্রাজ্যবাদী শাসনপ্রণালীর 'মাধুর্য্য' সারা দেহে মনে উপলব্ধি করে—তাহারা এবং সর্ব্বস্বান্ত কৃষক সাধারণ ও শ্রমজীবীদের মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায় পুঁজিবাদের উচ্ছেদের সংগ্রামে সর্ব্বহারা শ্রেণীর সহায়ক। কোনো কোনো দেশে সাময়িক ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও সর্ব্বহারার চূড়ান্ত সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

এইরকম করিয়াই সাম্রাজ্যবাদ শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রামকে চরম তীব্রতার মধ্যে ঠেলিয়া দেয়। এই সংগ্রামে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার **ভাগ্য** নির্দ্ধারিত হয়। কাজেই সংগ্রামও হয় অত্যন্ত কঠোর।

পুঁজিবাদী বিকাশের অসমতা পুঁজিবাদী যুগে বৃদ্ধি পায়; ইহার ফলে বিভিন্ন দেশে সর্ব্বহারার বিজয়লাভের অনুকূল বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। স্বভাবতই যে-সব দেশে অবস্থা অত্যন্ত অনুকূল সেই সব দেশে এবং সেই সময়ে সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বহারা ক্ষমতা দখল করিয়া সমাজতন্ত্র গঠন করিতে অগ্রসর হয়।

"সাধারণ ভাবে প্রভূত যন্ত্রোন্নতি, বিশেষভাবে যোগাযোগের উপকরণের উন্নতি, পুঁজি ও ব্যাঙ্কের বিপুল বৃদ্ধির ফলে পুঁজিবাদ পরিণতি এবং অতি-পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবে এখনও ইহা টিকিয়া থাকায় মানুষের বিকাশের পথে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল

বাধা হইয়া উঠিয়াছে। নিজেকে ইহা খাটো করিয়া আনিয়াছে অসীম শক্তিসম্পন্ন মুষ্টিমেয় কোটিপতি ও লক্ষপতির শাসনে ; উপনিবেশের কর্তৃত্ব, অর্থনৈতিক 'প্রভাবাধীন এলাকার' অথবা 'অধীন দেশসমূহের শাসনাধিকার' (administrative mandates) ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী-লুঠের মাল জার্মান অথবা ইঙ্গ-ফরাসী দস্যুমণ্ডলীর মধ্যে কে করায়ত্ত করিবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য পুঁজিবাদ জাতিসমূহকে পারস্পরিক হত্যাসাধনে প্ররোচিত করিতেছে।

"১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধে এই কারণে এবং একমাত্র এই কারণেই কোটি কোটি মানুষকে হত্যা ও বিকলাঙ্গ করা হইয়াছিল। সকল দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যেই প্রচণ্ড গতিতে এই সত্যের উপলব্ধি প্রসারলাভ করিতেছে ; আরো বিশেষ করিয়া এই কারণে যে, মহাযুদ্ধের ফলে সব দেশই অভূতপূর্ব্ব ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং 'বিজয়ী জাতিগুলি' সমেত প্রত্যেক জাতিকেই ঋণের সুদের টাকার অঙ্কে যুদ্ধের মাসুল দিতে হইতেছে।

"পুঁজিবাদের পতন অনিবার্য্য। জনসাধারণের বিপ্লবী চেতনা বৃদ্ধি পাইতেছে। হাজার হাজার নিদর্শন তাহার সাক্ষ্য দেয়।

"পুঁজিপতিরা, বুর্জোয়ারা অত্যন্ত অনুকূল অবস্থায় আরও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষকের সর্ব্বনাশের বিনিময়ে কোনো কোনো দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভ হয়তো বিলম্বিত করিতে পারে ; কিন্তু পুঁজিবাদকে রক্ষা করিতে আর তাহারা পারে না।" *

পৃথিবীর পুনর্বিভাগের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে রেষারেষির ফলে সংঘটিত হয় ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার

* লেনিনের গ্রন্থাবলী, ২৮শ খণ্ড, 'আমেরিকান সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর' পৃঃ ৪০৪, রুশ সংস্করণ

ভিত্তিকে পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দ্দশার কারণ ঘটায়। যুধ্যমান দেশসমূহের মোট ৬ কোটি ২০ লক্ষ লোককে যুদ্ধে তলব করা হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ

১ কোটির অধিক নিহত হয় এবং সারা জীবনের মত পঙ্গু হইয়াছে এমন ভাবে আহত আর বিকলাঙ্গের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ। দুনিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দেশ সমূহের সম্পদসম্ভার নিতান্ত অর্থহীন ভাবে শূন্যে উড়াইয়া দেওয়া হয়। হিসাবে দেখা যায় যে, মহাযুদ্ধে খরচ হইয়াছিল ৯০ হাজার কোটি টাকা। এই টাকার অঙ্ক ধারণা করিবার সুবিধার জন্য উল্লেখ করা যাইতে পারে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে যুদ্ধরত সমস্ত দেশের সমগ্র সম্পদের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা। কাজেই দেখা যায় যে, বহু যুগের কঠোর, দাসোচিত শ্রমের মূল্যে যে সম্পদসম্ভার ইওরোপীয় জাতিসমূহ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহার অর্দ্ধেকই এই মহাযুদ্ধে নিঃশেষ হইয়াছে।

মহাযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটায়। কোনো কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক-সূত্র ছিল মহাযুদ্ধ তাহাও ছিন্ন করিয়া ফেলে। কোনো কোনো দেশ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে (জার্মানি)। আমদানী কাঁচামাল ও খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ হ্রাস পায়, উৎপাদক শ্রেণীর শ্রমিক ও কৃষকদের বিপুল জনসাধারণকে যুদ্ধে নিয়োজিত করিবার জন্য তাহাদের কাজ হইতে অপসারণ করা হয়। কোনো কোনো দেশে শিল্প-শ্রমিক ও কৃষি-শ্রমিকদের মোট সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশকে সেনাদলে ঢুকানো হয়। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যুদ্ধ জনসাধারণের শ্রেষ্ঠ উৎপাদক অংশকেই অর্থাৎ সবলকায় যুবকদের সরাইয়া লয়। বৃদ্ধ, কিশোর এবং নারী—যাহাদের শ্রম নিতান্ত নিম্ন স্তরের, তাহারাই ছিল ঘরে।

সামরিক কার্য্যকলাপের ফলে সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল উজাড় হয়, ভস্মে পরিণত হয়। মহাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র কেবল কৃষি প্রধান অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অনেক সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-কেন্দ্রসমূহেও বিস্তৃত হইত। বিধ্বংস গোলার আগুনে কলকারখানা যন্ত্রপাতি সমস্তই পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইত। খনি জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গোটা শহর, সমগ্র শিল্প এলাকা নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে। উত্তর ফ্রান্স ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানেই ছিল বিশ্বযুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান রণাঙ্গন—পশ্চিম রণাঙ্গন।

সর্ব্বোপরি, যুদ্ধের ফলে যে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় সাধিত হইয়াছে তাহার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হইল সামরিক প্রয়োজনের তাগিদে উৎপাদনের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনে সমগ্র জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থার রূপান্তর।

যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদনের প্রকৃতিতে মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটে। উৎপাদনের উপকরণ, ভোগ্যবস্তু ও বিলাস সামগ্রী—যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের এই তিনটি মৌলিক পণ্যের সহিত এখন একটি চতুর্থ পণ্য যুক্ত হইয়া ক্রমশই মুখ্য স্থান দখল করিতে লাগিল। এই চতুর্থ পণ্যটি হইল ধ্বংস করিবার, নির্ম্মূল করিবার হাতিয়ার কামান-বন্দুক, গোলা-বারুদ, জঙ্গী বিমান, ডুবোজাহাজ, রাইফেল, ট্যাঙ্ক, বিষবাষ্প ইত্যাদি। যুধ্যমান সকল দেশের সমগ্র সম্পদের পরিমাণ ছিল যখন ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা তখন মহাযুদ্ধে ব্যয় হইয়াছিল ৯০ হাজার কোটি টাকা। এই দেশগুলির বার্ষিক জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার ৫ শত কোটি টাকা। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বহু সংখ্যক শ্রমিককে যুদ্ধে নিযুক্ত করিবার ফলে যুদ্ধের সময়ে প্রত্যেক দেশের বার্ষিক আয় এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পাইয়া মোট আয়ের পরিমাণ ১৭ হাজার ১ শত কোটি টাকা হইয়াছিল, এবং সমস্ত অসামরিক ব্যয়ের

দরুণ ইহার শতকরা ৫৫ ভাগ খরচ হইত, তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, চল্‌তি জাতীয় আয় হইতে বৎসরে যুদ্ধ ব্যয়ের মাত্র ৭ হাজার ৫ শত কোটি টাকা সঙ্কুলান হইত। যুদ্ধের চারি বৎসরে ইহার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। সুতরাং অবশিষ্ট ৬০ হাজার কোটি টাকা যুধ্যমান জাতিগুলির স্থায়ী পুঁজি হইতে ব্যয় করিতে হইয়াছে। কাজে কাজেই মোট ব্যাপারটা এইরূপ দাঁড়াইল যে, যুদ্ধের পরে এই জাতিগুলির সমগ্র সম্পদের পরিমাণ আর ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা ছিল না, ছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা, অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ কম।

যুদ্ধ সমাজের শ্রমশক্তির ক্ষেত্রেও অবর্ণনীয় বিপর্যয় সাধন করিয়াছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইওরোপের জনসংখ্যা ছিল ৪০ কোটি ১০ লক্ষ। যুদ্ধ না ঘটিলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জনসংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ৪২ কোটি ৯০ লক্ষ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হইয়াছিল ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ। অন্য কথায় বলা যায় যে, ইওরোপ তাহার সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৯ ভাগ বা ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ লোক হারাইয়াছিল। লোকসংখ্যা হ্রাসের ব্যাপারে যুদ্ধের প্রভাব তিন দিক হইতে অনুভূত হয়—প্রথমত, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং মহামারীর ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে প্রত্যক্ষ প্রাণহানিতে; দ্বিতীয়ত, প্রায় সকল পুরুষ মানুষকে যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত করার দরুণ জন্মহারের হ্রাসে; এবং তৃতীয়ত জীবনযাত্রার অবস্থায় অবনতির (বুভুক্ষা, অভাব, অনশন প্রভৃতি) ফলে মৃত্যুহার বৃদ্ধিতে।

এই বিপুল লোকক্ষয় যুধ্যমান জাতিসমূহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রমশক্তির ক্ষেত্রেই মুখ্যত সংঘটিত হইয়াছে—এই কথা বিবেচনা করিলে উৎপাদনের মনুষ্য-শক্তি ও শ্রমের উপকরণে (human apparatus) ধ্বংসের ভয়াল ছবি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

ইহার সহিত এ ঘটনাও মনে রাখা দরকার যে, যুদ্ধের সময়ে অত্যন্ত দক্ষ কারিগরদের স্থলে এই রকম লোকই নিযুক্ত হইয়াছিল যাহাদের কোনো প্রকার দক্ষতাই নাই। যোগ্য শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল।

শ্রমজীবী বিপুল জনসাধারণের উপর দিয়া মহাযুদ্ধ নিদারুণ উৎপীড়নের দুঃসহ প্রবাহ বহাইয়া দিয়াছিল। সামরিক পোশাকে সজ্জিত শ্রমিক ও কৃষকরা যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের খোরাক রূপে পরিণত হইয়াছিল। সেখানে তাহাদের জন্য সঞ্চিত ছিল মৃত্যু ও অসহ্য নির্য্যাতন, আর যে সব শ্রমিক ছিল রণক্ষেত্রের পশ্চাতে তাহারাও নিম্নতম মজুরীর বিনিময়ে অনশনে থাকায় ও অবসন্ন হইয়া না পড়া পর্য্যন্ত কারখানায় কারখানায় কাজ করিত। সামরিক একনায়কত্বের আওতায় শ্রমিকদের যে কোনো রকমের অসন্তোষ প্রকাশই নির্ম্মম ও অমানুষিক ভাবে দমন করা হইত। রণক্ষেত্রের পশ্চাতে কর্ম্মরত শ্রমিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইবার আশঙ্কার মধ্যেই নিয়ত কাল কাটাইতে হইত। সেখানে অপেক্ষা করিত মৃত্যু বা অঙ্গহানি। মহাযুদ্ধের সময়ে জনসাধারণের ভাগ্যে ছিল অনশন।

মহাযুদ্ধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সকল বিরোধের **তীব্রতা চরমে তুলিয়াছিল**। শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের আভ্যন্তরীণ ব্যবধানও বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছিল মহাযুদ্ধই। তাহারই ফলে উৎসন্ন হইয়াছিল বিপুল কৃষক সাধারণ। মহাযুদ্ধ অফিসের কর্ম্মচারী ও পাতি বুর্জোয়াদের দারিদ্র্য ডাকিয়া আনে। এবং এই ভাবে তাহাদের অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তোলে।

"মহাসমর ছিল উভয়তই সাম্রাজ্যবাদী। বিদেশী ভূভাগ দখল, ক্ষুদ্র জাতিসমূহের শ্বাসরোধ' করিয়া হত্যা করা, দুনিয়াব্যাপী আর্থিক

আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, উপনিবেশসমূহের ভাগবাঁটোয়ারা ও পুনর্বিভাগ, বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদিগকে প্রতারিত ও তাহাদের ঐক্য বিচ্ছিন্ন করিয়া পতনোন্মুখ পুঁজিবাদী শাসন জিয়াইয়া রাখায় উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিল জার্মান ও ইঙ্গ-ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী উভয়েই।" *

সাম্রাজ্যবাদের অবিচ্ছিন্ন বিকাশের পরিণতিই হইল এই মহাসমর। মহাযুদ্ধ প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, অবশেষে পুঁজিবাদ মনুষ্য সমাজের অধিকতর অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুঁজিবাদের তমসাচ্ছন্ন গর্ভতলে মানুষের ভবিতব্যের জন্য যে কী ভীষণ বিপদ লুক্কায়িত আছে তাহাই উদ্‌ঘাটন করিয়াছে মহাসমর।

মহাসমরের পরিণাম ও পুঁজিবাদের ব্যাপক সংকট

পুঁজিবাদে ব্যাপক সঙ্কটের আরম্ভকাল হইল সাম্রাজ্যবাদী মহাসমরে (১৯১৪-১৮)। পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সুরু হইল। অক্টোবর বিপ্লব রুশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী ব্যূহমুখ ভেদ করিল। হীন প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি জারপন্থী রুশীয়ার স্থানে আবির্ভূত হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রসমূহ। দুনিয়ার একষষ্ঠাংশকে পুঁজির আধিপত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক নূতন দেশে রূপান্তরিত করা হইল। সেই দেশেই গড়িয়া তোলা হইতেছিল সমাজতন্ত্রবাদ। অক্টোবর বিপ্লবই হইল সর্ব্বহারার আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রারম্ভ। পৃথিবীকে ইহা **দুইটি শিবিরে** বিভক্ত করিল—পুঁজিবাদের শিবির এবং আরব্ধগঠন (under construction) সমাজতন্ত্রবাদের শিবির। পুঁজিবাদের কাঠামোতে প্রথম বিস্তৃত ফাটল ধরাইয়াছে মহাসমরই। পূর্ব্বের সর্ব্বব্যাপী পুঁজি-

* ঐ ২০শ খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৯

বাদের স্থানে এখন সম্পূর্ণ বিরোধী দুইটি ব্যবস্থাবিধান—পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতন্ত্রবাদী ব্যবস্থা সংগ্রাম করিতেছে।

অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ফলে, পুঁজিবাদ যে পৃথিবী শাসনকারী একমাত্র প্রচলিত সামাজিক বিধান—এ কথার আজ অবসান ঘটিয়াছে। তাহারই পার্শ্বে গড়িয়া উঠিয়াছে এক নূতন ব্যবস্থা এক নূতন বিধান—সমাজতন্ত্রের প্রাণবন্ত বিধান। জগতের সর্ব্বহারার জন্মভূমি হইল সোভিয়েট সঙ্ঘ। বর্ত্তমান যুগ হইল পুঁজিবাদের **পতন ও ধ্বংসের যুগ**, সর্ব্বহারার বিশ্ববিপ্লব এবং **সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার যুগ**।

বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর মানচিত্র নূতন করিয়া আঁকিয়াছে, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে শক্তিসম্পর্কের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছে। সর্ব্বহারা বিপ্লব পৃথিবীর একষষ্ঠাংশে জয়ী হইয়াছে, তাহাকে পুঁজির রক্তনখর হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছে, মুক্ত করিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর যে অবশিষ্টাংশ আজও পুঁজিবাদের কবলে রহিয়াছে সেখানেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

মহাসমরে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের জাতীয় অর্থব্যবস্থার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল মহাসমরই। বিজয়ী দেশসমূহ—মিত্রপক্ষ যুদ্ধব্যয়ের সমগ্র বোঝাই চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল বিজিত দেশসমূহের মাথায়। বিজিত দেশসমূহের মধ্যে কিন্তু একমাত্র জার্মানির নিকট হইতেই সামান্য কিছু আদায় করা সম্ভব ছিল, কারণ জার্মানির সহযোগী দেশসমূহের (অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী, তুরস্ক এবং বুলগেরিয়া) অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। মিত্রপক্ষের প্রধান শত্রু ছিল জার্মানি। জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সহিত প্রতিযোগিতাই গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী শাসকমণ্ডলীকে যুদ্ধে নামাইয়াছিল। কাজেই বিজয়ীদের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল জার্মানির সহিত বুঝাপড়া করা, সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের তালিকা হইতে তাহাকে

অপসারিত করা, দীর্ঘকালের জন্য তাহার অর্থনৈতিক বিকাশ প্রতিরুদ্ধ বা ব্যাহত করিয়া তাহার প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করা। সেই সঙ্গে আরও প্রয়োজন ছিল যুদ্ধের বৃহত্তম অংশ জার্মানির ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ায়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভার্সাই-এ যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তাহাতে জার্মানিকে সর্ব্বস্বান্ত করার অনেক ব্যবস্থাবিধান ছিল। জার্মানির কয়েকটি অঞ্চল কাড়িয়া লওয়া হইল, কয়লা আর লৌহে সমৃদ্ধ অঞ্চল পাইল ফ্রান্স; জার্মানির বানিজ্যপোত বহরও ছাড়িয়া দিতে হইল মিত্রপক্ষের হাতে; আপনার সীমানার বাহিরে অবস্থিত উপনিবেশ সমূহ ও অধিকৃত ভূভাগের স্বত্বও তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল। সর্ব্বোপরি এবং ইহাই হইল চরম গুরুত্বপূর্ণ—যুদ্ধের দরুণ মিত্র পক্ষের যে সব ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহা পূরণের জন্য জার্মানির উপর কর (ক্ষতিপূরণ) ধার্য্য হইল। ভার্সাই-এ ইহার পরিমাণ ধার্য্য হইয়াছিল দুই হাজার তিন শত তেইশ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা; সন্ধি অনুসারে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে কয়েক বৎসরের কিস্তিতে বলিয়া ঠিক হইল।

ভার্সাই-এর এই জোচ্চরী শান্তির দ্বারা জার্মানি লুণ্ঠনের ফলে যুদ্ধে লিপ্ত সকল দেশের মধ্যে জার্মানি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিধ্বস্ত দেখিতে পাইল (অবশ্য ক্ষুদ্র অষ্ট্রীয়া বাদে। আমেরিকার সাহায্যই তাহাকে নিদারুণ অনশনের হাত হইতে রক্ষা করে)।

বিজয়ী দলের শক্তিসম্পর্কেরও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল মহাসমর। যুদ্ধের দরুণ সর্ব্বাপেক্ষা লাভবান হইয়াছিল যুক্তরাষ্ট্র; কারণ সামরিক কার্য্যকলাপে নিতান্ত নগণ্য অংশ গ্রহণ করিয়া সকলরকম সামরিক সরবরাহে প্রভূত পরিমাণ মুনাফা করিয়াছিল সে-ই। যুদ্ধের ফলে অস্ত গেল বৃটিশ পুঁজিবাদের সূর্য্য। পৃথিবীর বাজারে গ্রেট বৃটেন প্রধান্য খোয়াইল; তরুণ প্রতিযোগী যুক্তরাষ্ট্রকে আসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। যুক্তরাষ্ট্র

এবং গ্রেট বৃটেনের মধ্যে বিরোধই হইল মূল কেন্দ্র আর তাহারই চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে সমগ্র যুদ্ধোত্তর যুগের সাম্রাজ্যবাদী বিরোধসমূহ।

যে যুদ্ধে আমেরিকার পুরাতন প্রতিযোগীরা (প্রধাণত গ্রেট বৃটেন ও জার্মানি) পরস্পরের গলা কাটিতেছিল সেই যুদ্ধ হইতেই প্রভূত সুবিধা আদায় করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী বলিয়া আমেরিকা নিজেকে প্রমাণিত করিল।

যুদ্ধরত দেশসমূহ যুদ্ধের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা—পর্ব্বতপ্রমাণ কয়লা, লোহ, ইস্পাত, রুটি, তৈল এবং বস্ত্র নিজেরা আর পূরণ করিতে পারিতেছে না। এই বিপুল পরিমাণ চাহিদা আসিল আমেরিকার দুয়ারে। আবার একই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকা, এসিয়া প্রভৃতির কৃষিপ্রধান দেশসমূহে কারখানাজাত দ্রব্যের বাজারও হইয়া পড়িল উন্মুক্ত। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই সব দেশে গ্রেট বৃটেন, জার্মানি এবং অন্যান্য ইওরোপীয় দেশ তাহাদের মাল রফ্‌তানি করিত। যুদ্ধের সময়ে এই সব দেশের রফ্‌তানির কোনো কথাই উঠিতে পারে নাই। এই সবের ফলে শিল্প ও কৃষির এক অভূতপূর্ব্ব বিকাশ সাধিত হয় যুক্ত-রাষ্ট্রে। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ধনী দেশে পরিণত হয় আমেরিকা। মহাসমর বিশ্ব-পুঁজিবাদের ভারকেন্দ্র ইওরোপ হইতে আমেরিকায় স্থানান্তরিত করিল।

যুদ্ধের পূর্ব্বে শিল্প যুক্তরাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থায় প্রধান স্থান অধিকার করে নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র ৩ শত কোটি টাকার কৃষিজাত দ্রব্য রফ্‌তানি করিয়াছিল এবং শিল্পজাত দ্রব্য করিয়াছিল মাত্র ১ শত ৩৮ কোটি টাকার। যুদ্ধের মধ্যে অতুলনীয় দ্রুততালে বিকাশ লাভ করিল শিল্প। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পসমূহ সর্ব্বমোট ৭ হাজার ২ শত ৭৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার পণ্য উৎপাদন করিয়াছিল এবং ১৯১৮

খৃষ্টাব্দেই উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছিল ১৮ হাজার ৮ শত ৭৪ কোটি টাকা।

যুদ্ধের সময়ে বয়নশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ৪০ ভাগ, ইস্পাত ৪০ ভাগ, কয়লা ও তামা ২০ ভাগ, দস্তা ৮০ ভাগ, তৈল ৪৫ ভাগ। ১৯১৩ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রগামী বাষ্পীয় পোতের নির্ম্মাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল প্রায় দশগুণেরও বেশী, মোটর গাড়ীর নির্ম্মাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল দ্বিগুণ। যুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্র শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত হইয়া কারখানাজাত দ্রব্য রফ্‌তানী করিতেছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে কারখানাজাত দ্রব্য রফ্‌তানি করিয়াছিল ৬ শত ২১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার আর ভোগের উপকরণ ও কাঁচামাল রফ্‌তানি করিয়াছিল ৪ শত ২২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার।

তবুও যুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিরও উন্নতি হইয়াছিল। ১৯১৩ ও ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফসল বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ১২ ভাগ এবং গবাদি পশুর সংখ্যা আরও বেশী।

মহাসমর যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা **বিত্তবসম্পন্ন জাতিতে** রূপান্তরিত করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে গ্রেট বৃটেন ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদশালী দেশ; পুঁজিবাদী জগতে সে ছিল নেতৃস্থানীয়,। আমেরিকা সমেত সকল দেশেই ছিল তাহার পুঁজি—সকলেই ছিল গ্রেট বৃটেনের নিকট ঋণী। বৃটিশ মুদ্রা—পাউণ্ড স্টার্লিং—পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাধিক স্থিতিশীল (stable) মুদ্রা বলিয়া বিবেচিত হইত; বৃটিশ পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস (depreciation) প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হইত। মহাসমর সবই পাল্টাইয়া দিল; গ্রেট বৃটেন মহাসমরে স্বীয় সম্পদের বৃহত্তম অংশ হারাইয়া দ্বিতীয় স্থানে নামিয়া আসিল, আর একদিকে যুক্তরাষ্ট্র বিপুল সম্পদশালী হইয়া উঠিল।

১৯১৫ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের রফ্‌তানির পরিমাণ তাহার আমদানির পরিমাণ অপেক্ষা ৫ হাজার ৪ শত কোটি টাকা বেশী হইল। অর্থাৎ ইওরোপের যুধ্যমান জাতিসমূহের নিকট হইতে সে যে-পরিমাণ মাল লইয়াছে তাহা অপেক্ষা ৫ হাজার ৪ শত কোটি টাকার মাল তাহাদের বেশী দিয়াছে। এই বিপুল অর্থ কি ভাবে শোধ করা হইয়াছিল? ইহার বিনিময়ে আমেরিকা কি পাইয়াছিল?

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রে ইওরোপীয় পুঁজিপতিদের যে সব প্রতিষ্ঠান ছিল তাহা আমেরিকান মালিকদের হাতে চলিয়া যায়। একটা বেশ বড় অংশ, ৯০০-১৫০০ কোটি টাকা এইভাবে শোধ হইল। অধিকন্তু, পৃথিবীর মজুদ সোনার (gold reserve) অর্দ্ধেকের বেশী অংশ পুঞ্জিত হয় আমেরিকায়; যুধ্যমান জাতিসমূহ নিজেদের সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ সামরিক সামগ্রী ও ভোগ্যবস্তু যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে পাইতেছিল তাহার বিনিময়ে নিজেদের মজুদ সোনা আমেরিকার হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। সর্ব্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট মিত্রপক্ষের ঋণের পরিমাণ বিরাট অঙ্কে পৌঁছায়—৩ হাজার কোটি টাকা। যুক্তরাষ্ট্রের নিকট গ্রেট বৃটেনের দেনা হয় ২ হাজার ১শত ৭০ কোটি টাকা; আবার খাতকদের নিকট হইতে গ্রেট বৃটেনের পাওয়ারও কথা ছিল ২ হাজার ৮০ কোটি টাকা। যুদ্ধ-ঋণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ১৯২৩ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহার ফলে যুক্ত রাষ্ট্রের নিকট পূর্ব্বতন মিত্র পক্ষের ও অন্যান্য দেশের ঋণের পরিমাণ স্থির করা হয় (সঞ্চিত সুদ সমেত) ৩ হাজার ১ শত ২০ কোটি টাকা। গ্রেট বৃটেনের পূর্ব্বতন মিত্রদের ঋণ এমন ভাবে হ্রাস করা হয় যাহার ফলে তাহাদের দেয় অর্থের পরিমাণকে সমান করিয়া আনা হইল বৃটেন কর্ত্তৃক যুক্তরাষ্ট্রকে দেয় অর্থের সহিত।

এক জার্মানির দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ প্রথমত ঠিক হইয়াছিল ৭ হাজার ৫ শত ৮০ কোটি টাকা। এই সম্পর্কে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ডায়েস পরিকল্পনা (Dawes plan) গৃহীত হয়, তদনুসারে জার্মানির দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনির্দ্ধারিত থাকে, কিন্তু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বার্ষিক ১ শত ৬২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা জার্মানিকে দিতে বাধ্য করা হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ডায়েস পরিকল্পনাকে রহিত করিয়া ইয়ং পরিকল্পনা (Young plan) গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনায় নির্দ্ধারিত হয় যে, ৫৯ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে ১ শত ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা করিয়া জার্মানি দিবে। ইয়ং পরিকল্পনা মাত্র ১ বৎসর ১০ মাস কার্য্যকরী ছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তথাকথিত হুভার "মুলতুবী-বিধি" (Hoover Moratorium) চলিত হইয়া এক বৎসরের জন্য যুদ্ধঋণ পরিশোধ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান স্থগিত রাখে।

এই কালের গোটা সময়টা ধরিয়া জার্মানি কর্ত্তৃক প্রদত্ত নগদ ক্ষতি পূরণের মোট পরিমাণ হইল ৮ শত ৩৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

জার্মানির দেয় ক্ষতিপূরণ ও বিশ্বযুদ্ধের দরুণ মিত্রপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক দেনা সমরোত্তর পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী দেশ সমূহের শিবিরে ইহাই ছিল ঝগড়া আর সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান কারণ ও তীব্রতম বিরোধের জটিল গ্রন্থির অন্যতম। ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র অবলম্বন করিল হস্তক্ষেপ-না-করার নীতি: তাহাদের মতে ইহা হইল ইওরোপীয়দের ঘরোয়া ব্যাপার; ইহার সহিত আমেরিকানদের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু মিত্র-পক্ষের নিকট হইতে নিজের পাওনা আমেরিকা আরও দৃঢ়ভাবে দাবী করিতে লাগিল।

অর্থনৈতিক সঙ্কট সংঘটনের ফলে ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য ঋণ

পরিশোধ কার্য্যত বন্ধ হইয়া যায়। ইহা স্বতসিদ্ধ যে, ঋণ পরিশোধ এইরূপ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার সম্পর্ক আরও অধিক মাত্রায় তিক্ত হইয়া উঠে।

পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের তিনটি পর্য্যায়

পুঁজিবাদের পতন এক সমগ্র ঐতিহাসিক যুগ ধরিয়া চলে। ইহাই হইল আন্তর্জাতিক সর্ব্বহারার পক্ষে স্বীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবী সংগ্রামের যুগ।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, ১৯১৮ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কয়েকটি বৎসর হইল সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্রুত ভাঙ্গনের এবং সর্ব্বহারা ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ভীষণ সংগ্রামের কাল; কোনো কোনো দেশে এই সংগ্রাম প্রকাশ্য অন্তর্বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করে। যুদ্ধের দরুণ ধ্বংসের ফলে অপরিমিত প্রাণহানি ও সম্পদহানির ফলে অতুলনীয় অর্থনৈতিক সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল। পুঁজিবাদের সমস্ত বিরোধ পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। জনসাধারণের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বের দুর্দ্দশাতেই নিমজ্জিত রহিল, তাহাদের অসন্তোষ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। মধ্য ইওরোপীয় দেশ সমূহে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া কয়েক মাস টিকিয়া থাকিল এবং ব্যাভেরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রও কয়েক সপ্তাহ মাত্র বাঁচিয়াছিল। ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে এক শোচনীয় অর্থনৈতিক সঙ্কট পুঁজিবাদী দেশগুলিকে চাপিয়া ধরার ফলে বিরোধসমূহ আরও প্রখর ও প্রকট হইয়া উঠে।

সোভিয়েট রুশিয়া এই কয় বৎসর প্রতিবিপ্লবী রুশ শ্বেত-রক্ষীদের (White-guards) এবং আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছিল। অন্তর্বিপ্লবের অবসান হইল সোভিয়েট শক্তির

বিজয় ও সংহতিলাভে, বহিরাক্রমণের সকল প্রচেষ্টার পরাজয় ঘটিল অজেয় সর্ব্বহারা বিপ্লবের দুর্জ্জয় শক্তির হাতে। সাম্যবাদী আন্তর্জ্জাতিক (Communist International)—বিশ্ববিপ্লবের সেনানী মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইল। বহু পুঁজিবাদী দেশে এই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গড়িয়া উঠিল; বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের যে পতাকা দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা ধূলিতলে পদদলিত ও রক্তশিক্ত হইতেছিল তাহাকেই ইহারা উড়াইল বিজয় গৌরবে।

বিশ্বাসঘাতক সোশাল-ডেমোক্রাট নেতৃমণ্ডলীর সহায়তায় বুর্জোয়া শ্রেণী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে এবং তাহার প্রতিরোধ দূর করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জার্মান বুর্জোয়ারা পুনরায় সেই দেশের বিপ্লবী সর্ব্বহারাদের পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রথম যুগ এই ভাবে একদিকে সোভিয়েট সঙ্ঘে সোভিয়েট শক্তির বিজয়ে এবং অপর দিকে, পশ্চিম ইওরোপীয় সর্ব্বহারাদের সাময়িক পরাজয়ে শেষ হইল।

শ্রমিক শ্রেণীকে পরাভূত করিবার পর পশ্চিম ইওরোপীয় বুর্জোয়ারা আক্রমণ আরম্ভ করিল। এইরূপে **দ্বিতীয় যুগ**—পুঁজিবাদী দেশে ধীরে ধীরে আংশিক স্থিতিশীলতার (stablisation) আবির্ভাবের যুগ সুরু হইল। পুঁজিবাদী শিবিরে কিছু পরিমাণ "পুনর্গঠন"—যুদ্ধজনিত ধ্বংসের ফলে যাহার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা সাধিত হয়। পক্ষান্তরে, এই যুগ হইল সোভিয়েট সঙ্ঘের জাতীয় অর্থব্যবস্থা দ্রুত পুনর্গঠনের এবং সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের চরমতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের যুগ।

শ্রমিক-সাধারণের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া বুর্জোয়ারা বিশ্বযুদ্ধজনিত গভীর ক্ষত এবার সারিতে আরম্ভ করে। এই সব ক্ষত আরোগ্যের বুর্জোয়া পন্থা হইল সাম্রাজ্যবাদী হত্যাকাণ্ড হইতে উদ্ভূত সমস্ত

গুরুভার শ্রমিক শ্রেণীর কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া। শ্রমিকদের জীবনধারণের মান অবিশ্বাস্য মাত্রায় হ্রাস করিয়া বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদের সাময়িক ও আংশিক স্থিতিশীলতা লাভ করিল। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলার ফলে মুদ্রা-সঞ্চালন (money circulation) সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইলে পর কোনো কোনো দেশে তাহাকে পুনঃস্থিতিশীল করা হয়। বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী সংহতির পদ্ধতি (rationalization methods) কার্য্যকরী করিতে আরম্ভ করিল। পুঁজিবাদী আওতায় সংহতির অর্থ হইল শ্রমিক শোষণের হারের প্রভূত বৃদ্ধি। সংহতি গঠনকারীদের প্রবর্ত্তিত যন্ত্র সংক্রান্ত নূতন ব্যবস্থার সাহায্যে ইহা সাধিত হয়। পুঁজিবাদী সংহতি শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইয়া নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস করে। শ্রমিকদের কিয়দংশকে পথে বসানো হয়, তাহাদের আর কাজ পাওয়ার অনুমাত্র আশাও থাকে না। নিয়োজিত অবশিষ্ট শ্রমিকরা পূর্ব্ব হইতে দুই তিন গুণ তীব্রভাবে কাজ করিতে বাধ্য হয়; পুঁজির কল্যাণ সাধনে তাহাদের সমগ্র শক্তি নিঃশেষিত হয়।

পুঁজিবাদের আংশিক স্থিতিশীলতা সাধিত হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা কেবল সাময়িক, পতনোন্মুখ এবং ঘুণে ধরা জীর্ণ। পুঁজিবাদের বিরোধ সমূহের সমাধান করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হওয়ায় ইহা সমসাময়িক পুঁজিবাদের কোনো কোনো বিরোধের পরিণতিকে কেবল অতি অল্প সময়ের জন্যই কিছুটা নিস্তেজ করিয়া দিতে পারে। পক্ষান্তরে তাহারা এই সব বিরোধ বৎসর বৎসরই অধিকতর তীব্রভাবে নিজেদের মধ্যে অনুভব করে।

বিভিন্ন দেশের বিকাশে অসমতার বৃদ্ধি এই স্থিতিশীলতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধজনিত ধ্বংসের পর কোনো কোনো দেশ কম-বেশী দ্রুততার সহিত নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে সক্ষম হইল। পক্ষান্তরে

অন্যান্যরা পিছনে পড়িয়া রহিল। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে মুদ্রা-বিধানকে (currency) করা হইল আপেক্ষিক ভাবে স্থিতিশীল। উৎপাদন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনও সুরু হইল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে। অনতিকাল পরেই যে সমস্ত বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে স্থিতিশীলতার যুগের বিকাশে অসমতা তাহাদের অন্যতম কারণ।

পুঁজিবাদের সাময়িক স্থিতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে, সোভিয়েট সঙ্ঘের অর্থব্যবস্থার পুনর্গঠন দানবীয় দীর্ঘপদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং তৎপরিবর্ত্তী গৃহযুদ্ধের ফলে দেশের অর্থব্যবস্থায় যে ক্ষত সৃষ্ট হইয়াছিল, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার নিরাময় করা হইল স্বাধীনভাবে এবং বাহিরের সাহায্য না লইয়াই। সোভিয়েট সঙ্ঘের শক্তির সংহতি ও বৃদ্ধি পুঁজিবাদের ব্যাপক সঙ্কটকে আরও ব্যাপক ও শোচনীয় করিয়া তুলিল।

সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শোষিত ঔপনিবেশিক দেশসমূহ শোষণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উঠিয়া দাঁড়াইল। সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও চীনের বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদীদের আজও বিশ্রাম দিতেছে না। ভারতবর্ষে এবং বৃটিশ ও ফরাসী পুঁজির অপরাপর ঔপনিবেশিক দেশে বিপ্লবী আন্দোলন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের বিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে, তীব্রতর হইতেছে। আমেরিকায় পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভারকেন্দ্রের অপসারণ, বিশ্বশোষকরূপে যুক্তরাষ্ট্রের রূপান্তর গ্রহণ, আমেরিকান এবং ইওরোপীয়, প্রধানত বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক বিশেষ তীব্র ও তিক্ত করিয়া তোলে। আমেরিকা ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে বিরোধসমূহকে কেন্দ্র করিয়াই বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী রেষারেষি আবর্ত্তিত হইতেছে। কোনো কোনো দেশে পুঁজিবাদী শিল্প যুদ্ধের আগের কালের মত সামর্থ্যে ও শক্তিতে উন্নত হওয়ায় (১৯২৭-২৮) বাজারের জন্য রেষারেষি অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠে।

পুঁজিবাদের যুদ্ধোত্তর ব্যাপক সঙ্কটের **তৃতীয় যুগ** উপস্থিত হইল। সমসাময়িক পুঁজিবাদের মৌলিক বিরোধ সমূহকে চরম তীব্র করাই এই যুগের বিশেষত্ব। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের তুলনায় বিশ্ব-অর্থব্যবস্থা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে উৎপাদন করে: তৈল—শতকরা ৩০০ ভাগ; লৌহ—১০২ ভাগ; ইস্পাত—১২৭ ভাগ; তুলা—১২৫ ভাগ; গম—১১০ ভাগ; রাই (Rye রুশিয়া ও জার্মানির প্রধান খাদ্য, একপ্রকার রবিশস্য)—৯৫ ভাগ। পরবর্ত্তী বৎসরে, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে, নানাবিধ পণ্যের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মহাসমরের প্রায় দশ বৎসর পরেই **পুঁজিবাদ তাহার প্রাকযুদ্ধ সীমা** (Limits) **অতিক্রম করিল**। সঙ্গে সঙ্গেই নিজ নিজ দেশের এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে পুঁজিবাদী বিরোধের অসাধারণ বৃদ্ধি ঘটিল। পুঁজিবাদের ব্যাপক সঙ্কটের বিকাশের তৃতীয় যুগ হইল পুঁজিবাদের আংশিক ও সাময়িক স্থিতিশীলতার বিপর্য্যয়ের যুগ। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সুরু হয় দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং পুঁজিবাদী দেশসমূহের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তোলে। এই পরিস্থিতিতে অবশেষে উপস্থিত হইল পুঁজিবাদী স্থিতিশীলতার সমাপ্তি। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে অনুষ্ঠিত সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকের কর্ম্মপরিষদের (E.C.C.I.) দ্বাদশ অধিবেশনের প্রস্তাবে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে।

বুর্জোয়াশ্রেণী কর্ত্তৃক শ্রমিক শ্রেণী শোষণের এক অভূতপূর্ব্ব বৃদ্ধি পুঁজিবাদী সংহতি সঙ্গে করিয়া আনে। এই সংহতি শ্রেণী-বিরোধকে চরমে তোলে। পুঁজিবাদের আওতায় সংহতির ফলে অনেক সাবেকী ধরনের প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট কল কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যাও হ্রাস পায়। **স্থায়ী বেকার সমস্যা** দেখা দেয়। অত্যন্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহের কোনো কোনোগুলিতে পর্য্যন্ত শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সমৃদ্ধতম পুঁজিবাদী দেশে পর্য্যন্ত—সংস্কারপন্থীরা যাহাকে বলে "ভূস্বর্গ"—সেই যুক্তরাষ্ট্রেও ১৯১৯ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। শিল্প, কৃষি এবং রেলপথে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল শতকরা ৭ ভাগ, উৎপাদন বাড়িয়াছিল শতকরা ২০ ভাগ; শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়াছিল শতকরা ২৯ ভাগ। এই কয় বৎসরে এই সব ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়াছিল প্রায় ২০ লক্ষ। ইহাদের কিয়দংশ ব্যবসায় ও চাকুরীতে নিযুক্ত হইলেও অধিকাংশই কিন্তু বেকার রহিয়া যায়।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় জার্ম্মানিতে বেকারের সংখ্যা ৩ কোটির কম ছিল না। পুঁজিবাদী সংহতির শেষ কয় বৎসরে এক স্থায়ী মজুদবাহিনী বাড়িয়া উঠিতেছিল। এই বাহিনীর সংখ্যা শিল্প পুনরুজ্জীবনের সময়ে পর্য্যন্তও ১৫ হইতে ১০ লক্ষের নীচে কখনও নামে নাই। ইহার মধ্যে ৫ হইতে ১০ লক্ষ লোক ছিল স্থায়ী ভাবে বেকার আর তাহাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। পুঁজিবাদী সংহতির ফলে প্রকৃত বলি হইল ইহারাই; উহাই ইহাদের সমস্ত শক্তি শোষণ করিয়া লইয়া ইহাদের পথে বসাইয়াছে।

প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশে সংহতির ফলে যাহারা কাজ হারাইয়াছে এমন বেকারের মোট সংখ্যা ছিল ১ কোটি। ইহা প্রায় মহাসমরে নিহতদের ঠিক সমান সংখ্যা। মহাসমরের বলির ন্যায় ইহারাও পুঁজিবাদ কর্ত্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত; একমাত্র পার্থক্য হইল এই যে, "শান্তিকালে" পুঁজিবাদীর বলি মৃত্যুকবলিত হয় ধীরে ধীরে।

যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য বাড়িতে থাকে, শ্রমিকরা কাজ হারায় কিন্তু উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণও সেই সঙ্গে বাড়ে বিপুল পরিমাণে। **উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ ভীষণ ভাবে বাড়িয়া**

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আভ্যন্তরীণ বাজারও সঙ্কুচিত হয়; কারণ বাজার নির্ভর করে বিশাল জনসাধারণের সঙ্গতির উপরে। উৎপাদনের বৃদ্ধির বিরোধ বাধে জনসাধারণের ব্যবহারের (consumption) পরিমাণ হ্রাসের সহিত। বিক্রয়ের অসুবিধা বাড়িয়া **বিদেশী বাজারের** জন্য বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিদের এক **নৃশংস সংগ্রামে অবতীর্ণ** হইতে বাধ্য করে।

উৎপাদন শক্তির বিকাশ ও বাজার সঙ্কোচনের বিরোধ-অসঙ্গতি বিশেষ ভাবে তীব্র হইয়া উঠে তৃতীয় যুগে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যাপক সঙ্কটের পরিবেশে পুঁজিবাদী দেশসমূহকে ছিন্নভিন্ন করিয়া আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য বিরোধসমূহ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। তৃতীয় যুগই ডাকিয়া আনে সর্ব্ববিধ্বংসী সঙ্কট ও নূতন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ক্রমবর্দ্ধমান আশঙ্কা।

এই একই সময়ে সোভিয়েট সঙ্ঘে পুনঃসংস্কারের (restoration) যুগ পুনর্গঠনের যুগে রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ করে। পুনর্গঠনের বিরাট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে সুরু হয়। জাতীয় অর্থব্যবস্থার পুনর্গঠন, সমাজতান্ত্রিক শিল্পের অপরিসীম বৃদ্ধি, যৌথ ব্যবস্থার ভিত্তিতে কৃষির মৌলিক পরিবর্ত্তন—এই সমস্তই হইল পৃথিবীর একষষ্ঠাংশব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার চিহ্ন। মুমূর্ষু পুঁজিবাদ ও দ্রুত বিকাশমান সমাজতন্ত্রবাদ—এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামকে তীব্রতর করিয়া তোলে তৃতীয় যুগ। যে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপক সঙ্কট পুঁজিবাদী দেশসমূহের ভিত্তিভূমি বিক্ষুব্ধ করিয়াছে তাহারই পটভূমিকায় যখন সোভিয়েট সঙ্ঘে সমাজতন্ত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন পুঁজিবাদের শোচনীয় নৈরাশ্যজনক অবস্থা ও সমাজতন্ত্রবাদের সমুদয় সুবিধাবলী বিশেষ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

আংশিক স্থিতিশীলতার কালে নগণ্য বুর্জোয়া লেখকরা এবং

সোশাল-ডেমোক্রাটরা সকল উপায়ে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে যে, পুঁজিবাদ যুদ্ধজনিত ক্ষত সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়াছে এবং যুদ্ধোত্তর সঙ্কটকেও সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিয়াছে। জোর গলায় তাহারা ঘোষণা করিত যে, পুঁজিবাদ শক্তি ও প্রাণপ্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ, আর তাহার সম্মুখে রহিয়াছে উজ্জ্বল ভবিষ্যত। সোশাল-ডেমোক্রাটরা বলিয়া বেড়াইত যে, পুঁজিবাদী সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতার এক যুগ উপস্থিত হইয়াছে : সুব্যবস্থিত পুঁজিবাদের মহাযুগ সমুপস্থিত—সংঘাত, সমর বা সঙ্কটের আর ভয় নাই।

কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরকার সুবিধাবাদীরাও বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থকদের এই প্রলাপ বাক্য অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্নভাবে বলিয়া বেড়াইত। **দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা** সোশাল-ডেমোক্রাটদের সুব্যবস্থিত পুঁজি-বাদের যুক্তি আওড়াইত। দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় যুগে বিবর্ত্তনের কালে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, এই তৃতীয় যুগ পুঁজিবাদী স্থিতিশীলতার শেষ যুগ নহে, বরং ইহার দৃঢ়তা সম্পাদনের যুগ। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা আমেরিকান “অনন্যসাধারণতার” তত্ত্ব সৃষ্টি করিয়া আমেরিকার সমৃদ্ধির রূপকথা সমর্থন করিত এবং প্রচার করিত যে, পুঁজিবাদের ব্যাপক সঙ্কট হইতে আমেরিকা মুক্ত রহিয়াছে। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের মতে পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা স্থায়ী এবং অটল। ট্রট্স্কি-পন্থীরা বরঞ্চ প্রথমে দুই চারটি “বামপন্থী” শব্দসম্ভারে পুঁজিবাদী স্থিতিশীলতার আলোচনা শেষ করিয়া ইহার গুরুত্ব অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু অচিরেই তাহারা পুঁজিবাদী স্থিতিশীলতার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়ত্বের গুণগানকারী পূর্ব্বোক্ত দলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইল। বর্ত্তমান বিশ্বসঙ্কটের অস্তিত্ব অধিকাংশ বুর্জোয়া রাজনীতিক স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও কিন্তু দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা ও ট্রট্স্কি-পন্থীরা তাহার প্রাদুর্ভাবকে স্বীকার করিতে চাহে নাই।

আংশিক স্থিতিশীলতার সময়েই কিন্তু সোভিয়েট সঙ্ঘের কমিউনিস্ট পার্টি ও সাম্যবাদী আন্তর্জাতিক (Comintern) নূতন সঙ্কটের আবির্ভাবের অবশ্যম্ভাবিতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। যে আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতিসমূহ আধুনিক পুঁজিবাদে অনিবার্য্যরূপে আবির্ভূত হইতে বাধ্য সেই সবের মার্ক্স্‌বাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাদের আলোচনা। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েট সঙ্ঘের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চদশ অধিবেশনে তাঁহার বিবরণীতে স্টালিন বলিয়াছিলেন যে, "পুঁজিবাদের বর্দ্ধমান সঙ্কটের জন্ম হয় স্থিতিশীলতা-বিধান হইতেই।" তিনি বলিয়াছেন ঃ

"অনেক আগে চতুর্দ্দশ অধিবেশনের বিবরণীতেই ইহা বর্ণিত হইয়াছিল যে, পুঁজিবাদ আবার তাহার প্রাক্‌যুদ্ধ স্তরে উপনীত হইতে পারে, প্রাক্‌যুদ্ধ-স্তর অতিক্রম করিতে পারে, ইহার উৎপাদন সুসংহত করিতে পারে, কিন্তু সেইজন্য ইহার অর্থ এই নহে—কোনো ক্রমেই নহে যে, ইহার ফলে পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা স্থায়ী হইতে পারে, পুঁজিবাদ তাহার প্রাক্‌যুদ্ধ কালের স্থিতিশীলতা পুনরায় লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে, ইহার স্থিতিশীলতা হইতেই; উৎপাদন প্রসারিত হয়—এই ঘটনা হইতে; দুনিয়ার বাজার, এই বাজারের সীমাবদ্ধতা এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী মণ্ডলীর প্রভাবাধীন এলাকা কম-বেশী অপরিবর্ত্তিত থাকায় বানিজ্য যে বিকাশলাভ করে এবং যান্ত্রিক উন্নতি ও উৎপাদন ক্ষমতা যে বৃদ্ধি পায় ইহা হইতে, বিশ্বপুঁজিবাদের গভীরতম ও তীব্রতম সঙ্কটের উদ্ভব হইতেছে। নূতন মহাসমরের সম্ভাবনাপূর্ণ এই সঙ্কট আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে যে-কোনো স্থিতিশীলতা-বিধানের অস্তিত্বকেই। আংশিক স্থিতিশীলতা হইতে সুরু হয় পুঁজিবাদের সঙ্কটের তীব্রতাসাধন, ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্কট

বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে স্থিতিশীলতা-বিধানকে—আলোচ্য ঐতিহাসিক যুগে ইহাই হইল পুঁজিবাদের বিকাশের বিপ্লবী প্রগতিবাদ বা দ্বন্দ্বহেতুবাদ (dialectics)।”

পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ স্টালিনের এই অনুমানের সম্পূর্ণ নির্ভুলতা প্রমাণ করিয়াছে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকেই “বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদের গভীরতম ও তীব্রতম সঙ্কট” সুরু হইয়া গিয়াছে। পুঁজিবাদের বুর্জোয়া ও সোশাল-ডেমোক্রাট সমর্থকদের সকল রকমের রূপকথা, সকল সুবিধাবাদী তত্ত্বই উল্টাইয়া দিয়াছে এই সঙ্কট। তৃতীয় যুগ সম্বন্ধে সোভিয়েট সঙ্ঘের কমিউনিস্ট পার্টি ও সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকের (Comintern) অনুমানের সম্পূর্ণ নির্ভুলতা প্রমাণ করিয়াছে এই সঙ্কট। বর্ত্তমান সঙ্কট ও ইহার ক্রমবিকাশের ফলে পুঁজিবাদের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতার অবসান আরম্ভ হয়; ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকের কর্ম্মপরিষদের দ্বাদশ অধিবেশনেও ইহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল।

পুঁজিবাদের ব্যাপক সঙ্কটের পরিস্থিতিতে শ্রেণীবিরোধ এক অসাধারণ তীব্রতা লাভ করে। নূতন পরিস্থিতিতে স্বীয় পতন আসন্ন বুঝিয়া বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়নের ভীষণতম ও নিষ্ঠুরতম পদ্ধতি অবলম্বন করে। যুদ্ধের পর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করিয়া কয়েকটি দেশে বুর্জোয়াশ্রেণী ফাশিস্তবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে (যথা, ইতালী, হাঙ্গেরী)। জার্ম্মানিতে বুর্জোয়াশ্রেণী মাত্র কয়েকটি মধ্যবর্ত্তীকালীন ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া ফাশিস্তবাদী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, যখন “হিটলার সরকার” ক্ষমতা দখল করে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে তাহাদের প্রচ্ছন্ন একনায়কত্বের সাহায্যে ক্ষমতা

দখলে রাখা ক্রমেই দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। তাই তাহারা প্রকাশ্য ফাশিস্তবাদী একনায়কত্ব গ্রহণ করে। ইহা নৃশংসতম উপায়ে শ্রমিক আন্দোলন দমন করে, শ্রমিক শ্রেণী ও তাহাদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করে। এই সমস্তই হইল পুঁজিবাদের অস্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বুর্জোয়াশ্রেণীর অনিশ্চয়তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য।

পুঁজিবাদের ক্ষয় ও পতনের যুগে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রকাশ্য একনায়কত্বের ফাশিস্তবাদী রূপ ইহার (পুঁজিবাদের) চরম বৈশিষ্ট্য। ফাশিস্তবাদ শ্রমিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য এক সুরক্ষিত দুর্গপ্রাকার গড়িয়া তোলার চেষ্টা করে। পাতি বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশাল জনসাধারণ, কৃষক সম্প্রদায়, কর্ম্মচারী এবং কেরাণী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, এবং বুদ্ধিজীবীদের চিত্তাকর্ষণ করে। শ্রমিকশ্রেণীর অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সম্প্রদায়কেও ইহা আচ্ছন্ন করে। সকল শ্রেণীচ্যুত (de-classed) অংশকেই ইহা সন্নিবিষ্ট করে (mobilise)। ইহা, অন্তত গোড়ার দিকে, পুঁজিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মুখোস পরিয়া পুঁজিবাদ রক্ষার জন্য উন্মত্ত সংগ্রাম পরিচালনা করে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মাদকতাময় বাগাড়ম্বর, পাতি বুর্জোয়াশ্রেণীর অধিকার বঞ্চিত কিন্তু রাজনৈতিক জ্ঞানে অনগ্রসর অংশ হইতে ফাশিস্ত-বাদের সমর্থক ধরার টোপরূপে ব্যবহৃত হয়।

> "ফাশিস্তবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল অগ্রবর্ত্তী বিপ্লবী শ্রমিকদিগকে অর্থাৎ সর্ব্বহারার সাম্যবাদী (কমিউনিস্ট) অংশ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে ধ্বংস করা। বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে চরম সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ সহযোগে সামাজিক বাগাড়ম্বর, দুর্নীতি এবং আক্রমণোদ্যত শ্বেত-রক্ষী বাহিনীর বিভীষিকার (Whiteguard terror) সম্মিলন হইল ফাশিস্তবাদের বিশিষ্ট লক্ষণ। বুর্জোয়াশ্রেণীর

তীব্র সঙ্কটের কালে পুঁজিবাদবিরোধী বাক্‌বিভূতির শরণাপন্ন হয় ফাশিস্তবাদ, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পরই ত্যাগ করে তাহার পুঁজিবাদবিরোধী বাগাড়ম্বর আর নিজেকে প্রকাশ করে বৃহৎ পুঁজির সন্ত্রাসবাদী একনায়ক রূপে।" *

পুনরালোচনীয় প্রশ্নাবলী

১। সাম্রাজ্যবাদী মহাসমরের কারণ কি কি ?

২। সাম্রাজ্যবাদী মহাসমরের কি প্রকার ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল ?

৩। মহাসমরে কোন্ দেশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মুনাফা করিয়াছিল ?

৪। মহাসমরের ফলে বিভিন্ন দেশের শক্তি-সম্পর্ক কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইল ?

৫। পুঁজিবাদের ব্যাপক সঙ্কট কি ?

৬। পুঁজিবাদের ব্যাপক সঙ্কটের প্রথম যুগের বৈশিষ্ট্য সূচক লক্ষণ কি কি ?

৭। পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা-বিধান সাময়িক, আংশিক দুর্ব্বল হইয়াছিল কেন ?

৮। তৃতীয় যুগের বৈশিষ্ট্য সূচক লক্ষণ কি কি ?

নবম পরিচ্ছেদে ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর ভুলে পৃষ্ঠাঙ্ক ছাপা হইয়াছে ৩২৫, উহা ৩৩৭ হইবে এবং তদনুসারে পরবর্ত্তী যোল পৃষ্ঠার পৃষ্ঠাঙ্ক সংশোধিত হইবে।

* "সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকের কার্য্যক্রম," পৃঃ ১৩।

১১শ পরিচ্ছেদ

পুঁজিবাদের বিশ্বজোড়া বর্ত্তমান সঙ্কট

বর্ত্তমান সঙ্কট পুঁজিবাদী দুনিয়াকে কয়েক বৎসর ধরিয়া আলোড়িত করিয়াছে ; অভূতপূর্ব্ব প্রচণ্ডতাই এই সঙ্কটের বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদী মহাসমরের সঙ্গে সঙ্গে **পুঁজিবাদের যে ব্যাপক সঙ্কট** সুরু হইয়াছে তাহার **মধ্যেই** বর্ত্তমান সঙ্কটের আবির্ভাব। পুঁজিবাদের অবনতি ও পতনের যুগে, মহাসমর এবং সর্ব্বহারা বিপ্লবের যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এই সঙ্কট।

পুঁজিবাদের সামগ্রিক সঙ্কটের মধ্যেই অর্থনৈতিক সঙ্কট

এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি বর্ত্তমান সঙ্কটকে পূর্ব্ববর্ত্তী পুঁজিবাদী সঙ্কটসমূহ হইতে পৃথক করিয়াছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি এখন এমন একটি দেশ রহিয়াছে যেখানে সমাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বিজয় সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে—সেদেশ সোভিয়েট সঙ্ঘ। বর্ত্তমানে পৃথিবী চলিতেছে মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং বিজয়ী সমাজ-তন্ত্রবাদী ব্যবস্থা—**এই দুই ব্যবস্থার সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার** এক যুগের মধ্য দিয়া। এক অতি প্রচণ্ড সঙ্কট পুঁজিবাদী দেশসমূহকে যখন আলোড়িত, উদ্ব্যস্ত করিতেছে তখনই ব্যাপক সংগঠন কার্য্য এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে এক অসাধারণ উন্নতি সংঘটিত হইতেছে সোভিয়েট সঙ্ঘে। দুই ব্যবস্থার এই সংগ্রাম পুঁজিবাদের সঙ্কটকে নিরতিশয় তীব্র করিয়া তোলে। সোভিয়েট সঙ্ঘের অস্তিত্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পতনের কথা সব সময়েই স্মরণ করাইয়া

দিতেছে। সোভিয়েট সঙ্ঘে সমাজতন্ত্রের বিজয়ী সংগঠন পুঁজিবাদী দেশ সমূহের বঞ্চিত, পরপদানত শ্রমরত জনসাধারণকে গোলামী ও উৎপীড়ন, দারিদ্র্য ও ধ্বংসের কবল হইতে মুক্তির একমাত্র পথের সন্ধান দিতেছে।

"সর্ব্বপ্রথম ইহার অর্থ হইল এই যে—সাম্রাজ্যবাদী মহাসমর ও তাহার ভয়াল পরিণাম পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণুতাকে তীব্র ও প্রবল করিয়া তাহার ভারসাম্য ধ্বংস করিয়াছে; আমরা বর্ত্তমানে মহাসমর ও বিপ্লবের যুগে বাস করিতেছি; পুঁজিবাদ আজ আর দুনিয়ার অর্থ ব্যবস্থার **একমাত্র** এবং **সর্ব্বব্যাপী** ব্যবস্থা নহে; পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার পাশাপাশিই বর্ত্তমান রহিয়াছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা,—সে ব্যবস্থা বিধান পরিপুষ্ট হইতেছে, সমৃদ্ধ হইতেছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করিতেছে, আর কেবল মাত্র স্বীয় অস্তিত্বের প্রভাবেই পুঁজিবাদের শোচনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া তাহার ভিত্তিমূল শিথিল করিতেছে।".*

বিশ্ব সঙ্কট ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে দুইটি বিপরীত অঞ্চলে যুগপৎ আরম্ভ হয়ঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ইওরোপের অনগ্রসর দেশসমূহে (পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া) এবং সমসাময়িক পুঁজিবাদের সর্ব্বাগ্রগণ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান দেশ যুক্তরাষ্ট্রে। এই কেন্দ্রসমূহ হইতেই সঙ্কট সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে।

সঙ্কট **কঠিনতম আঘাত** হানিয়াছে আধুনিক পুঁজিবাদের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও অগ্রগণ্যদেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকেই। কয়েক বৎসর ধরিয়া বুর্জোয়া শ্রেণীর পদলেহী অনুচরবৃন্দ, সোশাল-ডেমোক্রাটিক

* স্টালিন, 'লেনিনবাদ, ২য় খণ্ড' ষোড়শ কংগ্রেসে রাজনৈতিক বিবরণী, পৃঃ ২৫৪

আস্তানায় তাহাদের দালাল ও মোসাহেবরা আমেরিকান 'সমৃদ্ধির' গুণকীর্ত্তন করিয়াছে, জগতকে ভরসা দিয়াছে যে, এই সমৃদ্ধির শেষ নাই, সীমা নাই। সঙ্কট কিন্তু নিদারুণভাবে এই বিশ্বাসঘাতক যুক্তিজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দিল।

বর্ত্তমান সঙ্কট দেখা দিল প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের **বিশ্বজোড়া** অর্থনৈতিক সঙ্কট রূপে। বিভিন্ন দেশে **অসমভাবে** ইহার বিকাশ হইয়াছে: সঙ্কটের আবর্ত্তে কোনো কোনো দেশ পড়িল তাড়াতাড়ি, কোনো কোনো দেশ বা দেরীতে। বিভিন্ন দেশে সঙ্কটের তীব্রতার মাত্রাও ছিল বিভিন্ন। তথাপি **সমগ্র** পুঁজিবাদী জগতকেই এ সঙ্কট আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে এমন দেশ একটিও নাই। বিভিন্ন দেশসমূহকে কম বেশী এই সঙ্কট যে ভাবেই গ্রাস করুক, তাহার লৌহপেষণ হইতে কোনো পুঁজিবাদী দেশই রেহাই পায় নাই।

পুঁজিবাদের অবনতি আরম্ভ হইবার আগের কালে পুঁজিবাদী দেশসমূহে সঙ্কট দেখা দিত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ব্যাপী সমৃদ্ধির পরে এবং পুঁজিবাদী দেশের জাতীয় অর্থব্যবস্থার উন্নতি ও বৃদ্ধির পরে। এই বিষয়ে বর্ত্তমান সঙ্কট পূর্ব্ববর্ত্তী সকল 'স্বাভাবিক' সঙ্কট হইতে মূলত পৃথক। বর্ত্তমান সঙ্কটের পূর্ব্বে বিভিন্ন দেশে পুনরুজ্জীবনের এক সাময়িক স্ফুরণ মাত্র দেখা দিয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে, এই ধরনের 'বাজার-গরম' দেখা দেয় বিভিন্ন সময়ে এবং অত্যন্ত অল্পস্থায়ী হইয়া। জার্মানিতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দই ছিল পুনরুজ্জীবনের (revival) বৎসর। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কিছু পরিমাণ অবনতি দেখা দেয়। পোল্যাণ্ডে ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে কিছু পরিমাণ পুনরুজ্জীবন দেখা দেয়; জাপানে দেখা দেয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯২৯-এর গোড়ার দিকে। অপর পক্ষে, ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে সঙ্কটের পূর্ব্বে আদৌ

পুনরুজ্জীবন দেখা দেয় নাই। এই সব দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় সঙ্কট-পূর্ব্ব কাল ছিল মন্দা বা নিশ্চলতার (Stagnation) যুগ।

সোভিয়েট সঙ্ঘের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ সম্মেলনে কমরেড স্টালিন তাঁহার বিবরণীতে বর্ত্তমান কালের পুঁজিবাদী দুনিয়ার অবস্থার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন :

"**অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে** এই বৎসরগুলি হইল অবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক সঙ্কটের বৎসর। সঙ্কট শুধু শিল্পকেই আক্রমণ করে নাই, সমগ্র ভাবে কৃষিকেও আক্রমণ করিয়াছে। উৎপাদন ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই যে কেবল সঙ্কট প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ব্যাঙ্ক-কারবার বা ধারজমা (credit) ও মুদ্রাসঞ্চালনের ক্ষেত্রেও নিদারুণ আকার ধারণ করিয়াছে ; এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রচলিত ব্যাঙ্ক-কারবার ও মুদ্রা-বিধানের প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কও বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। "পূর্ব্বে, এখানে ওখানে এই রকম বিতর্ক শুনা যাইত যে, বিশ্ব-জোড়া অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘটিয়াছে কি-না, এখন কিন্তু কেহই আর এ বিষয়ে তর্ক করে না, কারণ সঙ্কটের বিদ্যমানতা ও তাহার সর্ব্বনাশী পরিণাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বর্ত্তমানে বিতর্ক চলে অন্য প্রশ্নের উপর, যথা, সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভের কোনো পথ আছে কি-না? এবং মুক্তির পথ যদি থাকেই, তবে কোথায় তাহার হদিস মিলিবে?" *

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে অপরাপর সঙ্কটের ন্যায় বর্ত্তমান সঙ্কটও অত্যুৎপাদনের

অত্যুৎপাদনের সঙ্কট

সঙ্কট। বাজারে যে পরিমাণ পণ্য চলিতে পারে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী পণ্য উৎপাদিত হইয়াছে।

* স্টালিন—'লেনিনবাদ :—সোভিয়েট সঙ্ঘের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) সপ্তদশ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় পরিষদের কার্য্যবিবরণী' পৃঃ ৪৭০

"ইহার অর্থ হইল এই যে, আসল ভোগকারীরা—অর্থাৎ বিপুল জনসাধারণ—যাহাদের আয় নিম্ন পর্য্যায়ে রহিয়া যায় তাহারা নগদ দামে যাহা ক্রয় করিতে পারে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাপড়-চোপড়, জ্বালানী, শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার, খাদ্য বস্তু প্রভৃতি উৎপাদিত হয়। এবং পুঁজিবাদী অবস্থাপরিবেশে বিপুল জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা যথাসম্ভব নিম্নতম পর্য্যায়ে থাকায়, পুঁজিপতিরা চড়া দাম বজায় রাখিবার জন্য "উদ্বৃত্ত" পণ্যসম্ভার—কাপড়-চোপড়, শস্য প্রভৃতি গুদামে ফেলিয়া রাখে, বা এমন কি নষ্ট পর্য্যন্ত করিয়া ফেলে। তাহারা উৎপাদন হ্রাস করে, শ্রমিকদের বরখাস্ত করে, ফলে খুব বেশী পণ্য উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া বিপুল জনসাধারণ নিঃস্বতা সহ্য করিতে বাধ্য হয়।" *

অত্যুৎপাদনের অর্থ হইতেছে বিক্রয়ের কম্‌তি, বাজারের সঙ্কোচন, কলকারখানা বন্ধ এবং উৎপাদনের হ্রাস প্রাপ্তি। প্রভূত পরিমাণ পণ্য **বিক্রীত হইতে পারে না**; ফলে সর্ব্ববিধ **মজুদ বৃদ্ধি পায়**। বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল, শিল্পজাত দ্রব্য এবং কৃষিজাত দ্রব্য পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে। এই সব পুঞ্জীভূত মাল বাজারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দাম বজায় রাখিবার জন্য পুঁজিপতিরা এই সব মালের এক বিরাট অংশ নষ্ট করিয়া ফেলে। এই উদ্দেশ্যেও উৎপাদন হ্রাস করা হয়। এই সব উপায়ের সাহায্যে পুঁজিপতিরা অল্প সময়ের জন্য কোনো কোনো পণ্যের দাম অপেক্ষাকৃত চড়া পর্দ্দায় রাখে। কিন্তু তাহাদের অবলম্বিত সকল উপায় অপেক্ষাও সঙ্কটের শক্তি প্রবলতর প্রমাণিত হয়। বিক্রয় হ্রাস, বাজার সঙ্কোচন, মজুদ পণ্যের সঞ্চয় বৃদ্ধি অনিবার্য্য রূপে

* স্টালিন—"লেনিনবাদ", ২য় খণ্ড—ষোড়শ কংগ্রেসে রাজনৈতিক বিবরণী

দামের অবনতি ঘটায়। সমসাময়িক একচেটিয়া পুঁজিবাদের আওতায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একচেটিয়া ব্যবসায়ী সঙ্ঘ সমূহ নিজেদের পণ্যের চড়া দাম বজায় রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সুতরাং দাম হ্রাসের মধ্যে সামঞ্জস্যের অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যবসায় সঙ্ঘ এবং মূল্যনিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘ তাহাদের পণ্যের দাম বেশ চড়া রাখে, কিন্তু অন্যান্য পণ্যের দাম দ্রুত পড়িতে থাকে।

বিক্রয়ের কম্‌তি, মজুদ বৃদ্ধি এবং দাম হ্রাসের ফলে **উৎপাদন হ্রাস পায়**। উৎপাদন হ্রাসের কয়েকটি গুরুতর পরিণতি দেখা যায়। **বেকার বাহিনী** শোচনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রতিষ্ঠান সমূহের **কাজ করানোর ক্ষমতা ক্রমাগত কমিতে** থাকে। উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বিক্রয় দাম হ্রাস পায়। পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার দুর্ব্বল যোগসূত্র সহসা ছিঁড়িয়া পড়ে। দেউলিয়ার সংখ্যা বাড়ে। ধারজমা এবং আর্থিক সঙ্কট সুরু হয়।

পুঁজিপতিরা কোটি কোটি শ্রমিককে পথে বসায়। বেকাররা জীবন-ধারণের সকল উপকরণ হইতে বঞ্চিত হয়, অথবা খুব বেশী হইলে নিতান্ত সামান্য ভিক্ষুকের মত খয়রাতি পায়। কাজেও যাহারা থাকে তাহারাও অত্যন্ত ছাঁটাই করা (Reduced) মজুরী পায়। শ্রমিকদের আয় ক্রমশ কমিতে থাকে; কিন্তু ইহার ফলে শ্রমিক সাধারণের ক্রয়শক্তি আরও হ্রাস পায়। সেই সঙ্গে কৃষি-সঙ্কটও কৃষিজীবীদের আয় হ্রাস করে। কৃষক সাধারণ উৎসন্নে যায়।

আভ্যন্তরীণ বাজারের সঙ্কোচন পুঁজিপতিদিগের **বিদেশী বাজারের** জন্য উন্মত্ত সংগ্রাম চালাইতে বাধ্য করে। বিদেশীবাজার বলিতে বুঝায় শিল্প প্রধান অপরাপর পুঁজিবাদী দেশ অথবা ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক কৃষিপ্রধান দেশ। প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশের বুর্জোয়া

শ্রেণীই অপর বিদেশী প্রতিযোগীর অনধিকার প্রবেশ হইতে নিজেদের বাজার সংরক্ষিত করার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চড়া আমদানী-শুল্ক, নির্দ্দিষ্ট পণ্যের আমদানীর উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হয়। কৃষি সঙ্কটের ধ্বংসাত্মক ফল এবং ঔপনিবেশিক নিপীড়ন ও শোষণের বৃদ্ধির দরুণ ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক কৃষিপ্রধান দেশ সমূহের বাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং দারুণ ভাবে সঙ্কোচিত হয়। এই সবের ফলে বহির্বাণিজ্য শোচনীয় ভাবে হ্রাস পায়, বাজার দখলের সংগ্রাম চরম তীব্রতা লাভ করে এবং পুঁজিবাদী জগতের **বিরোধ সমূহ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।**

সকল সঙ্কটের মধ্যে সর্ব্বাধিক ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কট

পুঁজিবাদের ইতিহাসে বহু সঙ্কট সংঘটিত হইলেও কিন্তু কখনও এইরূপ ব্যাপক ও তীব্র সঙ্কট আর হয় নাই। ব্যাপকতায়, তীব্রতায়, দীর্ঘস্থায়িত্বে ও পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের ব্যাপকতায় বর্ত্তমান সঙ্কট পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সঙ্কটকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে।

"পুঁজিবাদী দেশসমূহের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট, অপরাপর বিষয়ের মধ্যে, সুদূরপ্রসারতা এবং দীর্ঘকাল স্থায়িত্বেও অনুরূপ সঙ্কট সমূহ হইতে স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে সঙ্কট স্থায়ী হইত দুই এক বৎসর; কিন্তু বর্ত্তমান সঙ্কট পঞ্চম বর্ষে পড়িয়াছে, প্রতি বৎসর পুঁজিবাদী দেশের অর্থব্যবস্থা ধ্বংস করিয়াছে এবং পূর্ব্বের সঞ্চিত সারাংশ উজাড় করিয়াছে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, এই সঙ্কট অপরাপর সঙ্কট হইতে ভীষণতম।" *

* স্টালিন—"লেনিনবাদ:—সোভিয়েট সঙ্ঘের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় পরিষদের কার্য্যবিবরণী", পৃঃ ৪৭১

সমুদয় মৌলিক লক্ষণ ইহার সাক্ষ্য দেয় এবং সঙ্কটের ব্যাপকতা ও তীব্রতা ব্যক্ত করে। মৌলিক সূচকসংখ্যায় দেখা যায় উৎপাদনের অবনতি, মজুরী হ্রাস ও বেকারীর ব্যাপকতা, পন্যের দাম হ্রাস, বহির্বানিজ্যের অধোগতি, কারবারী কাগজের বাজার দর হ্রাস প্রভৃতি। এইভাবে বর্ত্তমান সঙ্কট পুঁজিবাদের ইতিহাসের পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সঙ্কটকেই অতিক্রম করিয়াছে।

নিম্নলিখিত নির্ঘণ্টে পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কটের তুলনায় বর্ত্তমান সঙ্কটের সূচকসংখ্যা হ্রাসের শতকরা হিসাব দেওয়া হইল ঃ

সঙ্কটের বৎসর	পৃথিবীর অসংস্কৃত লোহার উৎপাদন	যুক্তরাষ্ট্রের ইমারৎ শিল্প	দুনিয়ার বহির্বাণিজ্য	কারবারী কাগজের দাম		দুনিয়ার পণ্যের দাম হ্রাস
				যুক্তরাষ্ট্র	ফ্রান্স	
১৮৭৩-৭৪	৮·৯	—	৫	৩০	—	২০·২
১৮৮৩-৮৫	১০·০	—	৪	২৯	—	২০·৪
১৮৯০-৯২	৬·৫	—	১	—	২১	—
১৯০৭-০৮	২৩·০	২০·০	৭	৩৭	৫	০·৮
১৯২০-২১	৪৩·৫	১১·০	—	৪১	২৫	২১·০
১৯২৯-৩২	৬৬·৮	৮৫·২	৬০	৭৫	৫০	৪৭·০

বর্ত্তমান সঙ্কটে উৎপাদনের অবনতি এমন আকারে উপনীত হইয়াছে যে, পুঁজিবাদের সূচনা হইতে কোনো সঙ্কটের ইতিহাসেই তাহার জোড়া মিলে না। পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কটসমূহে শতকরা ১০-১৫ ভাগ উৎপাদন হ্রাসকেই অত্যন্ত অধিক মনে করা হইত। বর্ত্তমান সঙ্কটে সমগ্রভাবে পুঁজিবাদী দুনিয়ার উৎপাদনের হ্রাস বিপুল পরিমাণে একতৃতীয়াংশ হইতে দুই-পঞ্চমাংশ ঘটিয়াছে ; কয়েকটি সর্ব্বপ্রধান দেশে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে অর্দ্ধেক।

উৎপাদনের এইরূপ অভূতপূর্ব্ব হ্রাস পুঁজিবাদী দেশসমূহকে যথেষ্ট পরিমাণে পিছু হটাইয়া দেয়।

পুঁজিবাদী দেশগুলির শিল্পের বিভিন্ন শাখার সংখ্যাসূচী (figures) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সঙ্কট অবনতির চরমতম দশায় উপনীত হয়। অতীতের যে সব বৎসরে এই ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সমান উৎপাদন হইয়াছিল নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল :

দেশ	কয়লা	অসংস্কৃত ঢালা লৌহ	ইস্পাত	তুলার ব্যবহার
যুক্তরাষ্ট্র	১৯০৬	১৮৯৮	১৯০৫	১৮৯৩
ইংল্যাণ্ড	১৯০০	১৮৬০	১৮৯৭	১৮৭২
জার্মানি	১৮৯৯	১৮৯১	১৮৯৫	১৮৮৯

এমনি করিয়া পুঁজিবাদী দেশে মৌলিক শিল্প সমূহ পঁচিশ হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

উৎপাদনের অভূতপূর্ব্ব হ্রাস বিপুল বেকার সংখ্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বেকার সংখ্যার দিক হইতে বর্ত্তমান সঙ্কট পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সঙ্কটকেই বিশেষ করিয়া অতিক্রম করিয়াছে। এই মাত্র উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সঙ্কটে বেকারের সংখ্যা ছিল প্রায় এককোটি, এই পরিমাণ তখন অত্যধিক বলিয়া "বিবেচিত," কিন্তু বর্ত্তমান সঙ্কটে সর্ব্বপ্রধান পুঁজিবাদী দেশ সমূহে বেকারের সংখ্যা ৪—৫ কোটি।

সঙ্কটের এইরূপ দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি এবং ইহার অসাধারণ ব্যাপকতা ও তীব্রতার কারণ কি? সোভিয়েট সঙ্ঘের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ সম্মেলনে কমরেড স্টালিন তাঁহার বিবরণীতে এই সব কারণ এইরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন :

"সর্ব্বপ্রথম, এই ঘটনা দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে শিল্পসংক্রান্ত সঙ্কটের প্রভাব প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশেই বিস্তার লাভ করিয়াছিল;

একটি দেশও বাদ যায় নাই এবং এই সঙ্কট কয়েকটি দেশের পক্ষে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল।

"দ্বিতীয়ত, ইহা এই তথ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, শিল্প-সঙ্কট কৃষিসঙ্কটের সহিত বিজড়িত হইয়া পড়িল। এই কৃষিসঙ্কট কোনো দেশ বাদ না দিয়া কৃষিপ্রধান ও অর্দ্ধকৃষিপ্রধান দেশ সমূহে প্রভাব বিস্তার করিয়া শিল্পসঙ্কটকে আরও ব্যাপক ও জটিল না করিয়া পারে নাই।

"তৃতীয়ত, ইহাকে এই তথ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, এই সময়ে কৃষিসঙ্কট আরও তীব্র হইয়া পশুপালন সমেত কৃষির সকল শাখায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল; ফলে কৃষিতে যে অবনতি দেখা দেয় তাহাতে যান্ত্রিক শ্রমের স্থানে দৈহিক শ্রম, কলের লাঙ্গলের স্থানে ঘোড়ার ব্যবহার সুরু হয়, কৃত্রিম সারের ব্যবহার দ্রুত কমিতে থাকে এবং কোনো কোনো সময় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়; ফলে শিল্পসঙ্কটকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করিয়া তোলে।

"চতুর্থত, ইহা এই তথ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, একচেটিয়া ব্যবসায়ী মূল্য-নিয়ন্ত্রণ-সঙ্ঘ সমূহ শিল্পের উপর কর্ত্তৃত্ব করে এবং জিনিসের দাম চড়া রাখিতে চেষ্টা করে। এই অবস্থা সঙ্কটকে বিশেষভাবে ক্লেশদায়ক করিয়া তোলে ও মজুদ পণ্যের কাটতি ব্যাহত করে।

"সর্ব্বশেষে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, ইহাকে এই তথ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, পুঁজিবাদের ব্যাপক সঙ্কটের অবস্থার মধ্যেই সুরু হইয়াছে শিল্পসঙ্কট: মহাসমর এবং অক্টোবর বিপ্লবের

পূর্ব্বে পুঁজিবাদের যে শক্তি ও স্থায়িত্ব ছিল, এই সময়টুকি স্বদেশে, কিংবা উপনিবেশ বা অধীন দেশসমূহে কোথাও আর পুঁজিবাদের সেই শক্তি ও স্থায়িত্ব নাই বা থাকিতে পারে না; এই সময় পুঁজিবাদী দেশের শিল্প ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিণামের ফলে জর্জ্জর—যেমন, প্রতিষ্ঠান সমূহকে সামর্থ্য অপেক্ষা ক্রমাগত কম কাজ করানো এবং লক্ষ লক্ষ বেকারের বাহিনী। ইহাদের হাত হইতে আর নিষ্কৃতির উপায় নাই।

"বর্ত্তমান শিল্পসঙ্কটের নিতান্ত দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির নির্দ্দেশকারী অবস্থা হইল এইরূপ।" *

অত্যুৎপাদনের সঙ্কটের ফলে অর্থ-ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রেই উৎপাদন হ্রাস পায় ভীষণ ভাবে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল হইতে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অভূতপূর্ব্ব মাত্রায় উৎপাদন বন্ধ ও সঙ্কোচন করা হইতেছে।

উৎপাদন হ্রাস

সোভিয়েট সঙ্ঘে উৎপাদন যখন প্রতি বৎসর বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে সেই সময়েই পুঁজিবাদী দুনিয়া সঙ্কটের নির্ম্মম চাপে পড়িয়া উৎপাদন সঙ্কুচিত করিতেছে অভূতপূর্ব্ব পরিমাণে।

সোভিয়েট সঙ্ঘ ও পুঁজিবাদী দেশ সমূহের উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে সরকারী তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত একটি তালিকা এখানে দেওয়া হইল। †

* ঐ পৃঃ ৪৭১—৭২

† ঐ, সোভিয়েট সঙ্ঘের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ সম্মেলনে কমরেড স্টালিনের বিবরণী পৃঃ ৪৭৪

কারখানাজাত উৎপাদনের পরিমাণ
(১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শতকরা হার)

	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
সোভিয়েট সঙ্ঘ	১০০	১২৯·৭	১৬১·৯	১৮৪·৭	২০১·৬
যুক্তরাষ্ট্র	১০০	৮০·৭	৬৮·১	৫৩·৮	৬৪·৯
ইংল্যাণ্ড	১০০	৯২·৪	৮৩·৮	৮৩·৮	৮৬·১
জার্মানি	১০০	৮৮·৩	৭১·৭	৫৯·৮	৬৬·৮
ফ্রান্স	১০০	১০০·৭	৮৯·২	৬৯·১	৭৭·৪

তালিকাটি বিশেষ অর্থপূর্ণ।

প্রথমত, ইহা প্রতিপন্ন করে যে, সর্ব্ব বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কারখানাজাত উৎপাদন অসাধারণ ভাবে হ্রাস পাইয়াছে, পক্ষান্তরে সোভিয়েট সঙ্ঘে কারখানাজাত উৎপাদন বাড়িয়াছে দ্বিগুণের বেশী।

দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী দেশ সমূহে কারখানাজাত উৎপাদন সর্ব্বনিম্ন স্তরে নামিয়াছিল ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। সেই সময়ে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল এক-তৃতীয়াংশ। মাত্র ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পুঁজিবাদী দেশগুলির শিল্প সামলাইয়া উঠিতে থাকে, তবুও কিন্তু ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দেও সঙ্কটের পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের তুলনায় কম ছিল প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

তৃতীয়ত, সঙ্কট সকল দেশকেই সমানভাবে সংক্রামিত করে নাই এবং বিভিন্ন দেশে তাহার ফল বিশেষ বিভিন্ন।

অবশ্য একথা প্রণিধান করা বিশেষ কর্ত্তব্য যে, সঙ্কটের সূচনায় বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতিও ছিল বিভিন্ন। তালিকা দৃষ্টে মনে হইতে পারে যে, ইংলণ্ডের অবস্থাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। প্রকৃত পক্ষে ঘটনা কিন্তু তেমন নহে। এই সব দেশের প্রাক্‌মহাসমরকালের মানের

(level) তুলনা করিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। নীচে তালিকা দেওয়া হইল :

কারখানাজাত উৎপাদনের পরিমাণ

(প্রাক্‌মহাসমর মানের শতকরা হারে)

	১৯১৩	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
সোভিয়েট সঙ্ঘ	১০০	১৯৪.৩	২৫২.১	৩১৪.৭	৩৫৯.০	৩৯১.৯
যুক্তরাষ্ট্র	১০০	১৭০.২	১৩৭.৩	১১৫.৯	৯১.৪	১১০.২
ইংল্যাণ্ড	১০০	৯৯.১	৯১.৫	৮৩.০	৮২.৫	৮৫.২
জার্ম্মানি	১০০	১১৩.০	৯৯.৮	৮১.০	৬৭.৬	৭৫.৪
ফ্রান্স	১০০	১৩৯.০	১৪০.০	১২৪.০	৯৬.১	১০৭.৬

এই তালিকা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ইংল্যাণ্ড ও জার্ম্মানির শিল্প তাহাদের প্রাক্‌মহাসমর কালের মানের নীচে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প প্রাক্‌মহাসমর উৎপাদন পরিমাণের ১৭০ শতাংশে উপনীত হইয়াছিল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কিন্তু বর্ত্তমানে প্রাক্‌মহাসমর মানের ১০ শতাংশ উপরে আছে। এই একই সময়ে জারপন্থী রুশিয়ার শিল্পের প্রাক্‌মহাসমর উৎপাদনের তুলনায় সোভিয়েট সঙ্ঘে কার্য্যত বৃদ্ধি পাইয়াছে চতুর্গুণ।

পুঁজিবাদী দেশে উৎপাদনের এই ভীষণ অবনতি উৎপাদক শক্তি নিচয়ের এক অভূতপূর্ব্ব অপচয় সূচিত করে।

শ্রমশীল জনসাধারণের শোণিত ও স্বেদে নির্ম্মিত উৎপাদন উপকরণ সমূহকে খুবই সামান্য পরিমাণে কাজে লাগানো হয়। লোহাকারখানার উনান (ব্লাস্ট ফারনেস), খনি, যন্ত্রতৈয়ারীর কারখানা, বয়ন কারখানা, ইস্পাত পোড়ানো খোলা উনান প্রভৃতির এক বিরাট অংশ অব্যবহৃত থাকিয়া যায়। যন্ত্রবিদ্যার আধুনিকতম পদ্ধতিতে সজ্জিত প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্ম্মহীন থাকিয়া যায়। এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্ত বিপুল উপকরণ

বৃথাই নষ্ট হয়; ব্যবহার বা তদারকের অভাবে কারখানার যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া পড়ে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই সামর্থ্যের আংশিক কাজ করে। প্রতিষ্ঠান সমূহের যা কার্য্যকরী ক্ষমতা তাহা ক্রমশ বিশেষ ভাবে কমাইয়া আনাই হইল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যাপক সঙ্কটের অন্যতম সুস্পষ্ট লক্ষণ।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতিষ্ঠান সমূহকে সামর্থ্য অপেক্ষা কম কাজ করাইবার ব্যাপারটি প্রকাশ পাইয়াছিল নিম্নলিখিত ঘটনায়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সঙ্কট আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়লাখনি-গুলিতে কাজ হইত সামর্থ্যের মাত্র ৬৮ ভাগ, তৈলখনিতে ৬৭ ভাগ, তৈলশোধনাগারে ৭৬ ভাগ, লৌহনিষ্কাশন কারখানাতে ৬০-৮০ভাগ, মোটরগাড়ী নির্ম্মানের কারখানাতে অনধিক ৫০ভাগ, যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণকারী প্রতিষ্ঠানে ৫৫ভাগ, বয়নকারখানায় ৭২ ভাগ, এবং কোনো কোনো শাখায় ইহা হইতেও কম—যেমন মুদ্রণসরঞ্জাম (Polygraphic) শিল্পে ৫০ভাগ, ময়দা কলে ৪০ ভাগ এবং পশমের কলে ৩৬ ভাগ। অতএব সঙ্কটের পূর্ব্বেও মৌলিক শিল্পগুলি তাহাদের প্রভূত উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিত না। সঙ্কটের ফলে এবং উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যকরী ক্ষমতার অল্পপ্রয়োগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেও যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত কারখানার সাজসরঞ্জামের শতকরা মাত্র ১৩ ভাগ এবং মোটর গাড়ী উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির শতকরা মাত্র ১১ ভাগ চালু ছিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জার্মানিতে সমস্ত শিল্পে তাহার ক্ষমতার শতকরা ৩৬ ভাগ কাজ হইত, গুরু শিল্পের শতকরা হার আরও কম ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে চারি বৎসরে ৬০টি লোহাকারখানার ফারনেস পুরাতন

লোহার টুকরায় পরিণত হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ১ কোটি ৯১ লক্ষ ৭০ হাজার মণ ইস্পাত তৈয়ারী করিতে পারে এইরূপ ১২টি ইস্পাত পোড়ানো খোলা উনান এবং ১৩টি উত্তপ্ত ধাতু ঢালাই করিয়া পাত তৈয়ারী করার কারখানা, (Rolling mill) ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। ২৩টি লোহাকারখানার ফারনেস ও ৩৮টি ইস্পাত পোড়ানো খোলা উনান নষ্ট করিয়া ফেলা হইল জার্মানিতে।

বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিতে যন্ত্রের বিস্তীর্ণ "শ্মশানের" ভুরি ভুরি বিবরণ পাওয়া যায়। সকল পুঁজীবাদী দেশেই এই "শ্মশান" বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা ধনী দেশগুলির শিল্পাঞ্চলে যোজনের পর যোজন জুড়িয়া রহিয়াছে বন্ধদ্বার কারখানা ও গুদাম ঘর, অবহেলায় ধূলিধূসরিত শক্তিশালী মালতোলা যন্ত্র, ঘাসে ঢাকা শাখা রেলপথ, অনড় মাল ও যাত্রীবাহী পোতবহর, অচল কারখানার চিমনীর অরণ্য।

শিল্পে ও কৃষিতে উৎপাদন হ্রাস এবং মাল চলাচল হ্রাসের ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বৎসরে যে মোট মূল্য (value) উৎপাদিত হয় তাহা হ্রাস পায়। ইহার অর্থ হইল এই যে, পুঁজিবাদী দেশে **জাতীয় আয় হ্রাস পায়।**

জাতীয় আয়ের ঘাটতি ও জাতীয় সম্পদ হ্রাস

কিন্তু পুঁজিবাদী দেশ সমূহে সঙ্কটের প্রভাবে যে কেবল মাত্র জাতীয় আয়ই হ্রাস পায় তাহা নহে; কর্ম্মহীন কারখানাও ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়। মেরামত না করা বাড়ীগুলি হইয়া উঠে বাসের অযোগ্য। পতিত জমি আগাছায় ছাইয়া ফেলে। যত্ন ও ব্যবহারের অভাবে যন্ত্রে মরিচা ধরে এবং তাহা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। প্রভূত পরিমাণ অবিক্রিত দ্রব্য নানা উপায়ে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। বহু বৎসরের অক্লান্ত শ্রমে সঞ্চিত সম্পদের যথেচ্ছ বিচারবিহীন অপচয় ও ধ্বংস

করা হয় নানা উপায়ে। আর সুরু হয় বহু পুরুষের শ্রমে **উৎপাদক শক্তিসমূহের** অনন্তসাধারণ **অপচয়।**

কোনো দেশের মূল্যের মোট পরিমাণকে—কলকারখানা, ইমারত, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, কারখানাজাত দ্রব্য ও কাঁচামাল সহ—সাধারণভাবে বলা হয় সেই দেশের **জাতীয় সম্পদ**। পুঁজিবাদী দেশসমূহে এই সম্পদসম্ভার যে আদৌ জাতির করায়ত্ত নহে এই ব্যাপারটি স্বভাবতই বোঝা যায়। পক্ষান্তরে, পুঁজিবাদী দেশসমূহে জাতীয় আয়ের প্রধান অংশ যেমন জাতির জনসাধারণের হাতে না যাইয়া মুষ্টিমেয় পরশ্রমজীবীদের কবলে পতিত হয় ঠিক তদ্রূপ পুঁজিবাদী আওতায় শোষক ও পরস্বোপজীবীদের ক্ষুদ্র এক মণ্ডলীর হাতেই এই সম্পদসম্ভার সন্নিবেশিত হয়।

নিম্নে একটি তালিকায় সর্ব্বপ্রধান পুঁজিবাদী দেশসমূহের সঙ্কটের প্রথম দুই বৎসরের জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয় (শতকোটি টাকার সংখ্যায়) প্রদর্শিত হইল।

দেশ	জাতীয় সম্পদ		জাতীয় আয়	
	১৯২৯	১৯৩১	১৯২৯	১৯৩১
যুক্তরাষ্ট্র	১২০০	৭২০	২৭০·০	১৬২·০
ইংল্যাণ্ড	৩৪৫	২০৭	৫৭·০	৩৪·২
জার্মানি	২৪০	১৪৪	৪৬·৫	২৭·৯
ফ্রান্স	২০৪	১৫৩	২৭·০	২০·১
ইটালী	৯০	৫৪	১৫·০	৯·০

এই সব সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে, সঙ্কটের দুই বৎসরে পুঁজিবাদী দেশসমূহের সর্ব্বপ্রধান পাঁচটি দেশ তাহাদের জাতীয় সম্পদের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ হারাইয়াছে (সঙ্কটের সূচনায় ছিল দুই লক্ষ সাত হাজার নয় শত কোটি টাকা, দুই বৎসর পরে হ্রাস পায় আশী হাজার এক

শত কোটি টাকা)। তাহাদের জাতীয় আয়ও ৪১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া হইল ২৫ হাজার ৩২০ কোটি টাকা। এই হ্রাসও শতকরা ৪০ ভাগ।

পুঁজিবাদী জগতে সঙ্কটের দ্বারা যে অভূতপূর্ব্ব ধ্বংসলীলা সাধিত হয় তাহার এক বিশ্বগ্রাসী রূপ দেখা যায় উপরোক্ত সংখ্যাগুলিতে। যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কোটি কোটি জনসাধারণকে বুভুক্ষা ও মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ করার সময়েও অবর্ণনীয় সম্পদসম্ভার অন্ধভাবে বিনষ্ট করে সেই ব্যবস্থার নির্ববুদ্ধিতা ও মহাপাপ সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত করে এই সব সংখ্যা।

জাতীয় আয় হ্রাস ও জাতীয় সম্পদ ধ্বংসের পরিমাণে বর্ত্তমান সঙ্কট পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কটসমূহকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছে। তুলনার জন্য এই মাত্র উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জার্মানির জাতীয় আয় হ্রাস পাইয়াছিল শতকরা ৬ ভাগ; ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সঙ্কটে জার্মানির জাতীয় আয় হ্রাস পাইয়াছিল শতকরা ৪ ভাগ এবং ইংলণ্ডের জাতীয় আয় শতকরা ৫ ভাগ।

পুঁজিবাদের বিশ্বসঙ্কটের সমগ্র বোঝা পড়িয়াছিল শ্রমিক শ্রেণীর উপর।

বেকারত্ব এবং শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা

সঙ্কট শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় করিয়া তোলে। সর্ব্বহারার বেকার সংখ্যা ও শোষণ অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পায়।

পুঁজিবাদের ব্যাপক সঙ্কট সুরু হয় মহাসমরের সঙ্গে সঙ্গেই এবং বেকার সংখ্যাও বৃদ্ধি করে যথেষ্ট। মহাসমরের পরে প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশে বেকার সংখ্যা বিরাট আকার ধারণ করিয়াছিল। পূর্ব্বে সমৃদ্ধির যুগে শিল্পসংক্রান্ত মজুদবাহিনী বিলুপ্ত হইত। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর হইতে এই বাহিনী একটি স্থায়ী বেকার বাহিনীতে পরিণত হইয়াছে।

স্থায়ী বেকারদের এই বাহিনীর আকার বর্ত্তমান সঙ্কট আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেও ছিল বিপুল। তাই ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংল্যাণ্ডে বেকারের সংখ্যা কোন সময়েই ১০ লক্ষের নীচে নামে নাই। ১৯২৫ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে যে পুঁজিবাদী সংহতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহারই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল বেকারসংখ্যা। শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুঁজিপতিরা শ্রমশক্তির ব্যাপারে "মিতব্যয়িতা" অর্জ্জন করিয়াছিল। আর সেই কারণেই "প্রয়োজনাতিরিক্ত" বলিয়া বিবেচিত হয় কোটি কোটি শ্রমিক।

ইংল্যাণ্ডে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বেকারের অনুপাত ছিল শতকরা ৮·৮ ভাগ কিন্তু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে সেই অনুপাত দাঁড়াইল শতকরা ১২·২ ভাগে; আর এই সময়ে জার্মানিতে ছিল শতকরা ৬·৩ ও ২২·৩ অথবা ২৬ লক্ষ ২২ হাজার জন ছিল বেকার। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে বেকার ছিল ২১ লক্ষ কিন্তু ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের শেষে ও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সূচনায় তাহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪ লক্ষে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে যে সঙ্কট সুরু হইল তাহাতে বেকার সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িয়া গেল। উৎপাদন-সঙ্কোচন লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে করিল কর্ম্মহীন। সঙ্কটের চাপে শ্রমের অধিকতর তীব্রতাসাধন আরম্ভ হয় এবং অবশিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত শ্রমিকের উপর শোষণ আরও বৃদ্ধি পায়।

বর্ত্তমান সঙ্কটের যুগে বেকার অবস্থা এমন বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে যে, পুঁজিবাদের সমগ্র ইতিহাসে পূর্ব্বে কখনও এইরূপ দেখা যায় নাই। অত্যন্ত কম করিয়া ধরিয়াও প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশের বেকার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৪ কোটি ৫০ লক্ষ। যদি আমরা পরিবার সমূহকেও এই হিসাবে ধরি তাহা হইলে মোট সেই সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি দেশের মোট জনসংখ্যার সমান হইবে। আংশিক সময়ের

জন্য অর্থাৎ সপ্তাহে দুই দিন কি একদিন কাজ করে এমন শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাও এই সংখ্যার সঙ্গে অবশ্যই যোগ করিতে হইবে। পরিশেষে এই সব সংখ্যায় কিন্তু ঔপনিবেশিক দেশসমূহের শ্রমরত সেই বিপুল জনসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, যাহারা সঙ্কটের ফলে খাদ্যের শেষ কণা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। সঙ্কটের যুগে দুনিয়ার বেকার সংখ্যা চারি হইতে পাঁচ গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং কোনো কোনো দেশে কিন্তু আরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সর্ব্বপ্রধান পুঁজিবাদী দেশসমূহেও বেকার সম্পর্কে যে বাস্তবিক উপযুক্ত অথবা নির্ভরযোগ্য কোনো হিসাবপত্র বা পরিসংখ্যা (Statistics) নাই একথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে। সাধারণত, ঐ পরিসংখ্যার হিসাব **অনেক কম করিয়া ধরা হয়।**

যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশেও বেকার সম্পর্কে কোনো সরকারী তথ্য নাই। কিন্তু বুর্জোয়া সংবাদপত্রসমূহও একথা গোপন করিতে পারে না যে, সঙ্কটের চরমতম অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে বেকার ছিল প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ। এই সংখ্যা হইল যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক, অথচ যুক্তরাষ্ট্রই হইল শিল্পপ্রধান দেশসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। ইংল্যাণ্ডে বেকার সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায় সামাজিক বীমার (Social Insurance) তালিকা হইতে। সেই সব তালিকায় বেকারের সংখ্যা দেখা যায় ৩০ লক্ষ। কিন্তু সঙ্কটের বৎসরসমূহে কয়েক লক্ষ শ্রমিককে সামাজিক বীমার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সামাজিক বীমার কোনো সুবিধাই পায় নাই। জার্মানিতে, বিশেষ করিয়া হিটলারপন্থী নাৎসীবাদীদের ক্ষমতা লাভের পর হইতে, বেকার সম্বন্ধে তথ্য প্রকৃত অবস্থাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র করিয়া

প্রকাশ করে ; তৎসত্ত্বেও এমন কি সেই সরকারী তথ্যানুযায়ী, সেখানেও বেকার সংখ্যা ৫০ লক্ষের কম নহে।

বর্ত্তমান সময়ে পুঁজিবাদী দেশে এমন একটি শ্রমিক পরিবারও পাওয়া কঠিন যাহার কর্ত্তা কিংবা সন্তান অথবা কোন না কোন ব্যক্তি বেকার নহে। ইহার অর্থ, যে কাজ করিতেছে তাহার সামান্য মজুরীতেই সংসারের বহু সংখ্যক প্রাণীকে উদর পূরণ করিতে হইতেছে। ইহার অর্থ—আজ যে কাজ করিতেছে সে আগামী কাল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না, অদৃষ্ট সম্বন্ধে সে নিরুদ্বেগ হইতে পারে না। কারণ কাজ খোয়া যাইবার আশঙ্কা সর্ব্বদাই তাহার মাথার উপর ঝুলিতেছে।

পুঁজিবাদী দেশে বেকারদের যে অতি সামান্য খয়রাত দেওয়া হয় তাহার উপরও পুঁজি নিদারুণ আক্রমণ চালায়। সরকারী ব্যয়ের "মিতব্যয়িতার" অজুহাতে বেকারদিগকে প্রদত্ত সাহায্য অত্যন্ত কমাইয়া দেওয়া হয়। ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশেও বেকার অবস্থার দুর্দ্দশার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য কোনো সামাজিক বীমার ব্যবস্থা নাই। ফলে হয় বেকারকে না খাইয়া মরিতে হইবে নতুবা ব্যক্তিগত বেসরকারী দানশীলতার মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। কিন্তু যে সমস্ত দেশে বেকার-বীমা বিদ্যমান সে ক্ষেত্রেও বেকার-খয়রাতের উপর নির্ম্মম অত্যাচার চলে। জার্মানি ও ইংল্যাণ্ডে এই খয়রাত যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরন্তু বেকারের এক অংশকে এই খয়রাত হইতে একেবারেই বঞ্চিত করা হইয়াছে।

সঙ্কটের সুযোগে বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের উপর আক্রমণ চালায়। যাহারা তখনও কাজে নিযুক্ত আছে এমন সব শ্রমিকদের উপর **শোষণের মাত্রা** প্রভূত পরিমাণে **বৃদ্ধি** পাইয়াছিল প্রত্যেক দেশেই। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমের রোজটিকে করা হইল দীর্ঘ।

শ্রমের তীব্রতা হইল বর্দ্ধিত। যাহারা আংশিক ভাবে কাজে নিযুক্ত ছিল তাহাদিগকে দেওয়া হইল নিতান্ত কম মজুরী। কাজের অবস্থা-পরিবেশ সর্ব্বতোভাবে শোচনীয় করা হইল।

শ্রমিকদের মজুরীর উপর সুব্যবস্থিত আক্রমণ চালাইবার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী সঙ্কট অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে। সঙ্কটের সময়ে সকল পুঁজিবাদী দেশে, জাতীয় অর্থব্যবস্থার সমস্ত শাখা-প্রশাখায় মজুরী হ্রাস করা হইয়াছিল।

সঙ্কটের বৎসরসমূহে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে মজুরীরূপে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত মজুরীর পরিমাণ ছিল পূর্ব্বপ্রদত্তের মাত্র ৩৩ শতাংশ। সঙ্কটের তিন বৎসরে জার্মানিতে শ্রমিকশ্রেণীর মজুরীর পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল প্রায় ১৬ শত কোটি টাকা। এই একই সময়ে সমাজতন্ত্রের মাতৃভূমি সোভিয়েট সঙ্ঘে মজুরীর পরিমাণ ১১ শত ৫ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৪ হাজার ১ শত ৪৪ কোটি টাকা হয়।

গত দশ বৎসরে প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরীর মান কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে জনৈক জার্মান অর্থনীতিবিদ্ সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন। নিজের অনুসন্ধানের ফলে তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :

"পূর্ব্বতন দশকের মানের সহিত বর্ত্তমান প্রকৃত মজুরীর মানের তুলনা করিলে আমরা দেখি যে, জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃত মজুরীর মান এরূপ হ্রাস পাইয়াছে যে, গত অর্দ্ধ শতাব্দীতেও সেরূপ কখনও ছিল না। ইংল্যাণ্ডে প্রকৃত মজুরীর মান ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে এবং বিংশ শতকের সূচনায় যাহা ছিল এখনও তাহারই সমান আছে।"

বিভিন্ন দেশের তথ্যাদি ইহা প্রমাণ করে :

জার্মানি : প্রকৃত মজুরীর মান বর্ত্তমান কালে ক্রমাগতই হ্রাস করা হইয়াছে। ১৯১৩-১৯১৪ খৃষ্টাব্দকে ১০০ ধরিলে আমরা নীচের লেখা মতো সংখ্যা পাই (ধীরে ধীরে বৃদ্ধির ফলে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রকৃত মজুরীর মান ১০০ হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসরসমূহ ক্রমিক অবনতিই নির্দ্দেশ করে।) :—

১৯২৫	৯৮
১৯২৮	১০০
১৯৩০	৮৯
১৯৩১	৭৯
১৯৩২	৬৪

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানির শ্রমিক শ্রেণীর জীবনধারণের মান আরও হ্রাস পায়।

বেকারদের অবস্থা আরও খারাপ। প্রধানত, রাজনৈতিক কারণে সরকারী সাহায্য হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত বহু সংখ্যক বেকারদের কথা ছাড়িয়া দিলেও ফাশিস্তবাদী সরকার অপরাপর সকলেরও খয়রাত ছাঁটাই করিয়াছে।

ইংল্যাণ্ড : ইংরেজ শ্রমিকের গড়পড়তা মজুরী (১৮৯৫-১৯০৩ খৃষ্টাব্দকে ১০০ ধরিলে) ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ছিল ৯৮, ১৯২৯-এ ৯৭, ১৯৩২-এ ৯৪। যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্রভাবে শ্রমিক শ্রেণীর মজুরী ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে চরমে উপনীত হয়। ১৮৯৮-১৯০৮ খৃষ্টাব্দকে ১০০ ধরিলে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মজুরী ছিল ১২৫। কিন্তু এই সময়ে মজুরীর দ্রুত পতন জীবন যাত্রার মানকে বহু বৎসরের পূর্ব্বেকার স্তরে টানিয়া নামাইতে শুরু করে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সূচক সংখ্যা (index number) নামে ১০৫-এ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৯১তে এবং ১৯৩২ ৭১-এ।

মুখে দেওয়া চলে এমন কিছু পাওয়ার আশায় বেকাররা আবর্জ্জনা কুণ্ড হাতড়াইয়া ফিরিতেছে, দাতব্য লঙ্গরখানার সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—ইহাই হইল যে কোনো পুঁজিবাদী মহানগরীর আজিকার সাধারণ চিত্র। বড় রাস্তায় লক্ষ্যহীন ভাবে টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। প্রায়ই দেখা যায় যে, দলে দলে লোক পুত্র কন্যা এবং দীন গৃহস্থালীর সব কিছু লইয়া এক একটি গোটা পরিবার পথে পথে ঘুরিয়া ফিরিতেছে জীবিকার ব্যর্থ অনুসন্ধানে। কতিপয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ লক্ষেরও বেশী বেকার এই ভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়।

বুভুক্ষা মানুষকে মরিয়া করিয়া তোলে। সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ক্রমেই আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করে এক বার্লিনেই গড়ে দৈনিক ৬০ জন।

বেকারদের জন্য এই তথাকথিত সাহায্য পরিণত হয় দাসত্ব গ্রহণ করাইবার জবরদস্তিতে, কঠোর বেগার আদায়ের উপায় মাত্রে। অনেক পুঁজিবাদী দেশে বেগার (forced labour) খুব প্রচলিত হইয়াছে। সর্ব্ববিধ সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিবার ভয় দেখাইয়া শ্রমিকদিগকে তথা কথিত "পূর্ত্তকার্য্যে" (public works—এই গুলি সাধারণত বড় বড় জমিদারের অনিপুণ শ্রমের চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা বা কোনো রকমের সামরিক নির্ম্মাণ কার্য্য) নিযুক্ত করা হয় এবং একত্রিত করা হয়, বিভিন্ন শিবির ছাউনী এবং বসতিতে—যেখানে কয়েদখানার মত বিধি-নিষেধ বলবৎ আছে। কারখানা ও কৃষি শ্রমিকদিগের নিকট হইতে আদায় করা এই শ্রমের দামও হয় কয়েদখানার দামের মতই। জার্ম্মানির ফাশিস্তপন্থী সরকার বেকার যুবকদিগের জন্য অনুরূপ বেগার

শ্রমশিবির দ্রুততালে গড়িয়া তুলিতেছে। এই দৃষ্টান্ত অপরাপর পুঁজিবাদী দেশের পক্ষেও লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অথচ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সোভিয়েট সঙ্ঘে 'বেগার' বা জবরদস্তি শ্রম করানো হয় বলিয়া ইহারা শোরগোল তুলিয়াছিল—যে সোভিয়েট সঙ্ঘে শ্রম সত্যই "সম্মানের বিষয়, গৌরবের বিষয়, শক্তি ও পৌরুষের বিষয়।"

শ্রমিকদের মূল স্বার্থের উপর পুঁজির আক্রমণের ফলে তাহার বিরুদ্ধে সর্ব্বহারার বিশাল এক অংশের পক্ষ হইতে **প্রতিরোধ** দেখা দেয়। পুঁজিবাদী দেশসমূহের উপর দিয়া ধর্ম্মঘটের বন্যা বহিয়া যায়। বর্ত্তমান সঙ্কটের আওতায় ধর্ম্মঘট আন্দোলনসমূহ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে তাহাদের অসাধারণ দৃঢ়তায়। শ্রমিকদিগকে প্রকৃত পরিস্থিতি উপলব্ধি করিতে সাহায্য করিতেছে তাহারাই। কে তাহাদের মিত্র, আর কে-ই বা তাহাদের শত্রু সুস্পষ্টরূপে তাহাও দেখাইয়া দিতেছে তাহারাই। যে বিধান সঙ্কটের অবস্থাপরিবেশে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে পৈশাচিক ভাবে নিদারুণ দুর্দ্দশায় নিক্ষেপ করে তাহাকেই দ্বন্দ্বে আহ্বান (Challenge) করিবার প্রকৃতি দ্রুততালে পরিগ্রহ করে এই ধর্ম্মঘটসমূহ।

শিল্প ও কৃষি প্রধান দেশ উভয়ই, পুঁজিবাদী দেশের শিল্প ও কৃষি উভয়ই, সঙ্কট দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার ফলই হইল বর্ত্তমান সঙ্কটের বিশেষ তীব্রতা ও ব্যাপকতার কারণ। বর্ত্তমান সঙ্কট শিল্প ও কৃষির মধ্যেকার বিরোধ সমেত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমুদয় মৌলিক বিরোধ ও অসঙ্গতিকে তীব্র ও প্রকট করিয়াছে।

শিল্প ও কৃষি সঙ্কটের জট পাকানো অবস্থা

"অর্থনৈতিক সঙ্কটের বিকাশের গতিপথে, প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশের শিল্প সঙ্কট কৃষিপ্রধান দেশের কৃষিসঙ্কটের সহিত কেবলমাত্র এক সাথে সংঘটিতই হয় নাই পরন্তু তাহার সহিত সংমিশ্রিত

হইয়াছে। ফলে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের ব্যাপক হ্রাসের অবশ্যম্ভাবিতা নিশ্চিত হইয়াছে।" *

শিল্প সঙ্কটের ফলে বেকার অবস্থা অভূতপূর্ব্বরূপে বৃদ্ধি পায়, শ্রমরত জনসাধারণ চরম দারিদ্র্যে উপনীত হয়। জনসাধারণের দারিদ্র্যের অর্থ হইল কৃষিজাত উৎপন্নের **বিক্রয় হ্রাস**। ইহা ব্যতীতও উৎপাদন হ্রাসের অর্থ হইল তুলা, পশম প্রভৃতি কৃষিজাত কাঁচা মালের চাহিদার হ্রাস। আবার কৃষি সঙ্কটের বেলায় কৃষক সাধারণের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। কৃষক সাধারণের শিল্পজাত পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা নষ্ট হয়; ফলে শিল্পজাত পণ্যের বিক্রয়-বাজার সঙ্কুচিত হয়।

উৎপাদক শক্তির আধুনিক বিকাশ নিয়ন্ত্রণে পুঁজিবাদের অক্ষমতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হইল এই কৃষি সঙ্কট। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান (Engineering) সম্পূর্ণ অভিনব শ্রমপদ্ধতির ব্যবহার সম্ভবপর করিয়াছে, যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে; এই সমস্তর অর্থ হইল উৎপাদনক্ষমতার প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধি। অবশ্য আধুনিক যান্ত্রিক সাফল্যের প্রয়োগের পক্ষে পুঁজিবাদের গণ্ডী নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। শহর ও গ্রামের বৈষম্য তীব্রতর করিয়া পুঁজিবাদ পল্লীকে নিক্ষেপ করে নির্জ্জীবতা আর অবনতির মুখে। কৃষির অধিকতর বিকাশের পথে পুঁজিবাদী সম্পর্ক-সমূহ এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইয়া উঠে।

সোভিয়েট সঙ্ঘের সহিত তুলনায় পুঁজিবাদী দেশের কৃষির অবনতি ও অচল অবস্থা বিশেষ উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হইয়া উঠে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট ইউনিয়নে মাত্র এক বৎসরে আবাদী জমির

* স্টালিন "লেনিনবাদ" ২য় খণ্ড, ষোড়শ কংগ্রেসে রাজনৈতিক বিবরণী, পৃঃ ২৫২

আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছিল সাড়ে সাত কোটি বিঘা, আর, সমগ্র পুঁজিবাদী দেশে গত বিশ বৎসরে শস্যের জন্য কর্ষিত জমির আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র সাড়ে বাইশ কোটি বিঘা। পুঁজিবাদী দেশের কৃষিতে গভীর সঙ্কটের সূচনা করিয়াছিল মহাসমর। কৃষক সাধারণের নিদারুণ নিঃস্বতা এবং কতিপয় দেশের উৎপাদন হ্রাসই হইল এই সঙ্কটের পরিণতি। শিল্প ও কৃষি সঙ্কটের জটপাকানো এই বর্ত্তমান সঙ্কট কোটি কোটি কৃষকের অস্তিত্বের পক্ষে নিতান্ত বিপজ্জনক।

সর্ব্বহারা ও সাধারণ ভাবে শ্রমশীল জনগণের অভূতপূর্ব্ব দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিয়া সঙ্কট কৃষিজাত উৎপন্নের চাহিদা দ্রুত হ্রাস করে, এবং এই সব উৎপন্নের বিক্রয়-বাজার যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করে। বাজারের এই চরম সঙ্কোচনের ফলে কৃষিজাত উৎপন্নের **মজুদ ভাণ্ডার** প্রভূত পরিমাণে পুঞ্জীভূত হয় এবং **দাম ভীষণভাবে পড়িতে থাকে**। মজুদ ভাণ্ডারের বৃদ্ধি, বিক্রয়ের হ্রাস প্রাপ্তি এবং দাম হ্রাস আবার **কৃষি উৎপাদন সঙ্কুচিত** করে।

পুঁজিবাদী দেশে মালগুদাম ও খাদ্যশস্যের গোলা পরিপূর্ণ হয় কৃষিজাত উৎপন্নের মজুদ ভাণ্ডারে। বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতারা এই প্রাচুর্য্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের একটি মাত্র পথই দেখিতে পায়—সে হইল পোড়াইয়া পচাইয়া সাগরে ডুবাইয়া এই সব মজুদ ভাণ্ডার নষ্ট করা; কিন্তু প্রধানত কৃষিকে কম উৎপাদন করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে আবাদী জমির আয়তন হ্রাস করা। পর্ব্বতপ্রমাণ গম ও ভুট্টার স্তূপ পচিতে দেওয়া হয় অথবা পোড়াইয়া ফেলা হয়, দুধের নদী বহাইয়া দেওয়া হয়, জার্মানিতে শস্যের সহিত এক বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইয়া তাহাকে মানুষের খাওয়ার অযোগ্য করা হয়; ফলে কেবল গবাদি পশুকেই তাহা খাওয়ানো চলে।

সঙ্কটের সময়ে কৃষিজাত পণ্যের দাম নিদারুণভাবে হ্রাস পাইয়াছে। যেমন, দুনিয়ার বাজারে গমের পাইকারী দাম হ্রাস পাইয়াছিল শতকরা ৭০ ভাগ এবং তুলা, চিনি, কফি ও পশমের দাম হইয়াছিল অর্দ্ধেক। মনে হইতে পারে যে শহরের ব্যবহারকারীরা, ও জনসাধারণ ইহার দ্বারা লাভবান হয়; কার্য্যত কিন্তু তাহা হয় না। সর্ব্বশেষ ব্যবহারকারীর নিকট পৌছিবার পূর্ব্বে পণ্য বহু মধ্যবর্ত্তী ফড়িয়া, পাইকারের হাত ঘুরিয়া যায়। ইহারা বড় বড় একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ থাকে। এই একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই খুচরা দাম পড়িতে দেয় না। অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশে সঙ্কটের সময় খুচরা দাম বেশী হ্রাস পায় নাই; কোনো কোনো দেশে (যেমন জার্মানিতে) বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। কিন্তু কৃষকের—শ্রমশীল কৃষক সাধারণের কারবার করিতে হয় পাইকারদের সহিত এবং স্বীয় উৎপন্ন বিক্রয় করিতে হয় নিতান্ত কম দামে; ফলে, তাহার নিজের শ্রমের কথা বাদ দিলেও, প্রায়ই শস্যবীজ ও সরঞ্জামের খরচই উঠে না।

কৃষককে সরকারের কর (taxes), জমিদারের খাজনা, ব্যাঙ্কের ঋণের সুদ, ঠিক পূর্ব্বের মতই এবং কোনো কোনো সময়ে বেশী পরিমাণেও দিতে হয়। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষক ফসল বিক্রয় করিয়া যাহা পায় তাহার বৃহত্তর অংশ চলিয়া যায় ঋণের সুদ আর কর দিতে। খামার ও গৃহস্থালীর সমুদয় সামগ্রী তাহার ঋণের দায়ে, করের দায়ে, নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়। কেবলমাত্র ইওরোপেই নহে, যুক্তরাষ্ট্রেও এমনই করিয়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষকরা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি খামার হারাইয়াছে। এই যুক্তরাষ্ট্রকেই পুঁজিপতিরা পুঁজিবাদের আওতায় সচ্ছল ও সমৃদ্ধিশালী কৃষির আদর্শ দেশ বলিয়া সর্ব্বদা বর্ণনা করে। এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বনাশ পুঁজি, জমিদার এবং ব্যাঙ্কের পীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমরত

কৃষক সাধারণের বর্দ্ধমান প্রতিরোধের সূচনা করে। কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হইতে চেষ্টা করে, নিজেদের দ্রব্যসম্ভার নিলামে বিক্রয়ের সময় ক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে যে, নিঃস্ব কৃষকদের সম্পত্তি নিলামের সময় জেলার কৃষকরা সংঘবদ্ধভাবে আসিয়া মোট সম্পত্তির জন্য নীলামের ডাক তিন টাকার বেশী উঠিতে দিত না। এইভাবে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদিগকে নীলাম বাতিল করিয়া ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়াইয়া দিতে বাধ্য করা হইত।

কৃষিক্ষেত্র ও খামার হারাইয়া নিঃস্ব কৃষকেরা পথচারী ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। পুঁজিবাদী দেশে কৃষি-মজুরের অবস্থা আরও খারাপ। ইওরোপ ও আমেরিকায় জমিদার ও শোষণকারী ধনী কৃষকের পক্ষে ঠিকা (hired) কৃষি-মজুরদের শ্রমশক্তির জন্য নগদ মজুরী দিতে অস্বীকার করা অত্যন্ত সাধারণ রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক মুষ্টি শস্য বা সের দুই আধপচা আলুর বদলে তাহারা শহরের কোনো বেকার শ্রমিকের দ্বারা ঐ কাজ করাইয়া লইতে পারে। নগণ্য বুর্জোয়া লেখকেরা জমিতে ফিরিয়া যাওয়ার শোরগোল তুলিয়াছে। বেকারদের জন্য তথাকথিত 'বসতি' (settlement) স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার একমাত্র অর্থ হইল যে, এমন সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সাজসরঞ্জাম না থাকায় এইসব খামারে শ্রমিকরা তাহাদের আশাভরসাহীন দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া কাটায়, তাহাদের যোগ্য যথেষ্ট খাদ্যও উৎপন্ন হয় না। পুঁজিবাদী কৃষির সঙ্কট পুঁজিবাদের আওতায় ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন ব্যবস্থার হতাশাময় অবস্থা সুস্পষ্ট করিয়া তোলে।

কৃষিসঙ্কটের আঘাতে **দরিদ্র** এবং **মধ্যবিত্ত** কৃষকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দুর্দ্দশা ভোগ করে। সঙ্কটের ফলে বিশাল কৃষকসাধারণ নিঃস্ব হইয়া

পড়ে। সঙ্কট কৃষকদের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে, তাহাদের অনেককে সর্ব্বহারায় পরিণত করে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সঙ্কটের জবরদস্তির প্রভাবে কৃষকশ্রেণীকে যে বোঝা বহন করিতে হয় তাহা নিতান্ত অসহনীয়। কর, খাজনা, ঋণের সুদ এবং অপরাপর দেনা এই সমস্তই সঙ্কটের অবস্থাপরিবেশে অত্যন্ত গুরুভাররূপে চাপিয়া বসে বিশাল কৃষক-সাধারণের উপর।

কৃষিসঙ্কট কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করে। অনেক দেশে বুর্জোয়া সরকার উৎপাদন হ্রাসের পরামর্শ খোলাখুলিভাবেই দেয় এবং বলে যে, কৃষিসঙ্কট উপশমের ইহাই একমাত্র পথ। শিল্পের ন্যায় কৃষিতেও উৎপাদন হ্রাসের ফলে উৎপাদকশক্তিসমূহ প্রভূত পরিমাণে নষ্ট হয়। গম ও ভুট্টার জমি পড়িয়া থাকে শূন্য অনাবাদী; তুলা, রবার ও কফির আবাদ অবহেলিত পড়িয়া থাকে। অথবা সব পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়। এবং এই সবও ঘটিতেছে এমনই সময়ে যখন কোটি কোটি লোক আছে অনশনে, মাথার উপরে নাই তাহাদের আচ্ছাদন, আর নাই একান্ত আবশ্যক সামান্য পরিধেয় পর্য্যন্ত।

কৃষির অধোগতিই কৃষিসঙ্কট ও কৃষক সাধারণের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। কৃষি-যন্ত্রপাতি ও কৃত্রিম সারের বিক্রয় শোচনীয় ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। প্রধান প্রধান দেশেও কলের লাঙ্গল, বপন ও ফসল কাটার কলের ব্যবহার হ্রাস করা হইয়াছে। এই সঙ্কটের ফলে পুঁজিবাদী দেশে কৃষির অবনতি ও ধ্বংস সাধিত হইয়াছে। সমসাময়িক সঙ্কটের বৈশিষ্ট্যসূচক অন্যতম প্রধান লক্ষণ হইল—একচেটিয়া পুঁজিবাদের ভিত্তির উপরে ইহার পরিপুষ্টি।

সঙ্কট এবং একচেটিয়া ব্যবসায়

"পুরাতন পুঁজিবাদের সহিত সাম্প্রতিক পুঁজিবাদের পার্থক্য এই যে,

ইহা হইল একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং তাহারই ফলে অত্যুৎপাদন থাকা সত্ত্বেও পণ্যের চড়া একচেটিয়া দাম বজায় রাখার জন্য পুঁজিবাদী সমবায়গুলির মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে রেষারেষির সূচনা হয়। স্পষ্টতই দেখা যায় যে, এই অবস্থায় পণ্যের আসল ব্যবহারকারী বিশাল জনসাধারণের পক্ষে সঙ্কট বিশেষ কষ্টকর ও সর্ব্বনাশকর হইয়া উঠে। এই অবস্থাপরিবেশ সঙ্কটকে দীর্ঘস্থায়ী না করিয়া পারে না, তাহার সমাপ্তি ঘটিতে দেয় না।"*

বহু বৎসর যাবৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুচররা প্রচার করিয়াছে যে, একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিকাশ সুব্যবস্থিত পুঁজিবাদের আবির্ভাব সূচিত করিতেছে। পুঁজির যাহারা সাফাই গাহিত তাহারা সঙ্কট সম্পর্কে এই রূপকথা ছড়াইয়া বেড়াইত যে, সুব্যবস্থিত পুঁজিবাদের যুগে সঙ্কট অতীতের বস্তু হইয়া পড়িবে। বর্ত্তমান সঙ্কট এইসব কল্পনার অলীকত্ব প্রমাণিত করিয়াছে। বস্তুত আধুনিক পুঁজিবাদের একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রকৃতি সঙ্কটকে চরমরূপে তীব্র করিয়াছে, তাহাকে ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী করিয়াছে।

অতি উৎপাদন সত্ত্বেও বর্দ্ধিত দাম বজায় রাখিয়া সঙ্কটের সমস্ত বোঝা ব্যবহারকারী বিশাল জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টাই সর্ব্বপ্রথম একচেটিয়া ব্যবসায়ের নায়করা করিয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে, অতি-উৎপাদন নির্ব্বিশেষে, শিল্পের একচেটিয়া অধিকারপ্রাপ্ত শাখাগুলির বহু সংখ্যক উৎপন্নের দাম অন্যান্য শাখার উৎপন্ন পণ্যের দাম অপেক্ষা অধিকতর মন্থর গতিতে হ্রাস পাইয়াছিল।

* স্টালিন, "লেনিনবাদ," ২য় খণ্ড, "ষোড়শ কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিবরণী" পৃঃ ২৫২।

	জার্মানি (১৯২৬=১০০)		অস্ট্রিয়া (১৯২৬=১০০)		পোল্যাণ্ড (১৯২৬=১০০)	
বৎসর	মূল্যনিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘের দাম	অনিয়ন্ত্রিত দাম	মূল্যনিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘের দাম	অনিয়ন্ত্রিত দাম	মূল্যনিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘের দাম	অনিয়ন্ত্রিত দাম
১৯২৮	১০২·১	১০৬·৮	—	—	—	—
১৯২৯	১০৫·০	৯৭·৪	৯৯	১০০	১০৭·৭	৯৩·৬
১৯৩০	১০৩·১	৭৯·৭	৯৬	৮৭	১০৮·৯	৮০·৯
১৯৩১	৯৩·৬	৬০·৮	৯১	৭৬	১০৭·৮	৬৩·৮
১৯৩২	৮৩·৯	৪৭·৫	৯৩	৭৩	১০৬·১	৫২·৫
১৯৩৩	৮৩·৯	৪৮·৩	৯৪	৭৩	৯৪·৮	৪৮·৮

অনেক ক্ষেত্রে তবুও একচেটিয়া ব্যবসায়ের বাঁধন অপেক্ষা সঙ্কটের দারুণ চাপ অধিক শক্তিশালী প্রতিপন্ন হয় এবং তখন দাম পড়িতে থাকে দ্রুতবেগে, আর খোদ একচেটিয়া ব্যবসায়ই হইয়া পড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। কাঁচামাল উৎপাদনে ব্যাপৃত শাখাসমূহ সম্পর্কে ইহা বিশেষ ভাবে সত্য। কাঁচা মালের চাহিদা দ্রুত হ্রাস পাওয়া এবং রাশিকৃত মজুদ ভাণ্ডারের সঞ্চয় উৎপাদকদিগকে পরিশেষে যথেষ্ট পরিমাণে দাম কমাইতে বাধ্য করে। এই সব ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা চড়া দাম বজায় রাখিতে অক্ষম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বিরোধসমূহ সঙ্কটের অবস্থা পরিবেশে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, একচেটিয়া ব্যবসায়সমূহের চড়া দাম বজায় রাখিবার প্রয়াস একদিকে মুষ্টিমেয়

একচেটিয়া ব্যবসায় ও অপর দিকে ইহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহারকারী সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে তীব্রতম ধরনের সংঘর্ষ ঘটায়। শিল্পের একচেটিয়া শাখাসমূহ এবং যে-সব শাখায় একচেটিয়া ব্যবসায় উপেক্ষণীয়, তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ আরও তীব্রতর হয়। উপরন্তু, খোদ একচেটিয়া ব্যবসায়সমূহের মধ্যেও সংঘর্ষ প্রচণ্ড হইয়া উঠে। যে বিরোধ ও অসঙ্গতি-সমূহ ব্যক্তিগত একচেটিয়া ব্যবসায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে সে সমস্ত বৃদ্ধি পায়। পৃথক পৃথক একচেটিয়া ব্যবসায়ের ভিতরে অভ্যন্তরীণ বিরোধ-সমূহ প্রখরতর, তীব্রতর হয়। বহুসংখ্যক একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সঙ্কটের আঘাত সামালাইতে না পারিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, নিম্নলিখিত বড় বড় একচেটিয়া ব্যবসায়ের সমবায়সমূহ সঙ্কটের সময়ে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল: দি ইনটারন্যাশন্যাল জিঙ্ক কার্টেল, দি ইওরোপিয়ান পিগ্ আয়রন কার্টেল, দি ইন্টার-ন্যাশন্যাল টিন কার্টেল। ক্রমাগত চাপের ফলে দি ইওরোপীয়ান পিগ আয়রন কার্টেল স্বীয় সভ্যদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার প্রচলনে ফিরিয়া যাওয়া মঞ্জুর করিতে কার্য্যত বাধ্য হইয়াছিল। জার্মানিতে কৃত্রিম রেশম উৎপাদকদের সংগঠন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং দস্তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘের পতন ঘটিল; ফ্রান্সে অসংস্কৃত লোহের বাণিজ্য সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, ইত্যাদি।

পুঁজিবাদী দেশের সরকার একচেটিয়া ব্যবসায়ের সমিতিসমূহকে জোর সমর্থন করে। যে সব একচেটিয়া ব্যবসায় বিপদে পড়ে তাহারাই সরকারী কোষাগার হইতে অর্থ সাহায্য (subsidy) এবং অন্যান্য সাহায্যও পায়। এইরূপে কোটি কোটি মার্ক জার্মান মুদ্রা—(এক মার্ক প্রায় এগার আনার সমান), ডলার (আমেরিকার মুদ্রা—প্রায় আমাদের তিন টাকার সমান), ফ্রাঙ্ক (ফরাসীদেশের মুদ্রা—প্রয়ে আমাদের সাড়ে

আট আনার সমান) করদাতাদের ক্ষীণ মুষ্টি হইতে বেসরকারী পুঁজিপতি-দের ব্যক্তিগত সিন্দুকে চলিয়া যায়।

আধুনিক পুঁজিবাদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রকৃতি সঙ্কটকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া তোলে। অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে দামের সাধারণ হ্রাস, দুর্ব্বল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের পতন এবং উৎপাদন ছাঁটাইয়ের ফলে সঙ্কট ধীরে ধীরে কাটিয়া যায় এবং শিল্পের উৎপাদনচক্র পুনরায় চালু হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কটের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তির এই পদ্ধতি অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। একচেটিয়া ব্যবসায়ের অনুশাসনে সঙ্কট আরও তীব্র ও ব্যাপক হইয়া পড়ে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতি

অতি উৎপাদন ও বাজার সঙ্কোচনের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতি ঘটে। বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতির ব্যাপারে বর্ত্তমান সঙ্কট পুঁজিবাদের ইতিহাসের অপরাপর সঙ্কটকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

নিম্নে প্রদত্ত তালিকা তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্কটের তুলনায় ১৯২৯-৩১ খৃষ্টাব্দের বৈদেশিক বাণিজ্যের হ্রাস ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের বা বাণিজ্যিক আবর্ত্তনের (turn over) অবনতি

সঙ্কট	শতকরা
১৮৭৩-৭৪	৫
১৮৮৩-৮৪	৪
১৯০০-০১	১
১৯০৭-০৮	৭
১৯২৯-৩২	৬৫

বিশ্ববাণিজ্যের অবনতি অর্থনৈতিক বন্ধন শিথিল করিয়াছে। এই বন্ধন ব্যতীত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা টিকিয়া থাকিতে পারে না। শিল্পপ্রধান দেশগুলি কাঁচা মালের আমদানীর পরিমাণ অনেক কম করিল। কৃষিপ্রধান দেশও শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী হ্রাস করিল। ফলে বিশাল শ্রমিক সাধারণের মধ্যে উৎপাদন ও ব্যবহারের (consumption) আরও অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইল।

দুনিয়ার বাজারে যে সব বৃহত্তম পুঁজিবাদী দেশ প্রভাবশালী আসন অধিকার করিয়া আছে, বিশ্ববাণিজ্যের অবনতি প্রচণ্ডতম আঘাত হানিয়াছে তাহাদেরই শিরে। এখানে প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশের রফ্তানি ও আমদানীর হ্রাস নির্দ্দেশসূচক সংখ্যা দেওয়া হইল। (১৯২৯ খৃষ্টাব্দের সংখ্যাকে ১০০ ধরা হইয়াছে)

প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশের

বৈদেশিক বাণিজ্যের হ্রাস বা অবনতি

	১৯৩০		১৯৩১		১৯৩২	
দেশ	আমদানী	রফ্তানি	আমদানী	রফ্তানি	আমদানী	রফ্তানি
যুক্তরাষ্ট্র	৭০	৭৩	৪৮	৫০	৩০·১	৩০·৮
জার্মানি	৭৭	৯০	৫০	৭৩	৩৪·৭	৪২·৬
ইংল্যাণ্ড	৮৬	৭৮	৭২	৫৩	৫৭·৬	৫০·১
ফ্রান্স	৯০	৮৫	৭২	৬১	৫১·২	৩৯·৩
ইতালী	৮০	৭৯	৫১	৬৬	৩৮·৭	৪৫·৬

বৈদেশিক বাণিজ্যের এইরূপ অবনতি **বাজার অধিকারের প্রতিযোগিতা ও রেষারেষিকে** অভূতপূর্ব্বরূপে **তীব্র করিয়া তোলে।**

বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক কাড়াকাড়ি অসাধারণ উগ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। প্রত্যেক দেশেই পুঁজিপতিরা প্রথমত আভ্যন্তরীণ বাজার নিজেদের জন্য সংরক্ষিত ও নিরাপদ করিতে চেষ্টা করে; বিদেশী প্রতিযোগিতাকেও ঢুকিতে না দিবার চেষ্টা করে। অস্বাভাবিক চড়া আমদানী শুল্ক প্রবর্ত্তিত হয়। সকল পুঁজিবাদী দেশে সংরক্ষণবাদের (protectionism) এই অশ্রুতপূর্ব্ব বৃদ্ধির ফলে ডাম্পিং অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

আধুনিক পুঁজিবাদের একচেটিয়া প্রকৃতি অর্থনীতির সমগ্র বিবর্ত্তন ধারার উপর তাহার চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। ধার-জমার বাজারে (credit) সঙ্কটের বৃদ্ধি হইল আধুনিক পুঁজিবাদের একচেটিয়া প্রকৃতির অন্যতম বিশিষ্ট এক পরিণতি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঙ্কটে যে সমস্ত ক্ষেত্রে সঙ্কট প্রচণ্ড ও প্রত্যক্ষ ভাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল **ধার-জমার বাজার** তাহাদের অন্যতম। যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা করিতে পারে নাই, বিক্রয়ের ফ্যাসাদ ও অসুবিধা শীঘ্রই তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল; প্রতিশ্রুতি ও বাধ্যবাধকতা পরিপূরণ করিবার জন্য টাকা পয়সা না থাকায় তাহারা নিজেদের দেউলিয়া অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম বলিয়া ঘোষণা করিত। প্রাক্-একচেটিয়া ব্যবসায়ের যুগে প্রতিষ্ঠানসমূহের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের সহিত সম্পর্কিত ব্যাঙ্ক সমূহেরও পতন ঘটিত। সেই সঙ্গে এই সব প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হওয়ার ফলে উৎপাদন হ্রাস পাইত, বাজার হইতে দুর্ব্বল প্রতিষ্ঠানগুলি বিলুপ্ত হইত এবং এইরূপে কেবল মাত্র শক্তিশালী ও অধিকতর যোগ্য প্রতিষ্ঠানের হাতেই বাজার চলিয়া যাইত। এই ভাবে সঙ্কট ক্ষুদ্রাকার প্রতিষ্ঠানগুলি এবং মধ্যমাকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কিয়দংশ

হুণ্ডির বাজারে সঙ্কট, মুদ্রাস্ফীতি ও বাজারের জন্য সংগ্রাম

ধ্বংস করিয়া বিরাট পুঁজির কয়েকজন মালিকের অবস্থা আরও শক্তিশালী করিয়াছিল।

সঙ্কটে পুঁজিবাদী দেশগুলির সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন ব্যাপকভাবে সংক্রামিত হইবার পরে মাত্র ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আধুনিক পুঁজিবাদের একচেটিয়া প্রকৃতির ফলে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল যে-ক্ষেত্রে ধার-জমার সঙ্কট প্রকাশ্য ভাবে দেখা দিল।

সঙ্কটের সূচনা হইতেই আধুনিক পুঁজিতন্ত্রে প্রতিপত্তিশালী একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা তাহাদের সঙ্কটজনিত ক্ষয়ক্ষতি একচেটিয়া নয় এমন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে চাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিল; এখানে আধিপত্য করিত মধ্যমাকৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি। সেই সঙ্গে দ্রুত পতনশীল বাজারে দাম চড়া রাখিবার উদ্দেশ্যে একচেটিয়া ব্যবসায়সমূহকে উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছিল চূড়ান্ত ভাবে। উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ফলে অনিবার্য্যরূপে দেখা দিল **মুনাফার হ্রাসপ্রাপ্তি,** লোকসান এবং পুঁজিপতিদের বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে **মুনাফার বণ্টনে** প্রভূত পরিবর্ত্তন।

সঙ্কটের ফলে সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হওয়ার সংখ্যা অভূতপূর্ব্ব-রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল।

দেউলিয়ার সংখ্যা

দেশ	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
যুক্তরাষ্ট্র	২২,৯০৯	২৯,৩৫৫	১৯,২৮৮	৩১,৮৮২	১৭,৭৩২
ইংল্যাণ্ড	৫,৯০০	৬,২৮৭	৬,৮১৮	৭,৩২১	৪,৯২৭
জার্মানি	৯,৮৪৬	১৫,৪৮৬	১৯,২৫৪	১৩,৯৬৬	৩,৭১৮
ফ্রান্স	৬,০৯২	৬,২৪৯	৭,২২০	৯,০১৪	৮,৩৬২
পোলাণ্ড	৫১৬	৮১৫	৭৩৮	৫৪৫	২৫৯

ধার-জমার বাজারের সঙ্কট অনেক দিন হইতেই জাঁকিয়া উঠিতেছিল। ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির দেউলিয়া হওয়া, সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাবে (Budget) ফ্যাসাদ, মুনাফা হ্রাস ও লোকসান বৃদ্ধি, কারবারী কাগজ ও শেয়ারের দাম হ্রাস—এই সবই ধার-জমার বাজারে সঙ্কটের বিস্ফোরণের পথ প্রস্তুত করিতেছিল, অবশেষে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রচণ্ড বেগে সেই বিস্ফোরণ সংঘটিত হইল। দাম ও উৎপাদন হ্রাসের ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া অবস্থাপ্রাপ্তি, উৎপন্ন দ্রব্যের দাম আদায়ের দুরূহতা, গুদামে মজুদ ভাণ্ডারের পড়তি মূল্য (Depreciation) প্রভৃতিই অনিবার্য্যরূপে ব্যাঙ্ক-কারবারকে করিয়া তুলিল দেউলিয়া। ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় আবার শিল্পের পক্ষে ফ্যাসাদ উপস্থিত হইল এবং তাহারই ফলে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হইল।

ধার-জমার সঙ্কট প্রথম প্রকটিত হয় জার্মানি ও **অস্ট্রিয়ায়**। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের বসন্ত কালেই অস্ট্রিয়ার সর্ব্বপ্রধান ব্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হইয়াছিল, দেশের সমুদয় শিল্পের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ ছিল এই ব্যাঙ্কেরই নিয়ন্ত্রণাধীনে। ইহার পরেই জার্মানিতে কয়েকটি প্রধানতম শিল্প প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হইয়া পড়ে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জার্মানির তৃতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক—ডার্মস্টাড এ্যাণ্ড ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক (The Darmstadt and National Bank) এবং অন্য একটি বৃহৎ ব্যাঙ্ক—ড্রেসডেন ব্যাঙ্ক—দেউলিয়া হইল। মধ্য ইওরোপ হইতে ধার-জমা সঙ্কটের তরঙ্গমালা ইংল্যাণ্ডকে কবলিত করিল; ফলে ফ্রান্স, আমেরিকা এবং অপরাপর পুঁজিবাদী দেশে দেখা দিল ধার-জমার সঙ্কট।

দুনিয়ার একচেটিয়া ব্যবসায়ের পুঁজির "মুকুটমণি" বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি সঙ্কটের আঘাতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধে

এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে দেউলিয়া হইয়া পড়ে। সুইডিস্ ক্র্যুগার ম্যাচ ট্রাস্ট ভাঙ্গিয়া পড়ে। আমেরিকার পুঁজির সাহায্যে কাজ করিয়া ক্র্যুগার সকল দেশের দিয়াশালাইএর একচেটিয়া ব্যবসায় দখল করিতে চাহিয়াছিল। সোভিয়েট সঙ্ঘের বিরুদ্ধে সে ভীষণ আন্দোলন চালাইয়াছিল; কারণ তাহার উদ্দেশ্য সাধনের বিরাট অন্তরায় ছিল সোভিয়েট সঙ্ঘের দিয়াশালাই রফ্তানি। দেউলিয়া হইবার মুখে ক্র্যুগার নিজেকে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পরে দেখা গেল যে, তাহার দেউলিয়া হওয়াকে ঠেকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে শেষ কয়েক বৎসরে সে বহু জালজুয়াচুরির আশ্রয় লইয়া তাহার ব্যবসায় জিয়াইয়া রাখিয়াছিল। আরও প্রকাশ পাইয়াছিল যে, কতকগুলি দেশের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা তাহার বেতনভুক্ ছিল। অনেক সোশাল-ডেমোক্রাটিক নেতা তাহার নিকট হইতে সাহায্য পাইত।

যুক্তরাষ্ট্রের বড় ব্যবসায়ীদের অন্যতম ইনস্যুল একজন পাকা জুয়াচোর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। তাহার অধীনে যে সঙ্ঘ ছিল তাহা ৬০টি নগরে বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র, গ্যাস কারখানা এবং জলের কলের মালিক ছিল: পুঁজির পরিমাণ ছিল ১৫০ কোটি টাকা। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের বসন্ত কালে এই সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া পড়ে:

> "সঙ্কট কেবল উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নাই, ব্যাঙ্ক-কারবার, প্রচলিত মুদ্রা, ঋণের দাবী দাওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সংক্রামিত করে; এবং তাহা বিভিন্ন দেশের ও প্রত্যেক দেশের সামাজিক মণ্ডলী সমূহের মধ্যে প্রথাগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন করিয়াছে।
>
> "পণ্যের দামের হ্রাসপ্রাপ্তি এই ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। একচেটিয়া ব্যবসায়ের মূল্যনিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘসমূহের প্রতিরোধ সত্ত্বেও দাম পড়িতে থাকে অবিমিশ্র দ্রুততালে। কৃষক,

কারিগর এবং ক্ষুদ্র পুঁজিপতি প্রভৃতি অসংগঠিত পণ্য-মালিকদের পণ্যেই প্রথমত এবং প্রধানত মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছিল। সঙ্ঘবদ্ধ পণ্য-মালিকদের যেমন, মূল্যনিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘে মিলিত পুঁজিপতিদের—পণ্যের দাম হ্রাস পাইয়াছিল ক্রমে ক্রমে এবং অল্প পরিমাণে। দাম হ্রাস পাওয়ায় খাতকদের (উৎপাদন মালিক, কারিগর, কৃষক প্রভৃতি) অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিল, পক্ষান্তরে পাওনাদারদের অভূতপূর্ব্ব সুবিধাজনক আসনে জাঁকিয়া বসাইয়া দিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে বহু কারবার ও স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা দেউলিয়া হইতে বাধ্য এবং হইয়াছিলও তাহাই। গত তিন বৎসরে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সে এই ভাবে হাজার হাজার যৌথ কারবার বিধ্বস্ত হইয়াছিল। যৌথকারবারে দেউলিয়া হওয়াকে অনুসরণ করিল প্রচলিত মুদ্রার মূল্য হ্রাস, ফলে খাতকদের অবস্থা কিছুটা সহজ হইয়াছিল। প্রচলিত মুদ্রার মূল্য হ্রাস আবার অনুসৃত হইল বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ ঋণের বৈধ অপরিশোধ দ্বারা।" *

সঙ্কট বৃদ্ধির ফলে ব্যাপকতম **মুদ্রাস্ফীতি** হয় অর্থাৎ প্রচলিত মুদ্রার মূল্যহ্রাস ঘটে। হ্রাসের ফলে খাতকের খুবই দুর্দ্দশা ঘটে: যখন সে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল সেই সময়ের তুলনায় যখন মূল্য হ্রাস পায় তখন ঐ একই পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করিতে তাহাকে অত্যধিক পণ্য দিতে হয়। দামের হ্রাসপ্রাপ্তি ঋণগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের কাঁধে অতিরিক্ত বোঝা চাপায় এবং যথেষ্ট পরিমাণ ঋণজালে আবদ্ধ সমগ্র দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তোলে। এই দুর্দ্দশার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় কি? পুঁজিপতিরা

* স্টালিন—"লেনিনবাদ": সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় পরিষদের কার্য্যবিবরণী, পৃঃ ৪৭২-৩

এবং তাহাদের সরকার সমূহ মুক্তিলাভের পথ অনুসন্ধান করে দুই দিকে : সাময়িক ঋণ মুলতুবী (moratorium), ঋণ-পরিশোধ স্থগিতের মারফতে এবং মুদ্রাস্ফীতির মারফতে। সঙ্কটের বৃদ্ধির ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলি একের পর এক তাহাদের ঋণ পরিশোধ করা বন্ধ করিল। তাহাতেও কিন্তু নিষ্কৃতি মিলিল না। মুদ্রাস্ফীতির পথও অবলম্বিত হইল। প্রথমত, দুর্ব্বল দেশগুলি এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে। পরে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে ইংল্যাণ্ড মুদ্রাস্ফীতির পথে যাত্রা করে : বৃটিশ সরকার স্বীয় কাগজী-মুদ্রার (paper money) স্বর্ণে পরিবর্ত্তন বন্ধ করায় পাউণ্ড স্টার্লিং-এর (ইংলণ্ডের প্রচলিত মুদ্রা) মূল্য পড়িতে থাকে। মুদ্রার মূল্য হ্রাস খাতকের অবস্থা সচ্ছল করে—এ অবস্থায় সে মূল্যহ্রাস পাওয়া (depreciated) অর্থাৎ সুলভতর (cheaper) মুদ্রায় ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। উপরন্তু **বিদেশী বাজারের জন্য সংগ্রামেও** মুদ্রাস্ফীতির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

পুঁজিবাদী দেশ স্বীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাসে দুনিয়ার বাজারে অপরাপর দেশের উপর সুবিধা নেয়। ইহার কারণ হইল এই যে, স্বর্ণের ভিত্তিতে ইহার পণ্যে কম খরচ লাগে। কাগজী মুদ্রায় দাম হয়ত বাড়িতে পারে, কিন্তু যদি এই মুদ্রা স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, স্বর্ণ-মানে অবস্থিত দেশের পণ্য অপেক্ষা মুদ্রাস্ফীতিসম্বলিত দেশের পণ্য সস্তা। উপরন্তু কম দামের সহায়তায় দুনিয়ার বাজারে প্রতিযোগিতাকে পরাভূত করা সহজ হয়। স্বর্ণ-মানে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রায় এখনও যে সব দেশের পণ্যের দাম নিরূপিত হয়, তাহাদের অসুবিধা আছে। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ধনী এবং অন্যতম প্রধান পুঁজিবাদী দেশ, যুক্তরাষ্ট্রও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাহার মুদ্রা স্ফীত করিয়াছিল। আমেরিকার ডলার (আমেরিকায় প্রচলিত আদর্শ মুদ্রা)

এবং ইংলিশ পাউণ্ড স্টার্লিং সমগ্র পুঁজিবাদী জগতে স্থিতিশীল মুদ্রা বলিয়া বিবেচিত হইত। সকলেই তাকাইয়া থাকিত তাহাদের দিকে। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের ব্যবসায়ীরা অবিচলিত ভাবে বিশ্বাস করিত তাহাদের **স্থিতিশীলতায়**; স্বর্ণের সম মূল্যে নিরূপিত হইত তাহাদের মূল্য; স্বল্প সম্পদশালী অপরাপর দেশের সঞ্চয়ও রূপান্তরিত করিয়া রাখা হইত এই সব মুদ্রায়। আর সেই দুইটি আশ্রয়স্থলেরও পতন ঘটিল, ফলে তাহাদের উপর নির্ভরশীল অপরাপর দেশের মুদ্রারও অবনতি ঘটাইল। মহাসমরের ফলে সম্পদশালী তৃতীয় বৃহৎ দেশ, জাপান, তাহার মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়াছিল তাহার পূর্ব্বতন স্বর্ণমূল্যের প্রায় একতৃতীয়াংশ। অধিকতর শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির মুদ্রাস্ফীতির তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভূত হয় এক নূতন কলহ, পুঁজিপতিদেয় মধ্যে এক নূতন কাড়াকাড়ি। দুনিয়ার বাজারে পণ্য সস্তায় বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া স্ফীত-মুদ্রাসম্বলিত দেশ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিতে পারে। তাই বাজার অধিকারের সংগ্রামে ব্যবহৃত হয় এক নূতন হাতিয়ার—মুদ্রাস্ফীতি। এবং এই হাতিয়ারের সাহায্যেই চলিতেছে **মুদ্রাযুদ্ধ**।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় স্বর্ণমানের উপর মুদ্রা প্রতিষ্ঠিত ছিল মাত্র চারিটি দেশে: ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইট্জারল্যাণ্ড এবং হলাণ্ডে। অন্যান্য সব দেশ মুদ্রাস্ফীতির পথ অবলম্বন করিয়াছিল।

"একথা বলা বাহুল্য, যে-সব ঘটনার ফলে ব্যাঙ্ক-কারবারের ভিত্তি পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিয়াছে—তাহার অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিক হিসাবে দেখা গেল, ব্যাঙ্ক কারবার ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ হইল না, মিত্রপক্ষের মধ্যে আপোসে যে ঋণ হইয়াছিল তাহারও পরিশোধ বন্ধ রহিল, পুঁজি রফ্তানি বন্ধ রহিল, বৈদেশিক বাণিজ্য অতিরিক্ত হ্রাস

পাইল, পণ্য রফ্‌তানিও অধিকতর হ্রাস পাইল, বিদেশী বাজার অধিকারের সংগ্রাম তীব্রতর হইল, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য-যুদ্ধ বাধিল এবং প্রত্যেক দেশই অত্যন্ত সস্তায় বাজারে প্রচুর পরিমাণে মাল উজাড় করিয়া দিল। হ্যাঁ, কমরেড, এমনিভাবেই উজাড় করিল। সম্প্রতি ইওরোপ ও আমেরিকার জমকালো আইন-সভার মহানুভব প্রতিনিধিরা যাহা লইয়া গলা ফাটাইতেছিল—আমি সেই তথাকথিত সোভিয়েট ডাম্পিং বা সস্তায় মাল উজাড়ের কথা বলিতেছি না। আমি বলিতেছি বাজার নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে মাল উজাড় বা আসল ডাম্পিং-এর কথা, যাহাকে কার্য্যে প্রয়োগ করিতেছে এখন প্রায় সকল 'সভ্য' রাষ্ট্রই, এবং যাহার সম্বন্ধে সেই নির্ভীক ও মহানুভব প্রতিনিধিরাই বিজ্ঞোচিত মৌনাবলম্বন করিয়া আছে।" *

পুঁজিবাদী দেশে শিল্পজাত উৎপাদনের গতির বিবরণ হইতে দেখা যায় যে,

বর্ত্তমান মন্দা ও তাহার বিশেষত্ব

চরমতম অবনতির অবস্থা আসিয়াছিল ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। পরবর্ত্তী বৎসর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পুঁজিবাদী দেশে শিল্পের সামান্য উন্নতি দেখা যায়। এই বৎসরে ঘন ঘন উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা গেলেও কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের মত তত নীচে শিল্প আর নামে নাই।

কয়েকটি পুঁজিবাদীদেশের সরকার কর্ত্তৃক অবলম্বিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ত্বরিৎ সমরায়োজনের নীতির সাহায্যেই কেবল উপরোক্ত ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিতে গেলে ভুল করা হইবে। কোনো কোনো দেশে, যেমন জাপানে, সামরিক শিল্পসমূহে প্রভূত পরিমাণ মাল সরবরাহের ফরমাস্ প্রকৃতই একটি বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। যাই হোক, স্থিতিশীল মুদ্রা সম্বলিত

* ঐ, পৃঃ ৪৭৩

দেশসমেত সকল দেশেই শিল্পের অবস্থাতে উন্নতি দেখা যায়। সুতরাং ফলত ইহা প্রত্যক্ষ যে, "যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতি হইতে উদ্ভূত 'বাজার গরমের' পাশাপাশি পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের কার্য্য-কলাপেরও ফল এক্ষেত্রে রহিয়াছে।"*

শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণের মাত্রার উগ্র তীব্রতা সাধন করিয়া, কৃষক সাধারণের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া, ঔপনিবেশিক দেশগুলির শ্রমশীল জনসাধারণের উপর লুঠতরাজ চালাইয়া পুঁজিবাদ শিল্পের অবস্থায় কিছুটা উন্নতি ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে। বর্দ্ধিত শোষণ, শ্রমের উদগ্র তীব্রতা, মজুরীর হ্রাস—এই সমস্তই পণ্যের স্বল্প চাহিদা ও কম দাম সত্ত্বেও কতিপয় পুঁজিবাদীর পক্ষে উৎপাদন চালাইয়া যাওয়া সম্ভবপর করিয়াছে। কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যের দাম হ্রাস পাইয়াছে উপনিবেশের কৃষক ও শ্রমিকদের সর্ব্বনাশে; ইহার ফলে পুঁজিপতিদের উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পায়। এই সঙ্কট উৎপাদকশক্তি-নিচয়ের এক বিরাট অংশকে বিধ্বস্ত করিয়াছে। প্রভূত পরিমাণে মাল ধ্বংস করার ফলে মজুদ মালের ভাণ্ডার এত হ্রাস পাইয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহের অনুপাত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুকূল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ব্বল প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্ছেদের ফলে অবশিষ্ট শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে স্থানে স্থানে বাজারসমূহ নিষ্কণ্টক হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশে শিল্প এই ভাবে খারাপ অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়াছে। ইহার কবল এড়াইয়া উপনীত হইয়াছে মন্দার অবস্থায়।

* ঐ, পৃঃ

"সাধারণ মন্দা নহে, এক বিশেষ ধরনের মন্দা, যাহা নূতন বাজার গরম ও শিল্প সমৃদ্ধিতে পৌঁছাইয়া দেয় না, অপর পক্ষে আবার পিছনে ঠেলিয়া অবনতির নিম্নতম স্তরেও লইয়া যায় না।" *

সাধারণ সময়ে, যখন পুঁজিবাদ ইহার অবনতি ও পতনের যুগে উপনীত হয় নাই, তখন সঙ্কটের স্থান পূর্ণ করিত মন্দা, আবার মন্দার পরে আসিত সমৃদ্ধির যুগ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পুঁজিবাদ হইল মুমূর্ষু পুঁজিবাদ। সাধারণ সঙ্কটের ভিতর দিয়া সে চলিতেছে, গভীরতম অসঙ্গতিসমূহ তাহাকে করিতেছে ছিন্নভিন্ন, ঠেলিয়া দিতেছে তাহার ধ্বংসের মুখে। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু হইয়াছিল পুঁজিবাদের ব্যাপক সঙ্কটের মধ্যে; সেই জন্যই এমন ব্যাপকতা ও দীর্ঘ স্থায়িতা, এমন বিধ্বংসী শক্তি ও উদগ্র তীব্রতায় ইহা সুস্পষ্ট। মন্দার নূতন পর্য্যায়ও শুরু হইয়াছে এই সাধারণ সঙ্কটের মধ্যে; তাই সাধারণ ধরনের মন্দা হইতে এই মন্দা মূলত পৃথক। তাই নূতন বাজার গরম ও সমৃদ্ধির নূতন যুগের অগ্রদূত সে নয়।

"...কারণ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার লাভের অন্তরায় এই সব প্রতিকূল অবস্থা এখনও প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিতেছে। আমি পুঁজিবাদের বর্ত্তমান বিরামহীন **ব্যাপক** সঙ্কটের কথা বলিতেছি, যে সঙ্কটের মধ্যেই চলিতেছে **অর্থনৈতিক** সঙ্কট, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমাগত সামর্থ্যের কম কাজ করানো, স্থায়ী ব্যাপক বেকার অবস্থা, কৃষি-সঙ্কটের সহিত শিল্প-সঙ্কটের সংমিশ্রন, সাধারণত বাজার গরমের সূচনাকারী স্থায়ী পুঁজির

* ঐ, পৃঃ ৪৭৬।

পুনরাবৃত্ত (renewal) লক্ষণসমূহের অনুপস্থিতি, ইত্যাদি ইত্যাদি।"* ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে যে সঙ্কট সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ার উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে তাহা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমুদয় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিরোধ ও অসঙ্গতিকে তীব্রতার চরমে তুলিয়াছে। দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কট শ্রমিক জনসাধারণের অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে অতুলনীয় ভাবে শোচনীয়। ব্যাপক বেকার সমস্যা, নিষ্ঠুর ভাবে মজুরী হ্রাস, শোষণের তীব্রতাসাধন—এই সবই হইল বর্ত্তমান সঙ্কটের অবস্থা পরিবেশে শ্রমিকশ্রেণীর নিদারুণ নিয়তি। এই সঙ্কটের ফলে বিশাল কৃষক সাধারণেরও অতুলনীয় সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। তাহাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমশীল জনসাধারণের বিক্ষোভ হইয়া উঠিতেছে উদ্বেলিত।

বিপ্লব ও সংগ্রামের নূতন অধ্যায়ের পূর্ব্বলক্ষণ

জনসাধারণের ক্রুদ্ধ বিক্ষোভের মুখে বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর উপর প্রভুত্ব করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পূর্ব্বতন উপায় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশই খোলাখুলি সন্ত্রাসবাদী ফাশিস্তপন্থী একনায়কত্ব অবলম্বন করিতেছে। জার্মানীতে বুর্জোয়া শ্রেণী হিট্‌লারের নৃশংস একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। অপরাপর দেশেও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছে ফাশিস্তবাদী মনোভাব। শ্রমিক-শ্রেণীর ব্যূহ বিচ্ছিন্ন করিয়া একনায়কত্বের বিরুদ্ধে তাহাদের (শ্রমিকদের) প্রতিরোধ প্রচেষ্টা দুর্ব্বল করিবার যে বিশ্বাসঘাতক ভূমিকা সোশাল-ডেমোক্রাটরা গ্রহণ করিয়াছিল জার্মানিতে ফাশিস্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কেবল তাহারই সাক্ষ্য দেয় না, আরও সাক্ষ্য দেয় পুরাতনী

* ঐ, পৃঃ ৪৭৬।

শাসন ব্যবস্থার দ্বারা নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখিতে বর্ত্তমানে অপারগ বুর্জোয়া শ্রেণীর দুর্ব্বলতার। বুর্জোয়া শ্রেণী তাহার গণতান্ত্রিক মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়া শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে খোলাখুলি নৃশংস সন্ত্রাসনীতি অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু ইহা কেবল শ্রেণীসংগ্রামকেই তীব্রতর করিয়া তোলে, পুঁজিবাদের গোটা কাঠামো ছিন্নভিন্ন করিবার আশঙ্কা সৃষ্টি করে।

দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কট পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে বর্ত্তমান শত্রুতা চরমে তুলিয়াছে। সঙ্কটের অবস্থা পরিবেশে প্রত্যেক দেশই নিজের বোঝা অপরের কাঁধে চাপাইতে চেষ্টা করে। বাজার অধিকারের রেষারেষি নিদারুণ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক দেশ-বিদেশের বাজারে ডাম্পিং বা সস্তায় মাল উজাড় করিবার রীতি অবলম্বন করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী প্রতিযোগিতার অবৈধ প্রবেশের কবল হইতে নিজের বাজার সংরক্ষিত করার জন্য চতুর্দ্দিকে অবরোধ সৃষ্টি করিতেছে। ঋণ অপরিশোধের ফলে পাওনাদার ও খাতক জাতিগুলির মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। সাম্রাজ্যবাদী আওতার অসম বিকাশের বিধির কার্য্যকারিতাকে তীব্র করিয়া তুলিয়াছে সঙ্কট। এই সঙ্কট বিভিন্ন দেশকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি-সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছে এবং সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির মধ্যে শক্তিসম্পর্কে পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছে। এই সমস্তই বিভিন্ন দেশের সম্পর্ক নিদারুণ বিষময় করিয়াছে। সম্পূর্ণ খোলাখুলি ভাবেই নূতন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। পৃথিবীর পুনর্বণ্টনের উদ্দেশ্যে এক নূতন যুদ্ধের আয়োজনে পুঁজিবাদী দেশগুলি সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইতেছে। সঙ্কটের দরুন যখন শিল্পের সকল শাখাতেই উৎপাদন সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল, তখন শিল্পের কেবল একটি মাত্র শাখায়—সামরিক শিল্পে, উৎপাদন তো সঙ্কুচিত হয়ই নাই বরং প্রতি বৎসরই প্রসারিত হইতেছে। অস্ত্রের জোরে মানচুরিয়া

অধিকার করিয়া জাপান ক্রমশই উত্তর চীনে ঢুকিতে আরম্ভ করার পর কয়েক বৎসর গত হইয়াছে। চীন-জাপান যুদ্ধ প্রশান্ত মহাসাগরের জন্য সংগ্রামকে অত্যন্ত তীব্র করিয়া তুলিয়াছে, কারণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাত চলিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদী সমর-বিশারদদের গুপ্ত কক্ষে ভবিষ্যৎ মহাসমরের পরিকল্পনা রচিত হইতেছে। এই সব পরিকল্পনার সর্ব্বপ্রধান হইল সোভিয়েট সঙ্ঘের উপর সশস্ত্র আক্রমণের অভিসন্ধি।

> "পুঁজিবাদী দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিরোধের এবং আন্তর্জাতিক-বিরোধের নিদারুণ প্রচণ্ডতা ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে যে বিপ্লবী সঙ্কটের প্রয়োজনীয় বাস্তব পূর্ব্বাবস্থাসমূহ এতদূর পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে যে, বর্ত্তমানে দুনিয়া বিপ্লব ও মহাসমরের এক নূতন অধ্যায়ের দিকে **দৃঢ়পদে** অগ্রসর হইতেছে।" *

বহু সংখ্যক ঘটনার দ্বারা এই অনুমানের যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। যে সব দেশে ফাশিস্টতন্ত্র "জয়ী" হইয়াছিল সেই সব দেশেও হাঙ্গামা শুরু হইয়াছে। জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টি ফাশিস্টতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছে এবং অস্পষ্ট "গুপ্ত" (underground) অস্তিত্বের নিতান্ত বিপদসঙ্কুল অবস্থাপরিবেশে ফাশিস্টপন্থী একনায়কত্বের উচ্ছেদসাধনের জন্য শক্তি সমাবেশ করিতেছে। ফ্রান্সে ফাশিস্টবাদীদের প্ররোচনা শ্রমিক সাধারণের তরফ হইতে এমন প্রবল বাধা পাইয়াছিল যে, বুর্জোয়া রাজনীতিকরা সর্ব্বহারার বিক্ষোভে

* কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল কর্ম্মপরিষদের ত্রয়োদশ অধিবেশনের নিবন্ধ ও সিদ্ধান্ত, পৃঃ ৫, মডার্ণ বুক্‌স্ লিঃ, লণ্ডন, ১৯৩৪

সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নিজেদের নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নিতান্ত কঠোর অবস্থাপরিবেশে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অস্ট্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক শত্রুর প্রবলতর শক্তির বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরিয়া সশস্ত্র সংগ্রাম চালাইয়াছিল। সোভিয়েট চীন কয়েকটি অঞ্চল লইয়া গঠিত। তাহার জনসংখ্যা হইল ৬ কোটি। বর্ত্তমানে সেও হইয়া উঠিয়াছে এক পরাক্রান্ত শক্তি। নিজের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী সেনানায়কবৃন্দ কর্ত্তৃক পরিচালিত কতিপয় সমরাভিযান সফলতার সহিত প্রতিরোধ সে করিয়াছে এবং গড়িয়া তুলিয়াছে নিজস্ব শক্তিশালী লালফৌজ বাহিনী।

"বিশাল জনসাধারণ এখনও এমন অবস্থায় উপনীত হয় নাই যে, এই মুহূর্ত্তেই তাহারা পুঁজিবাদের আশ্রয়-দুর্গ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু এই আক্রমণের অভিপ্রায় পরিপক্কতা লাভ করিতেছে জনসাধারণের মনে—এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না।" *

আমরা জানি যে, পুঁজিবাদ স্বেচ্ছায় মঞ্চ হইতে বিদায় লইবে না, স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তাহার পতন ঘটিবে না। আমরা জানি পুঁজিবাদের সেই স্বতঃপ্রবৃত্ত পতন সম্বন্ধে তত্ত্বগুলি শ্রমিকশ্রেণীরই অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করে, শোষকদের উপর জয়ী হইতে হইলে যে দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম প্রয়োজন সে সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্যমকেও তাহারা করিয়া ফেলে নিস্তেজ। পুঁজিবাদের অসঙ্গতি সমূহের তীব্রতাসাধন এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে না যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণী নিষ্কৃতি লাভের

* স্টালিন—"লেনিনগ্রাদ : সোভিয়েট সঙ্ঘের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ অধিবেশনে কেন্দ্রীয় পরিষদের কার্য্য বিবরণী", পৃঃ ৪৭৭

আর কোনো উপায়ই আদৌ পায় না। একমাত্র নিরবচ্ছিন্ন অবিচলিত সংগ্রামই ঘটাইবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতন।

"বিপ্লবের বিজয় সাফল্য কখনও আপনা আপনি আসে না। তাহার জন্য আয়োজন করিতে হয়, তাহাকে অর্জ্জন করিতে হয়। এবং সেই বিজয় সাফল্যের জন্য আয়োজন করিতে পারে এবং তাহাকে অর্জ্জন করিতে পারে একমাত্র শক্তিশালী সর্ব্বহারা বিপ্লবী দল।" *

আলোচ্য প্রশ্নাবলী

১। বর্ত্তমান সঙ্কটের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

২। এই সঙ্কটের অসাধারণ তীব্রতা ও ব্যাপকতা কিসে প্রকাশ পায়?

৩। বর্ত্তমান সঙ্কট যে অত্যুৎপাদনের সঙ্কট তাহার প্রকৃতি কিসে প্রকাশ পায়?

৪। সঙ্কট কিরূপ ভাবে সর্ব্বহারার অবস্থা সংক্রামিত করিয়াছে?

৫। সঙ্কট কিরূপ ভাবে কৃষকশ্রেণীর অবস্থা সংক্রামিত করিয়াছে?

৬। বর্ত্তমান মন্দার বৈশিষ্ট্য কি কি?

৭। বিপ্লব ও সমরের নূতন অধ্যায়ের আবির্ভাব সূচক কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে?

* ঐ, পৃঃ ৪৮১